আমাদের পরিচয়

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত

আমাদের পরিচয়

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম্‌-এ
স্কটিশচার্চ্চ কলেজের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের
প্রধান অধ্যাপক

বীণা লাইব্রেরী
১৫নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

গ্রন্থকার-কর্তৃক প্রকাশিত,
স্কটিশচার্চ্চ কলেজ,
কলিকাতা।

প্রথম মুদ্রণ, ১৯৪১

মুদ্রাকর—
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত
সবিতা প্রেস,
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ওঁ

উত্তরে স্তব্ধ তুষারগিরি-শ্রেণী,
দক্ষিণে উত্তাল নীল জলধি,
মধ্যে মহাতীর্থ বিশাল ভারতভূমি !
এই ভূমিতে পরমদেবতার প্রিয় নিকেতন !
দেব-নিকেতনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম-সাধনার তিন প্রশস্ত দ্বার !
দ্বার-পথের পথিকৃৎ ঋষি-গণকে প্রণাম !
পূর্ব্বাচার্য্যগণকে প্রণাম ! সিদ্ধ গুরুগণকে প্রণাম !

সূচী

গ্রন্থকারের এই জাতীয় অপর পুস্তক—

গল্পে উপনিষৎ	১॥০
ঋষিদের প্রার্থনা	৸০

ভূমিকা

নদী-গিরি-বিচিত্রিত বিশাল ভারতবর্ষকে একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্রের ভিতর দিয়াই আগে চিনিতে হয়, নগাধিরাজ হিমালয়ের শোভাও ক্ষুদ্র আলেখ্যের সাহায্যে আমাদের মন আকর্ষণ করে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক রূপের পরিচয়ও তেমনই ভাবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির সাহায্যে দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এ চেষ্টা আমার পক্ষে দুঃসাহসিক ধৃষ্টতা মাত্র। সর্ব্বাগ্রে সেইজন্য সকলের কাছে মার্জ্জনা চাহিতেছি।

ভারতবাসী আমরা, আমাদের পরিচয় কি? আমরা কাহারা? আমাদের রক্তধারায় ও চিত্তধারায় কোন্ সংস্কৃতি প্রবহমাণ? ধর্ম্মে, সমাজে ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও শিল্পকলায়, আমাদের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সকল আবেষ্টনীতে কোন্ সংস্কৃতি বহুরূপে বিকশিত হইতেছে? পুষ্পদলের পশ্চাতে বৃন্তের ন্যায়, শাখা-প্রশাখা-চয়ের আশ্রয় কাণ্ডের ন্যায়, ভূমির গভীরতম স্তরে পাদপের অবলম্বন সুদৃঢ় মূলের ন্যায় কোন্ প্রেরণা এই সংস্কৃতির সৃষ্টি করিতেছে? আমাদের অতীত কি, সেই অতীতানুসারী আমাদের বর্ত্তমান কি, ইহার সহজ পরিচয় দেশবাসী সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

বর্ত্তমানযুগে ইহার প্রয়োজনও সমধিক। পিতা বা শিক্ষক বা আচার্য্যগণের কাছ হইতেও অনেক সময়ে অভীষ্ট শিক্ষা পাওয়া

যায় না। বিদ্যালয়ের নিত্য পাঠ্যবস্তু এই শিক্ষাকে মুখ্য করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষায় ভারতীয়গণ "তাহাদের নিজেদের সংস্কৃতিসম্ভোগ হইতেই বঞ্চিত হইয়াছে"। সমাজের প্রাণ-শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথচ ভিন্নমুখী শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বার খোলা ; এবং সে দ্বার দিয়া প্রায়শঃ উহা বিকৃতরূপেই আসিতেছে। তাহাকে ঠেকাইতেই হইবে, এমন কোন কথা হইতে পারে না। কিন্তু তাহাকে আগে ঠিকভাবে বুঝিতে হইবে ; এবং তাহারও আগে আমাদের পরিচয়, আমাদের সাধনা ও সংস্কৃতি, আমরা কাহারা, তাহা আরও ভালরূপে বুঝিতে হইবে। স্বপ্রতিষ্ঠ না হইলে পরকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, আত্মমর্য্যাদা-যুক্ত শিক্ষিত মন না হইলে বিদেশীয় বস্তুর দোষ-গুণ নির্ণয় করিতে পারে না, প্রজ্ঞাহীন বিচারমূঢ় ব্যক্তি পরের নিকট অন্ধের ন্যায় আত্মসমর্পণ করে মাত্র! ইহাতে কাহারও কল্যাণ নাই।

এক হিসাবে এই শিক্ষা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রয়োজন। প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের সাধনায় সকলের একই অধিকার। ধর্ম্মবিশ্বাস পৃথক্ হইলেও সংস্কৃতিতে অনেকটা ঐক্য থাকিতে পারে। ফেরদৌসির শাহ্‌নামা পারস্যদেশের প্রাক্-মুসলমানযুগের গৌরব ঘোষণা করে ; অথচ পারস্যদেশীয় মুসলমানগণ তাহাতে গৌরবান্বিত। গ্রীস ও রোমদেশের খ্রীষ্টীয় অধিবাসিবৃন্দ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব যুগের গ্রীস ও রোমের গৌরবেই প্রধানতঃ গৌরবান্বিত। আমাদের ভারতবর্ষেই অন্যথা হইবে কেন? ইহা ব্যতীত পরস্পরের সত্য পরিচয় পাইলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে, পরস্পরের সহিত মৈত্রী-সম্বন্ধ সহজ হইয়া উঠে। আর একটি বড় কথা এই যে, যাহারা পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া

গৌরব বোধ করে না, তাহারা স্বদেশ বা স্বজাতির ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধেও কোন উচ্চ আশা পোষণ করিতে পারে না।

বইখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথমার্দ্ধের ছয়টি অধ্যায়ে আলোচনা অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ছয়টি অধ্যায়ে হিন্দুদর্শন ও সাধনা-প্রণালীর কিছু কিছু আলোচনা অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে, উহা ব্যতীত বিষয়গুলি পরিস্ফুট করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের সত্য ও শাশ্বত রূপ নিজ অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় যথাসাধ্য চিত্রিত করিয়া মূলের শক্তি-প্রদ স্পর্শ সঞ্চার করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। কোন বিষয়েই দোষ-ভাগ সাধারণতঃ প্রদর্শিত হয় নাই; পাঠকের হৃদয়ে শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি-কল্পে যাহা ভাল, যাহা অনুপ্রাণনাময়, প্রধানতঃ তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। রচনায় সর্ব্বত্রই প্রসাদগুণ ও উচ্চ সাহিত্যাদর্শ রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পুস্তক রচনা-কালে শতাধিক গ্রন্থ নূতন করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছে, এই সকল গ্রন্থের সুপ্রবীণ লেখকগণের নিকটে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম দেওয়া গেল না বলিয়া আমি দুঃখিত।

পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রলাল সরকার, এম্-এ, বি-এল মহাশয় আশু মুদ্রণ-ব্যবস্থা করিয়া দিয়া এবং নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া আমার প্রতি ও বিষয়টির প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছেন। আমার প্রিয় ছাত্র অনুজ-প্রতিম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, কাব্য-সাঙ্খ্য-পুরাণতীর্থ মহাশয় আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত ও উপকৃত করিয়াছেন, তাহাও আজ স্মরণ করিতেছি। ইতি—

১০ই শ্রাবণ, ১৩৪৮,
স্কটিশচার্চ্চ কলেজ,
কলিকাতা।

বিনীত—
শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত

আমাদের পরিচয়

বেদ

ঋগ্বেদের ঋষি নয়ন মেলিয়া বিশ্ব দেখিতেছেন ! যাহা দেখিতেছেন, তাহাই মধু, তাহাই আনন্দ ! আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রতিধূলিকণায় আনন্দ ! ঋষির শ্রবণে দিব্য মন্ত্র ধ্বনিত হইল, ঋষির নয়নে দিব্য মন্ত্র ফুটিয়া উঠিল,—

মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বী নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥

—মধু বহিতেছে সকল বাতাস !
মধু ক্ষরিতেছে নদ ও নদী !
মধু হউক আমাদের ওষধি সকল !

মধু নক্ত মুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌ রস্তু নঃ পিতা॥

—মধু হউক রজনী ও উষা !
মধু হউক পৃথিবীর ধূলিকণা !
মধু হউক আমাদের পালয়িতা ঐ দ্যুলোক !

মধুমান্ নো বনস্পতি
র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ॥

[ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ৯০,৬-৮]

—মধু হউক আমাদের বনস্পতি!
মধু হউক ঐ সূর্য্য!
মধু হউক আমাদের ধেনুগণ!

ঋষি এই মধুময় সুন্দর ভুবনে সতেজ ইন্দ্রিয় লইয়া একশ' শরৎ বাঁচিয়া থাকিতে চাহিতেছেন। একশ' শরৎ পার হইয়াও সুন্দর ধরণীর বিচিত্র আনন্দরসে বিতৃষ্ণা দেখাইতেছেন না। ঋষির কণ্ঠে নিত্যকালের প্রার্থনা জাগিয়াছে,—

—পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং,
শৃণুয়াম শরদঃ শতং, প্রব্রবাম শরদঃ শতং,
অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥

[শুক্ল যজুর্ব্বেদ, ৩৬-২৪]

—একশ' শরৎ হেরব চোখে ভুবনভরা সুখ!
একশ' শরৎ বাঁচব মোরা সুস্থ সবল বুক!
একশ' শরৎ শুনব কানে, জীর্ণ নাহি হব!
একশ' শরৎ অগ্নিভরা বাক্য মুখে কব!
একশ' শরৎ অদীন আত্মা পূর্ণ স্বাধীন প্রাণ!
একশ' শরৎ পার হয়েও সতেজ বীর্য্যবান্!

ঋষি এই ধরণীতে বলিষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য তেজ, বীর্য্য, বল ও ওজ দাবী করিতেছেন; পৃথিবীর অমঙ্গল, অন্যায় ও অবিচারকে ধ্বংস করিবার জন্য মানস কোপ-রূপী মন্যু প্রার্থনা করিতেছেন এবং

সুখদুঃখে ধীর অবিচলিত থাকিবার জন্য সহ বা উৎসাহ ও ধৈর্য্যবল প্রার্থনা করিতেছেন,—

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি॥

[শুক্ল যজুর্ব্বেদ, ১৯-৯]

হে ব্রহ্ম!

তুমি তেজোরূপী, আমাতে তেজ আধান কর।
তুমি বীর্য্যরূপী, আমাতে বীর্য্য আধান কর।
তুমি বলরূপী, আমাতে বল আধান কর।
তুমি ওজোরূপী, আমাতে ওজ আধান কর।
তুমি মন্যুরূপী, আমাতে মন্যু আধান কর।
তুমি সহরূপী, আমাতে সহ আধান কর।

বৈদিক আর্য্য-জগৎ যেন এক ভিন্ন জগৎ। উন্নততর, মহত্তর, তেজস্বী এক মানব সমাজের পুরোবর্ত্তী ঋষি। শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়-মূর্ত্তিতে নিজ জীবনকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতেন। সমাজের আদর্শ ও প্রেরণা তখন আনন্দ ও অমৃত, তেজ ও বীর্য্য, মেধা ও জ্ঞান এবং সংযম ও শান্তির বাণীতে ভরপূর ছিল। এই উদার সমন্বয় ধর্ম্মে, এই মধু ও আনন্দ ধর্ম্মে, তেজোবীর্য্য ও বলের ধর্ম্মে ভারতের বিশিষ্ট আদর্শ পরিস্ফুট। ইহার সাধনেই ভারতের চরিতার্থতা ও মুক্তি।

আর্য্য-সাধনার আদি গঙ্গোত্রী এই বেদ কি? বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিই বা কাঁহারা?

বিদ্ ধাতুর একটি অর্থ জানা, তাহা হইতে বেদ শব্দের উৎপত্তি, অর্থ জ্ঞান। এই জ্ঞান দিব্যজ্ঞান, যাহা বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তরতম সত্য এবং উহাকে নিত্য ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই জন্য হিন্দুগণ বলেন, বেদরাশি কোন পুরুষ হইতে আসে নাই, তাহা অপৌরুষেয়, অতএব অনাদি ও অনন্ত। এই বেদের অপর নাম শ্রুতি,—যাহা শোনা হয়, তাহাই শ্রুতি। ঋষিগণ এই বেদ বা জ্ঞান মন্ত্ররূপে দিব্যকর্ণে প্রথমে শ্রবণ করেন এবং পরে উহা গুরু-শিষ্য পরম্পরায়, শিষ্য গুরুর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রুতিরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্র হইতেছে নিত্য সত্যের বাঙ্ময় বিগ্রহ বা দিব্য বাণী। যাঁহারা এই মন্ত্র দর্শন করেন, অর্থাৎ সাধনার বলে জ্ঞানরাশি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই ঋষি। ঋষ্ ধাতুর অর্থ দর্শন করা, ঋষি দ্রষ্টা অর্থাৎ মন্ত্র-দ্রষ্টা। বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়, ঋষিদের সমক্ষে তাহা প্রতি[illegible] হয় মাত্র; শুদ্ধ ও সত্যময় ঋষিগণ প্রকাশের পরিশুদ্ধ যন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে যে জ্ঞানে ভারতের আর্য্য-জাতির, অর্থাৎ হিন্দুর সাধনা ও সংস্কৃতির—তাহার সমগ্র জীবনের প্রতিষ্ঠা, তাহাই বিশেষভাবে বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় বা কুল-পরম্পরায় সাধনার একই ক্রম অনুসরণ করিতেন। ফলে নানা সঙ্ঘে নানা পারম্পর্য্যে বেদের বহু শাখা, প্রতিশাখার সৃষ্টি হইতে থাকে; এবং কালক্রমে বেদরাশির সংগ্রহ ও শ্রেণী-ভেদের প্রয়োজন হয়। বেদের মূল ভাগ মন্ত্রভাগ, এই মন্ত্রভাগের নাম সংহিতা। ঋক্, সাম ও যজুঃ প্রথম এই তিনখানি বেদ সংগৃহীত হয়। ঋক্ সংহিতায়

পদ্য, সামে গানাত্মক পদ্য এবং যজুঃ সংহিতায় গদ্যমন্ত্র সন্নিবিষ্ট হয়। পদ্য, গানাত্মক পদ্য এবং গদ্যমন্ত্রে বিভক্ত বলিয়া বেদরাশি ত্রয়ী নামে পরিচিত। অথর্ব্ব নামে চতুর্থ সংহিতায় বা বেদে অবশিষ্ট যাবতীয় মন্ত্র এবং বিক্ষিপ্ত বিদ্যাসমূহ গ্রথিত হয়। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব সংহিতা চারি বেদ নামে প্রসিদ্ধ।

ঋষিগণের মুখ্য উপাসনা-প্রণালী ছিল যজ্ঞ বা হোম অবলম্বন করিয়া। বেদে তাই যাগযজ্ঞের কথাই বেশি, উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও বেদে যজ্ঞের রূপকে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যেক বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। সংহিতা ভাগ হইতেছে মন্ত্র-সমষ্টি বা মূল বেদ। ব্রাহ্মণ ভাগে এই মন্ত্র-সমষ্টির ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। উহা সাধারণতঃ গদ্যে লিখিত, যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া-কাণ্ডের আলোচনাই সেখানে প্রধান। ব্রহ্ম শব্দে সংহিতা বা বেদও বুঝায়, তাই উহার ব্যাখ্যার নাম হইয়াছে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের আবার তিনটি ভাগ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ। ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ আরণ্যক, আরণ্যকের শেষ ভাগ উপনিষৎ। উপনিষৎ তাই বেদের অন্ত-ভাগ বলিয়া বেদান্ত নামে বিখ্যাত। ব্রাহ্মণে সংহিতার ক্রিয়াকাণ্ডের আলোচনা, বাহ্যিক অনুষ্ঠানের বিবরণই মুখ্য; উপনিষৎ বা বেদান্তে সংহিতার অধ্যাত্মবিদ্যার স্বরূপ আলোচনাই একমাত্র আলোচনা। আরণ্যকে উভয়বিধ আলোচনাই দৃষ্ট হয়। বেদ তাই অন্য দুই ভাগেও বিভক্ত হইয়া থাকে,—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ কর্ম্মকাণ্ড; জ্ঞানকাণ্ডই উপনিষৎ, ইহাতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান এবং ধ্যান, যোগ ও তপস্যাদ্বারা উক্ত জ্ঞান লাভের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইলে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ লইয়া হিন্দুর সমগ্র বেদ। • •

বেদের রচনাকাল বা প্রকাশকাল নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা কঠিন। পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান সময় হইতে চারি হাজার বা ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে, কেহ কেহ বা বিশ হাজার, চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই রচনা-কাল অনুমান করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণের মতে সিন্ধু-প্রদেশের মোহেন্-জো-দড়োতে ভূগর্ভে আবিষ্কৃত বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষ এই বেদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এক অতি প্রাচীনতর যুগের সন্ধান দেয়। সেই আর্য্য-পূর্ব্ব যুগেও আর্য্যেতর ভারতীয়গণ শিব ও শক্তির পূজা করিতেন এবং যোগসাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন—মোহেন-জো-দড়োর প্রাগ্‌বৈদিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায়। পঞ্চনদ প্রদেশ এবং পরবর্ত্তী কালে গঙ্গা-যমুনার তীরবর্ত্তী ভূভাগে আর্য্যদের প্রধান বাসস্থান ছিল।

বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে ছাত্রকে গুরুকুলে উপনীত হইতে হয়। গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাই উপনয়নের প্রধান অঙ্গ। এই গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা না হইলে আর্য্যের দ্বিজত্ব আসে না। দ্বিজকে আমরণ প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই মন্ত্র জপ ও এই মন্ত্র-অবলম্বনে ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান ও আত্মনিবেদন করিতে হয়। ঋষি বিশ্বামিত্র ঋগ্বেদের এই মহামন্ত্রের দ্রষ্টা। মন্ত্রটি এই—

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

[ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল, ৬২-১০]

—যিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিসকল পরিচালিত করেন, সেই দ্যোতমানসবিতার বরণীয় জ্যোতি আমরা ধ্যান করি।

সবিতা হইতেছেন জগৎ-প্রসবিতা সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর।

দীপ হইতে দীপশিখা প্রজ্বলিত হয়, সিদ্ধ গুরুর স্পর্শ পাইয়া বিনীত শিষ্যের অন্তরে জ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। অন্ততঃ দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া দ্বিজকুমারগণকে গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করিতে হইত।

রজনীর চতুর্থ যামে জাগরিত হইয়া ছাত্রগণ বেদ পাঠ আরম্ভ করিত, কিশোর-কণ্ঠোত্থিত পবিত্র বেদধ্বনিতে গুরুর আশ্রমে নিশাবসান ঘোষিত হইত। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগ প্রকাশিত হইতে না হইতেই অরুণোদয়ে গায়ত্রীমন্ত্র জপ ও ধ্যান করিয়া গৃহস্থগণ অগ্নি-হোত্রে সমিধ ও আহুতি অর্পণ করিতেন। যজ্ঞের পবিত্রধূমে আকাশমণ্ডল পরিপূত ও গম্ভীর বেদধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইত। যজ্ঞই ছিল প্রধান উপাসনা-প্রণালী। বিভিন্ন কামনা করিয়া বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে হব্য নিক্ষেপ করা হইত, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবতার তৃপ্তিকর বেদমন্ত্র উচ্চারণ করা হইত। অগ্নি ছিলেন দেবতাদের মুখ, সকল দেবতার হব্যই হোমকুণ্ডে অগ্নিমুখে অর্পণ করা হইত। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, বিষ্ণু, আদিত্য, বায়ু, রুদ্র, সরস্বতী এবং আরও অনেক দেবতা বৈদিক যুগে অর্চ্চিত হইতেন। বৈদিক দেবতাগণের সংখ্যা অনেকের মতে তেত্রিশ। আর্য্যগণ পৃথিবীকে মাতা এবং মস্তকোপরি বিরাজমান আকাশমণ্ডল অর্থাৎ দ্যৌকে পালয়িতা বা পিতা সম্বোধন করিতেন। ঋষিগণের নিষ্কাম হোমসাধনাও ছিল।

প্রধান দেবতা ছিলেন হিরণ্যগর্ভ, পুরাণে যাহার নাম প্রজাপতি বা ব্রহ্মা। পুরোভাগে পবিত্র হোমানল ঘৃতাহুতি পাইয়া সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া দীপ্ত প্রভায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে ঋষিগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তদ্গতচিত্তে গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে স্তুতিপাঠ,

আরম্ভ করিয়াছেন,—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতে মাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

—হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন সর্ব্বাগ্রে। জাত হইয়াই তিনি নিখিলের একমাত্র পতি হইলেন। তিনি ধারণ করিলেন এই পৃথিবী এবং দ্যুলোক।—কোন্ দেবতাকে আমরা হবিদ্বারা অর্চ্চনা করিব?

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে
প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

—যিনি আত্মার স্রষ্টা, বলের দাতা, যাঁহার প্রশাসন এই বিশ্ব এবং দেবগণ মান্য করিয়া থাকেন, অমৃত এবং মৃত্যু যাঁহার ছায়া,—কোন্ দেবতাকে আমরা হবিদ্বারা অর্চ্চনা করিব?

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা
যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল, ১২১—১, ২, ৪]

—যাঁহার মহিমা এই হিমবান্ পর্ব্বতমালা, ঋষিগণ নদীসহিত সমুদ্রকেও যাঁহার ঐশ্বর্য্য বলিয়া থাকেন, এই সকল দিক্ বিদিক্ যাঁহার বাহু,—কোন্ দেবতাকে আমরা হবিদ্বারা অর্চ্চনা করিব? নয়নমনপবিত্রকারী এ' এক দিব্য দৃশ্য!

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে অগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত, ইন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ও শ্রেষ্ঠ। অগ্নিদেবতার স্থূলরূপ হইতেছে আগুন, সূক্ষ্মতত্ত্বের জগতে উহাই তেজ এবং অধ্যাত্মজগতে উহাই চিন্ময় তপঃ বা তপঃ-শক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ যজ্ঞ বিশ্বসৃষ্টির এক প্রতিরূপ, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিরাট যজ্ঞ এই সৃষ্টি-যজ্ঞ।

দেব শব্দের এক অর্থ ইন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও ইন্দ্র দেবরাজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিপতি, শুদ্ধবুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃ-পুরুষ। স্থূলদৃষ্টিতে তিনি অগ্নি, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেবরাজ। তিনি অন্তরীক্ষচারী প্রধান দেবতা, তিনি বৃষ্টি দান করিয়া থাকেন, ঝড় ও বজ্র তাঁহার শাসনে পরিচালিত হয়। আজন্মযোদ্ধা চিরজয়ী ইন্দ্রদেব বৈদিক আর্য্যগণের পূজিত শ্রেষ্ঠ জাতীয় দেবতা। ইন্দ্র ভিন্ন অসুর দমন করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতে সমর্থ কে? শত্রুপুরী আক্রমণ, শত্রুর সহিত যুদ্ধ, শত্রুর নগর-লুণ্ঠন, নগর-ধ্বংস এই এক দিকে; অন্যদিকে ভক্ত রাজন্যগণের এবং ঋষিবৃন্দের জন্য নগর নির্ম্মাণ ও সেতু রচনা। সোমপানে শক্তি-সম্পন্ন হইয়া বজ্রাঘাতে জলরোধকারী বৃত্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তিনি বন্দী জলরাশিকে গোষ্ঠবদ্ধ গাভীগণের ন্যায় মুক্ত করেন এবং শীতল বৃষ্টিধারা-রূপে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। পিঙ্গল তাঁহার দেহের বর্ণ; পিঙ্গল তাঁহার কেশ, শ্মশ্রু, রথ ও অশ্ব। অতি দীর্ঘ তাঁহার বাহুযুগল, তাহাতে তিনি ধারণ করিয়াছেন বহু-সূচিমুখ হিরণ্যবর্ণ বজ্র। মরুদ্গণ তাঁহার সহায়কারী। তাঁহার জন্মসময়ে ভয়ে পর্ব্বত, পৃথিবী ও আকাশ প্রকম্পিত হইয়াছিল। রাক্ষসবধের জন্যই তাঁহার সৃষ্টি। যজ্ঞের শ্রেষ্ঠভাগ এই ইন্দ্রকে নিবেদন করিয়া ঋষিগণ প্রার্থনা করেন,—

ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং
বজ্রং ঘনা দদীমহি।
জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ॥

[ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ৮-৩]

—হে ইন্দ্র! আমরা তোমাদ্বারাই রক্ষিত।
আমরা যেন বজ্রকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করি!
প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করি!

ঋগ্বেদের একচতুর্থাংশ, ২৫০ সূক্ত ব্যাপিয়া এই ইন্দ্রদেবতার বন্দনা দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত ৫০টি সূক্তে অন্য দেবতার সহিতও ইন্দ্র অর্চ্চিত হইয়াছেন।

কেবল যুদ্ধ-দেবতা নয়, পরম দেবতারূপেও ইন্দ্র বন্দিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনঃশেফের উপাখ্যানে দেখা যায়, রাজপুত্র রোহিত যখন শ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন ইন্দ্র আসিয়া পুরুষবেশে পথে তাঁহাকে ডাক দিলেন— "চরৈবেতি, চরৈবেতি—চল, চল, ফিরিও না, পথে চল। ইন্দ্রঃ ইচ্চরতঃ সখা—পথে যে চলে, ইন্দ্র তাঁহারই সখা।"

ইন্দ্র বলিলেন—

নানা শ্রান্তায় শ্রী রস্তীতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা, চরৈবেতি॥

—হে রোহিত! চিরকাল আমরা শুনিয়াছি, চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত হয়, তাহার নানা শ্রী আবির্ভূত হয়। শ্রেষ্ঠ জনও যদি শুইয়া পড়িয়া থাকে, তবে সে তুচ্ছ হইয়া যায়। পথে যে চলে, ইন্দ্র তাহারই সখা। পথে চল চল!

পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাশ্চরৈবেতি ॥

—যে পথে চলে, তাহার জঙ্ঘাযুগল পুষ্পিত হয়, তাহার আত্মা বৃহৎ হইতে থাকে এবং মহৎ ফল লাভ করে। তাহার সকল পাপ শ্রমদ্বারা নিহত হইয়া পথেই শুইয়া পড়িয়া থাকে। পথে চল, চল !

আস্তে ভগ আসীনস্যোর্দ্ধস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি ॥

—যে বসিয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও বসিয়া থাকে; যে ঊর্দ্ধে উঠিয়া দাঁড়ায়, তাহার ভাগ্যও উঠিয়া দাঁড়ায়; যে শুইয়া পড়ে, তাহার ভাগ্যও শুইয়া পড়ে; আর যে চলিতে থাকে, তাহার ভাগ্যও চলিতে থাকে; পথে চল, চল !

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠং স্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরংশ্চরৈবেতি ॥

—যে শুইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার কাছেই কলিযুগ; যে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার দ্বাপর যুগ আরম্ভ হইয়াছে; যে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ত্রেতাযুগ; আর যে চলিতেছে, তাহার সত্যযুগ! পথে চল, চল !

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি।

—যে চলিতেছে, সেই মধু লাভ করিতেছে; যে চলিতেছে, সে অমৃতময় ফল (স্বাদু উদুম্বর) লাভ করিতেছে; ঐ দেখ, সূর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব—সে যে চলিতে চলিতে কখনও তন্দ্রালু হয় না! পথে চল, চল !

এই ইন্দ্র অন্তর্য্যামী দেবতা, আমাদের শুদ্ধ বুদ্ধির প্রেরক পুরুষ। সেই সুদূর অতীত যুগে এই যে অগ্নিময় চলার মন্ত্র উচ্চারিত

হইয়াছিল, তাহা অনন্তকাল সর্ব্বমানবকে মঙ্গলযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করিবে; মানবের শ্রান্তি ও অবসাদ দূর করিয়া, নববলে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে পরম সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিবে। ইন্দ্র যে তাহার সখা!

স্ত্রী দেবতাগণের মধ্যে দেবী উষা আপন স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল। উষার স্তুতি বেদে অপূর্ব্ব কবিত্বমণ্ডিত। বৈদিক ঋষিগণ কেবল মনীষী এবং পুরোহিত ছিলেন না, তাঁহারা বড় কবিও ছিলেন; উষার সূক্তগুলি তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। দ্যুলোক-দুহিতা উষা ভাস্বতী, জ্যোতির বসন পরিধান করিয়া শোভন বেশে পূর্ব্বদিকে অভিসার করেন। জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য তাঁহার প্রিয়তম প্রণয়ী ও পতি! জীবন-স্বরূপা উষা প্রাচীনা হইয়াও নিত্য নবীনা, প্রতিদিন তাঁহার নূতন জন্ম। রাত্রির জ্যেষ্ঠা ভগিনী উষা অন্ধকারের সঙ্গে অশুভ ও দুঃস্বপ্ন দূর করিয়া বিশ্ব জগৎকে জাগ্রত করেন, আলোকের বর দান করেন।

বাগ্‌দেবী সরস্বতী বেদমাতা, বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই জ্যোতিঃ-স্বরূপা দেবী মহার্ণবের তুল্য অসীম, ইনি সকলের বুদ্ধি বিকশিত করিতেছেন।

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং
চেতন্তী সুমতীনাম্।
যজ্ঞং দধে স্বরস্বতী॥ [ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ৩-১১]

—ইনি সুন্দর ও সত্য বাক্য প্রেরণ করেন,
শোভনা বুদ্ধিকে উদ্বোধিত করেন;
দেবী সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করিয়া আছেন।

ঋগ্বেদের ঋষিদের মধ্যে কয়েকটি নারী ঋষিও আছেন, এই বিদুষীগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া আর্য্য-সমাজে নিত্য সম্মানিত হইয়াছেন। অত্রির দুহিতা অপালা, কক্ষীবানের দুহিতা ঘোষা, অম্ভৃণ

ঋষির দুহিতা বাক্—ইহারা ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। ব্রহ্মবাদিনী কুমারী বাক্ সুপ্রসিদ্ধ দেবী-সূক্তের ঋষি। হিন্দুর শক্তিপূজা এই দেবী-সূক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বর্ষে বর্ষে শরৎকালে দেবী পূজায় চণ্ডী-পাঠের পূর্ব্বে এই সূক্তটি বাঙ্গালার প্রতিগৃহে পঠিত হয়। অদ্ভুত বিশ্বাত্মবুদ্ধি এবং অদ্বৈত ব্রহ্মোপলব্ধি হইয়াছিল এই কুমারী ঋষির। তিনি আপনাকে নিখিলের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। উদ্দীপ্ত জ্ঞানের মহিমায় তিনি অনুভব করিতেছেন,—

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরীস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥

—আমি রাষ্ট্রী—রাষ্ট্রশক্তি, ঈশ্বরী, আমিই লোকের ধনলাভ ঘটাই, জ্ঞানবতী আমি, যজ্ঞের দেবতাদের মধ্যে আমিই প্রথম, দেবগণ আমাকে বহু রূপে উপাসনা করেন, আমি বহুস্থানে বর্ত্তমান এবং বহু প্রাণীর অন্তরে প্রকাশমান।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ॥

[ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১২৫—৩, ৬]

—লোকহিংসক ব্রহ্মবিদ্বেষীকে বধ করিবার জন্য আমি রুদ্রের ধনু বিস্তার করিয়া থাকি, আমিই জনগণের নিমিত্ত সংগ্রাম করি, আমি দ্যুলোক ও পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজমান।

কেহ কেহ বলেন, দেবী-সূক্তের ঋষি বাক্ বা শব্দ ব্রহ্ম এই নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর দ্বিবিধ ঋষির কথা বলিয়াছেন, মেধা-কাম ঋষি এবং শ্রীকাম ঋষি। ঋষি বাক্ এবং আরও অনেক ঋষি মেধাকাম; মেধা বা জ্ঞান, ব্রহ্মজ্যোতি, মঙ্গল, অমৃত ও অভয় ইঁহারা প্রার্থনা করিতেন। শ্রীকাম ঋষিগণ হৃদয়ের সকাম প্রার্থনা-গুলি নিবেদন করিতেন। তাঁহারা শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, ধন, যশ, আয়ু, বীর পুত্র, বীর ভৃত্য, অশ্ব এবং গোধন কামনা করিয়া প্রজ্বলিত হোম-হুতাশনে স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক আহুতি দিতেন। তাঁহারা প্রধানতঃ পিতৃলোকে ও স্বর্গলোকে বাস আকাঙ্ক্ষা করিতেন। উপনিষদে কচিৎ এরূপ প্রার্থনা দৃষ্ট হয়; তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি হোমানলে আহুতি দিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—

যশো জনে অসানি স্বাহা।
শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা ॥

[তৈত্তিঃ উপঃ ১-৪-৩]

—আমি যেন জনসমাজে যশস্বী হই! স্বাহা!

আমি যেন শ্রেষ্ঠ হই! ধনশালিগণের মধ্যে প্রধানতম হই! স্বাহা!

বর্ত্তমান হিন্দুজাতির জীবনের সহিত এই বেদের যোগ কোথায়? পতি ও পত্নী বিবাহিত হইয়া সযত্নে গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করিতেন, প্রত্যহ সমিধ ও আহুতি অর্পণ করিয়া এই পবিত্র অগ্নি নিত্য প্রজ্বলিত রাখিতেন, তাঁহাদের জীবনাবসানের পূর্ব্বে এই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইত না। যজ্ঞের সমান অধিকার লইয়া স্ত্রী-পুরুষে একত্র যজ্ঞ করিতেন বলিয়া স্ত্রীর অপর নাম হইয়াছিল পত্নী। পত্নী

উপস্থিত না থাকিলে যজ্ঞ হইতে পারিত না। সে যজ্ঞ, সে দৈনিক অগ্নিসেবা হিন্দু জীবনে আর নাই; অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় রাষ্ট্রশক্তি-সাধ্য অতি বিরাট যজ্ঞ-সাধনের প্রশ্ন তো উঠেই না। কিন্তু নিত্য অনুষ্ঠানে না হইলেও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে হিন্দুর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়ন, বিবাহ, মৃত্যু বা শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই বৈদিক হোম বা যজ্ঞ অবশ্য কর্ত্তব্য, একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। বিবাহের মূলীভূত অনুষ্ঠান বৈদিক হোম, এই হোম সম্পন্ন না হইলে কন্যা-সম্প্রদান বা স্ত্রী-আচার কোন অনুষ্ঠানেই বিবাহ বৈধ হয় না। হোমানুষ্ঠান কালেই কন্যার হৃদয় স্পর্শ করিয়া বর ব্রতাদেশ দান করেন—

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তং তেঽস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্ ॥

[সামমন্ত্র ব্রাহ্মণ, ১-২-২১]

—আমার ব্রতে তোমার হৃদয় নিয়োগ কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুসরণ করুক। আমার বাক্য তুমি একমনা হইয়া সেবা কর। বৃহস্পতি তোমাকে আমার জীবনব্রত উদ্‌যাপনে নিযুক্ত করুন।

উপনয়ন-সংস্কারটি সম্পূর্ণ বৈদিক সংস্কার; গায়ত্রী-দীক্ষা গ্রহণ এবং বিদ্যালাভার্থ ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ ইহার মুখ্য অঙ্গ। এখানেও উল্লিখিত 'মম ব্রতে' মন্ত্রটি পাঠ করিয়া আচার্য্য কুমারের হৃদয় স্পর্শ করিয়া ব্রতাদেশ দান করেন।

হিন্দুর প্রামাণিক সকল শাস্ত্রই এই শ্রুতি বা বেদকে মূল করিয়া রচনা করা হইয়াছে।

হিন্দু সমাজে এখন পৌরাণিক উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত। দেবতার প্রতীককে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, নৈবেদ্যাদি দান ও স্তব পাঠ করিয়া দেবতার আরাধনা করা হয়। কিন্তু এই সকল পৌরাণিক পূজায়, বিশেষতঃ বৃহৎ পূজায় পূজার অন্তে বৈদিক মন্ত্রে হোম সম্পন্ন করিতে হয়; নতুবা পূজা পূর্ণাঙ্গ হয় না। দুর্গাপূজায় পূজান্তে হোম সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

বৈদিক ঋষিগণ বিভিন্ন দেবতার মিলিত মহতী ঐশীশক্তিকে বিশ্ব-দেব নাম দিয়া আরাধনা করিয়াছেন। এই বিশ্বদেবই ব্রহ্ম। ঋষিগণ ব্রহ্মকে এক ও সৎরূপে জানিয়াও বহুরূপে স্তব করিয়াছেন,—

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

[ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৬৪—৪৬]

বেদের উচ্চতম জ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রকাশ রহিয়াছে উপনিষদে, বেদের অন্ত-ভাগ বলিয়া ইহারই অপর নাম বেদান্ত। উপনিষদের ঋষি ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিয়া সংশয়পাশ ছেদন করিয়াছেন এবং মুক্তকণ্ঠে বিশ্বজনকে আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

[শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩-৮]

—অন্ধকারের পরপারে আদিত্যবর্ণ এই মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি। একমাত্র তাঁহাকে জানিয়া মানুষ মৃত্যু অতিক্রম করে; তাঁহাকে লাভের অন্য পন্থা নাই।

যজুর্ব্বেদের ঋষি অধ্যাপনান্তে শিষ্যগণকে আদেশ করিতেছেন,—

যথেমাং বাচং কল্যাণীমা বদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥

[যজুর্ব্বেদ ২৬-২]

হে শিষ্যগণ! আমি যেমন এই কল্যাণ বাক্য সকল জনকে উপদেশ করিয়াছি, তোমরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, আর্য্য, নিজ পরিচারক সকল জনকে উপদেশ করিবে।

ঋগ্বেদের ঋষি যজমানগণকে অশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

সমানী ব আকূতিঃ
সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো
যথা বঃ সুসহাসতি ॥

[ঋগ্বেদ-১ম মণ্ডল, ১২-১৯১]

তেমোদের চেষ্টা এক হউক!
তোমাদের হৃদয় এক হউক!
তোমাদের মন এক হউক!
তোমাদের যেন শোভন মিলন সম্পন্ন হয়!

উপনিষৎ

"বাছা, তোমার বয়স হইতে চলিল, তুমি এখনও ব্রহ্মচর্য্য নিলে না! কবে আর গুরুকুলে গিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে?"

পিতা উদ্দালক ঋষি বালকপুত্র শ্বেতকেতুকে ডাকিয়া এইরূপ কহিলেন। শ্বেতকেতুর বয়স বার বৎসর, অথচ এখনও তাহার উপনয়ন হয় নাই। কিশোর কাল, এই বয়সে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা লইয়া গুরুকুলে বাস করিতে হয়; সেবা ও যত্ন দ্বারা গুরুকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার সকাশে বেদবিদ্যা লাভ করিতে হয়। আবার এই কিশোর বয়সেই ব্রহ্মের অর্চ্চনা ও ধ্যান করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মবিদ্যা লাভে ব্রতী হইতে হয়। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে তাঁহাকে বলে 'বিদ্বান্', ঋষিরাই প্রকৃত বিদ্বান্।

সেকালে ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই আর ব্রাহ্মণের সম্মান লাভ করিত না; বরং ব্রাহ্মণ-পুত্র হইয়া ব্রহ্মচর্য্য-শূন্য ও বেদবিদ্যা-হীন হইলে লোকে তাহাকে বিশেষ ভাবে নিন্দাই করিত, তাহাকে বলিত 'ব্রহ্ম-বন্ধু'! 'ব্রহ্মবন্ধু' শব্দটি অনেকটা গালির মতই ছিল। নিজে ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহার বন্ধু অর্থাৎ পিতা বা আত্মীয় বলিয়া যে ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করে, তাহাকে বলিত 'ব্রহ্মবন্ধু'। নিজের গুণ ও কর্ম্মদ্বারা নয়, কেবল জন্মদ্বারা পিতৃনামে বা বংশনামে যাহার পরিচয়, তাহারা লোকের কৃপার পাত্র।

উদ্দালক ঋষি তাই পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "একি বৎস! আমাদের বংশে তো কেহ বেদ না পড়িয়া ব্রহ্মবন্ধু হয় নাই! যাও সৌম্য! তুমি গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য লইয়া বেদ অধ্যয়ন কর।"

শ্বেতকেতু চলিয়া গেলেন দূরে গুরুকুল-বাসে ; উপনীত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ সকল বেদ অধ্যয়ন করিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে বেদ-বিৎ পণ্ডিত হইয়া যুবক শ্বেতকেতু পিতার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু শ্বেতকেতু যেন অহঙ্কারী, অবিনীত হইয়াছেন; গর্ব্বভরে কাহারও সহিত কথাই বলেন না। পিতা সমস্ত লক্ষ্য করিয়া একদিন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখিতেছি, তুমি গুরুগৃহ হইতে অহঙ্কারী ও অবিনীত হইয়া ফিরিয়াছ। তুমি কি গুরুকে সেই 'আদেশের' কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহাদ্বারা অশ্রুত বিষয় শোনা যায়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তা করা যায় এবং অবিজ্ঞাত বিষয় জানা যায়? —যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি?"

ঋষিপুত্র প্রশ্ন শুনিয়া অবাক্ হইলেন, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান্, কিছুই বুঝিতে পারিলামনা, এরূপ 'আদেশ' কি প্রকারে সম্ভবপর?"

"কেন বৎস, খালি একখণ্ড মাটিকে জানিলে মাটির তৈরী ঘট, সরা, কলস—মাটির সকল জিনিষই তো জানা হয়। একমাত্র মাটিই সেখানে সত্য, ভেদ কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ লইয়া। এইরূপ একটুকরা সোনাকে জানিলে সোনার তৈরী সমস্ত জিনিষই জানা হয়। একখানি ছোট নরুনকে জানিলে লোহার তৈরী সকল বস্তুর তত্ত্বই অবগত হওয়া যায়। এইরূপই সেই 'আদেশ', এককে জানিলেই তাহাদ্বারা সকল জানা হয়।"

কিন্তু শ্বেতকেতু তো গুরুগৃহে এমন কোন আশ্চর্য্য 'আদেশ' লাভ করেন নাই। শ্বেতকেতুর অহঙ্কার চূর্ণ হইল, দম্ভ, অভিমান শূন্যে মিলাইল। তিনি বুঝিলেন, তুচ্ছ চারি বেদ, তুচ্ছ ছয় বেদাঙ্গ, যদি না তাহাদ্বারা সেই পরম 'আদেশ' অবগত হওয়া যায়। ঋষি-পুত্র

নম্রভাবে পিতাকে কহিলেন, "ভগবান, আমার উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই ইহা জানিতেন না, যদি জানিতেনই, তবে আর আমাকে না বলিবেন কেন ? ভগবান্, আপনি আমাকে দয়া করিয়া উপদেশ করুন।" এই বলিয়া শ্বেতকেতু ঋষি পিতার শরণ লইলেন।

পুত্রের বিনীত জিজ্ঞাসা লক্ষ্য করিয়া পিতা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তাহাকে পরা বিদ্যা দান করিবার জন্য প্রথমেই সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন,—

"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্—হে সৌম্য ! পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, তিনি বহু হইবেন, বহুরূপে জন্মিবেন"—এইরূপ গম্ভীর মন্ত্রদ্বারা সৃষ্টি-রহস্যের সূচনা করিয়া ঋষি তেজ, সলিল, পৃথিবী, মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সৃষ্টির কথা বলিলেন। কি ভাবে সেই এক দেবতা এই সমুদয়ের মধ্যে আত্মা হইয়া অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, এবং কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, তাহা বলিলেন, এবং শ্বেতকেতুকে বুঝাইয়া দিলেন—সেই এক পুরুষ হইতেই আমাদের মন, প্রাণ ও বাক্য এবং নিখিল সৃষ্টি আবির্ভূত হইয়াছে। এই জন্য সেই একেকে জানিলেই এই সমুদয়ই জানা হয়। ইহাই পরম 'আদেশ'।

ঋষি উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুর শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন যে অনু-শাসনদ্বারা, তাহা সমগ্র উপনিষৎ শাস্ত্রের সার, যুগযুগান্তব্যাপী ঋষি-সাধনার লক্ষ্যমণি, নিখিল জ্ঞান-সমুদ্রের মন্থন-জাত সুধা, সে মহামন্ত্র 'তত্ত্বমসি'। তিনটি শব্দে সামবেদের এই মহাবাক্যটি গঠিত—তৎ, ত্বম্, অসি। তৎ—তাহা, সেই, সেই বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম ; ত্বম্—তুমি,

জীব, আত্মা ; অসি—হও। তাহা তুমি হও, তুমি সেই বস্তু হও, তুমিই সেই, তুমিই ব্রহ্ম, আত্মাই ব্রহ্ম।

ঋষিপিতা স্নেহভরে বিদ্বান্ পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিলেন, গম্ভীর উদাত্ত মন্ত্রে বারংবার তাহাকে প্রবুদ্ধ করিলেন—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো—হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই! আত্মাই সত্য, আত্মাই ব্রহ্ম, তুমিই আত্মা, তুমিই ব্রহ্ম, এক অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ।" ব্রহ্ম আর জীব ভিন্ন নহে,—ইহা পরম সত্য, ইহাই ঋষির অভয় ঘোষণা।

এই তো উপনিষৎ বলা হইল, ইহা উপনিষৎ, ছান্দোগ্য-উপনিষৎ। উপনিষদ্-যুগের সকল তত্ত্ব সকল শিক্ষা একটি আখ্যায়িকায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহে বাস, বেদবিদ্যা এবং অন্যান্য বিদ্যালাভ, পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ, ব্রহ্মিষ্ঠ গৃহস্থ,—ইহাই তো আর্য্যসমাজে উপনিষদ্‌যুগের বৈশিষ্ট্য।

ঋষি বলিতেছেন, 'দুই প্রকার বিদ্যা আছে জানিবে, পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা।' ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস-পুরাণ নামে পঞ্চম বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ, দেববিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা—এই সকল বিদ্যাই অপরাবিদ্যা বলিয়া কথিত। আর পরাবিদ্যা যাহাদ্বারা সেই পরমপুরুষকে লাভ করা যায়—'অথ পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে'। কিশোর বয়সে ব্রহ্মচারী হইয়া সমুদয় অপরাবিদ্যা জানিতে হইবে ; কারণ, সৃষ্টি ও সংসার তাহা লইয়াই। কিন্তু এখানে বিরত হইলে চলিবে না, পরাবিদ্যা লাভ করিতেই হইবে, কারণ তাহাতেই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ-সিদ্ধি। পরাবিদ্যা লাভ করিয়া মানুষ শান্ত,

বিনীত, পরম কৃতার্থ হইয়া যায় এবং তখন সে ব্রহ্মিষ্ঠ গৃহস্থ হইতে পারে। ঋষি উদ্দালক ছিলেন ব্রহ্মিষ্ঠ গৃহস্থ।

গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজের ভিত্তি। ইহা পবিত্র এবং শান্তরসাস্পদ। আর্য্যগণ জীবনকে চারি আশ্রমে ভাগ করিয়া সেবা করিয়াছেন,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

প্রথম আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্ম শব্দের অনেক অর্থ আছে; এক অর্থ বেদ, আর এক অর্থ পরম পুরুষ। এই বেদ কিংবা পরম-পুরুষরূপী ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য যে চর্য্যা—জীবনে নিত্য যে সমুদয় নীতি ও নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহাই মূলতঃ ব্রহ্মচর্য্য; ইহা কেবল শারীরিক ক্লেশসহিষ্ণুতা বা কৃচ্ছ্রাচরণ নহে। আজকাল মাত্র 'বীর্য্য-রক্ষা' অর্থে শব্দটি পর্য্যবসিত হইয়াছে, অবশ্য বীর্য্যধারণ ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ। সংযম ও তপস্যাই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য হইতে বীর্য্যলাভ হয়। বীর্য্য-ধারণদ্বারা দেহের ওজ ও মনের তেজ জন্মে; ক্রমে যে বল না হইলে আত্মাকে লাভ করা যায় না, সেই বলের আবির্ভাব হয়। এই 'বল' ই আত্ম-প্রকাশক জ্যোতি, ব্রহ্মচর্য্য তাই জ্যোতির্ম্ময়। এই ব্রহ্মচর্য্য না হইলে অপরাবিদ্যা বা লৌকিক বিদ্যাই সম্যক্ অধিগত হয় না, পরাবিদ্যা বা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ তো দূরের কথা। সেকালের ছাত্রজীবন, ব্রহ্মচর্য্যবাস, বিদ্যালাভের জন্য তরুণ চিত্তের একান্ত ব্যাকুলতা ও তপস্যার চিত্র উপনিষদের গল্পে গল্পে আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুত্রকে 'বিদ্বান্' করিবার জন্য পিতা ও মাতারই বা কি আকুল আগ্রহ ছিল! কেবল তো লৌকিক বিদ্যা নয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা লাভেরও উপযুক্ত সময় ছিল যৌবনকাল। পিতা নিজে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কুমার-বয়সেই সন্তানের সরস উর্ব্বর হৃদয়ে পরম বিদ্যা ও পরম জ্ঞানের বীজ বপন

করিতেন। তরুণ চিত্তে ব্রহ্মবিদ্যায় অনুরাগের সঞ্চার না হইলে অধিক বয়সে ব্যাধি ও জরা-জীর্ণ দেহে অন্তর্ম্মুখ হইয়া তত্ত্বান্বেষণ কঠিন হয়।

পুত্র শ্বেতকেতু ও পিতা উদ্দালক ঋষির কাহিনী বলা হইয়াছে। পুত্র ভৃগুও এই প্রকার জ্ঞান লাভের জন্য পিতা বরুণের সকাশে গিয়াছেন, পিতা বরুণ তত্ত্বোপদেশ না করিয়া তাহাকে তপস্যায় ব্রতী করিয়াছেন, তাহাকে বলিয়াছেন, "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জান, তপস্যাই ব্রহ্ম"। ভৃগু তপস্যা করিলেন—স তপোঽতপ্যত। পুত্র ভৃগু পিতার প্রেরণায় তপস্যাদ্বারা অন্ন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব অবগত হইয়া শেষে পরম তত্ত্ব অবগত হইলেন,—আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। ভৃগু জানিলেন—আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ হইতেই এই সমুদয় জীবজগৎ জন্মিয়াছে, আনন্দেই এই সমুদয় বাঁচিয়া আছে, এবং আনন্দেই ফিরিয়া সমুদয় লয় পাইতেছে। ভৃগু জানিলেন তপস্যা করিয়া তপস্যারূপ ব্রহ্মদ্বারা। নিরলস চেষ্টা ও সরল সাধনাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। এই বিদ্যা ভৃগু জানিয়াছিলেন এবং বরুণ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইহা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বালক সত্যকামকে মাতা জবালা কত আগ্রহ করিয়া বিদ্যালাভের জন্য ঋষি গৌতমের আশ্রমে পাঠাইয়াছেন। বালক পিতৃপরিচয় বা গোত্রপরিচয় দিতে পারে নাই, মাতার শিক্ষায় সে মাতৃনামেই আপনার পরিচয় দিয়াছে। গুরু গৌতম এই অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া প্রীত হইলেন। "ব্রাহ্মণভিন্ন অপর কেহ এরূপ সত্য কথা বলিতে পারে না।

তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই, তুমি ব্রাহ্মণ!"—এই বলিয়া ঋষি তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং সমিধ আহরণে আদেশ করিলেন। সেই দিন হইতে মাতৃ-নামে বালকের নাম ও পরিচয় হইল "জাবাল সত্যকাম।" আশ্চর্য্য উদার, অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ ও সত্য-সন্ধ ছিলেন ভারত-তপোবনের ঋষি!

সে যুগের চিত্র কি চমৎকার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মানুষ, দেবতা, বালক বা প্রৌঢ় সকলেরই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য কি অসীম আগ্রহ! শিশু নচিকেতা ঘটনাক্রমে যমপুরীতে উপস্থিত হইয়া যমকে তুষ্ট করিয়া যমের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা আদায় করিতেছেন; হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব, রথ, নৃত্য, গীত, সম্ভোগের কত সামগ্রী, এই বিপুলা পৃথিবীর আধিপত্য এবং সুদীর্ঘ জীবন কিছুই তাহাকে প্রলোভিত করিতে পারে নাই! বালক মানুষের প্রেয়কে বর্জ্জন করিয়া পরম শ্রেয়কেই বরণ করিলেন। ক্ষত্রিয়কুমার কোশল দেশের রাজপুত্র হিরণ্যনাভ ব্রহ্মবিদ্যার জন্য দূর আশ্রমোদ্দেশ্যে রথারোহণে ছুটিয়াছেন! প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রাজসভায় সমিৎপাণি হইয়া উপস্থিত হইতেছেন! দেবরাজ ইন্দ্র দুর্লভ আত্মজ্ঞানের জন্য প্রজাপতির আশ্রমে একশত এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন! বিদ্যা-লাভের জন্য দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন তো সাধারণ নিয়ম।

দ্বিতীয় আশ্রম—গৃহস্থ আশ্রম। বিদ্যালাভ শেষ হইলে আচার্য্য অন্তেবাসীকে আহ্বান করিয়া অনুশাসন দিতেন,—

সত্যং বদ।—সত্য বাক্য বল।

ধর্ম্মং চর।—ধর্ম্ম আচরণ কর।

প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।—সন্ততি-ধারা বিচ্ছিন্ন করিও না।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।—সত্য হইতে প্রমত্ত হইও না।

ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্।—ধর্ম্ম হইতে প্রমত্ত হইও না।

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।—দেব ও পিতৃকার্য্য হইতে প্রমত্ত হইও না।

কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।—কুশল হইতে প্রমত্ত হইও না।

মাতৃদেবো ভব।—মাতাকে দেবতা জ্ঞান কর।

পিতৃদেবো ভব।—পিতাকে দেবতা জ্ঞান কর।

আচার্য্যদেবো ভব।—আচার্য্যকে দেবতা জ্ঞান কর।

অতিথিদেবো ভব।—অতিথিকে দেবতা জ্ঞান কর।

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি।—যে সকল কর্ম্ম অনবদ্য, তাহাই সেবন করিবে, অন্য কর্ম্ম নয়।

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্।—শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে।

অশ্রদ্ধয়াঽ দেয়ম্।—অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না।

হ্রিয়া দেয়ম্।—হ্রী বা লজ্জার সহিত দিবে।

ভিয়া দেয়ম্।—ভয় বা সম্ভ্রমের সহিত দিবে।

সংবিদা দেয়ম্।—সংবিদ বা জ্ঞানের সহিত দিবে।

এষা বেদোপনিষৎ।—ইহাই বেদ ও উপনিষৎ।

এই সকল অনুশাসন ও অন্যান্য অনুশাসন মান্য করিয়া কৃতবিদ্য যুবক বিবাহিত হইয়া পরিপূর্ণ যৌবনে পুণ্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন এবং বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা দেশ ও সমাজকে পালন করিতেন। এই ভাবে সংসারধর্ম্মে তপঃপূত জীবনে জ্ঞান ও কর্ম্মের স্বাভাবিক সমন্বয়ই ছিল সে যুগে যুগ-নায়কদের আদর্শ। সত্যকাম জ্ঞান লাভ করিয়া কুশলা পত্নীর সহায়তায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঋষি রৈক্ক রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া রাজার আচার্য্য হইলেন। উপনিষৎ হইতেই জানা যায় গূঢ় ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যার

প্রবর্ত্তক কোনও ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মর্ষি নহেন, রাজা ও রাজর্ষিগণ। ক্ষত্রিয়-পরম্পরাগত এই বিদ্যা রাজা প্রবাহণের নিকট হইতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে আরুণি গৌতম সর্ব্ব প্রথম লাভ করেন। জ্ঞান ও কর্ম্মের আশ্চর্য্য সমন্বয়ের ফলে অন্তরে জ্ঞানঘনমূর্ত্তি রাজন্যগণ উদার বিশ্বাত্মবুদ্ধিদ্বারা পৃথিবীর শাসন ও পালন করিয়া দৃশ্যে, গন্ধে, শব্দে, স্পর্শে ও রসে বিচিত্র এই সুন্দর সৃষ্টিকে বিবিধভাবে ভোগ করিতেন। ইহাই বেদ-সম্মত শুদ্ধ আর্য্য আদর্শ। এই বলিষ্ঠ গৃহস্থ আদর্শকে ধারণ করিবার জন্য পশ্চাতে ভিত্তি-স্বরূপ ছিল সংযম-সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরা ও পরা এই দ্বিবিধ বিদ্যাভ্যাস।

তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ এবং চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস। ঋষিরাজ যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার পর বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানযুগে সন্ন্যাস অর্থে যাহা বুঝায়, তাহা সে যুগে জ্ঞানসিদ্ধ ঋষিগণেরও সাধারণ আদর্শ ছিল না। সাধারণতঃ পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইলে গৃহস্থগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র সংসার-বিরতা ধর্ম্মচারিণী পত্নীকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে গমন করিতেন। তপোবনে ধারণা, ধ্যান ও তপস্যার ফলে সংসার-বাসনা ক্ষয় হইলে শেষে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মোক্ষলাভের নিমিত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন।

বৈদিক সমাজে নারীর স্থানও অতি উচ্চে ছিল। রাজর্ষি জনকের যজ্ঞ-সভায় নারী ঋষি গার্গী নিমন্ত্রিত হইয়া পূজ্য আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মবিচারে ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত সমানভাবে যোগ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের গৃহত্যাগের সময়ে যে বাক্য বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা চাহিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীতে অমর অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে,—

যেনাঽহং নাঽমৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্য্যাম্ ?

—যাহাতে আমি অমৃত হ'বনা, তাহা দিয়া আমি কি করিব ?

বাল্যে ও প্রথম যৌবনে ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যাদ্বারা লৌকিক বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ, পরিপূর্ণ যৌবনে গৃহধর্ম্ম আশ্রয় এবং দেশ ও সমাজের সেবা, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়-সাধনাদ্বারা এই সংসারে সত্য, জ্যোতি, আনন্দ ও অমৃতের নিত্য পরিবেশন এবং এই সাধনায় নরনারীর সমান অধিকার—ইহাই উপনিষদের শিক্ষার সার ; এই শিক্ষায়ই ভারত ও জগতের শাশ্বত সিদ্ধি ও মুক্তি বর্ত্তমান।

উপনিষৎনামে শতাধিক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। কিন্তু যে এগার খানি উপনিষৎ আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্কর ভাষ্য রচনা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সাধারণতঃ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া পরিগণিত হয়। এই এগারখানি উপনিষৎ হইতেছে,—ঈশাবাস্য, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক।

'ঈশাবাস্য' শব্দদ্বারা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া প্রথম উপনিষৎখানির নাম ঈশাবাস্যোপনিষৎ বা ঈশোপনিষৎ। ইহার প্রসিদ্ধ প্রথম মন্ত্রটি এই—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

—ঈশ্বরবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছাদন করিবে জগতের এই সকল পদার্থ, যাহা নিত্য গতিশীল এবং প্রকাশশীল। তাই ত্যাগের সহিত জগৎ ভোগ করিবে। কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।

কেনোপনিষদের নামও উপনিষদের প্রথম শব্দটি 'কেন' হইতে আসিয়াছে। শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'কেন'—কাহাদ্বারা প্রেরিত

হইয়া মন, প্রাণ এবং চক্ষু, শ্রোত্র ইন্দ্রিয়গণ কাজ করিয়া থাকে? ঋষি উত্তর করিলেন,—শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।

—শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, যিনি বাক্যেরও বাক্য, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু।

ঋষি বলিলেন,—যস্যামতং তস্যমতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।

—যিনি মনে করেন 'জানিনা,' তিনিই ব্রহ্মকে জানেন। যিনি মনে করেন 'জানি', তিনি ব্রহ্মকে জানেন না।

এই কেনোপনিষদেই ইন্দ্র ও উমার আখ্যায়িকা রহিয়াছে। জয় লাভ করিয়া ইন্দ্র ও দেবগণ অভিমানে গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। ইহা যে ব্রহ্মের মহিমা, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অগ্নি ও বায়ু যখন সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও একগাছি তৃণকে দগ্ধ বা বিচলিত করিতে পারিলেন না, তখন হতবুদ্ধি ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী বহু শোভমানা হৈমবতী উমা আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন, ব্রহ্মেরই বিজয় এবং ব্রহ্মেরই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া দেবতারা মহিমা লাভ করিয়াছিলেন।

নচিকেতা ও যমের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কঠোপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছে। সকল প্রলোভন জয় করিয়া বালক নচিকেতা যখন পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মবিদ্যা পাইতে চাহিলেন, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না, থাকিলে তাহার স্বরূপ কি, জানিতে চাহিলেন, যম তাহাকে উপদেশ করিলেন,—

প্রেয় ত্যাগ করিয়া যে শ্রেয়ের সন্ধান করে, তাহার পরম মঙ্গল হয়। মানুষের শরীর একটি রথের ন্যায়, বুদ্ধি হইতেছে এই রথের সারথি, মন রশ্মি, ইন্দ্রিয়গুলি পঞ্চ অশ্ব, আত্মা এই রথের রথী। অণু

হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতে মহীয়ান্ এই আত্মা। ইনি কখনও জাত বা মৃত হ'ন না ; ইনি পুরাণ পুরুষ, অজ, নিত্য, শাশ্বত ও চৈতন্যময়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অতীত, অনাদি ও অনন্ত, পরম্ ধ্রুব এই পুরুষ ! কিবা ইঁহার দীপ্তি, কি অপরূপ ইঁহার জ্যোতি ! সূর্য্য ইঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ইঁহার নিকট ম্লান হইয়া যায় ; অগ্নির কথা আর কি বলিব ! ইঁহার দীপ্তিতেই দীপ্তিমান্ হইয়া এই সমুদয় জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই আত্মাই পরম পুরুষ ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, অমৃত ও অভয়। ইনি এক হইয়াও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, রূপে রূপে বহুভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। ইনি আকাশের ন্যায় ব্যাপী ভূমা ; কিন্তু পরম আনন্দ-ঘন জ্ঞান ও চৈতন্য। নিখিল জগৎ সুপ্ত থাকিলেও এই পুরুষ সদা জাগ্রত থাকেন, ইনি জ্যোতির্ম্ময়, ইনি ব্রহ্ম, ইনি অমৃত। ইঁহাকেই আশ্রয় করিয়া সকল ভুবন প্রকাশ পায় ; কেহই ইঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য্য আলোক বিকিরণ করে ; ইন্দ্র, বায়ু এবং যম ইঁহারই শাসনে যথানিয়মে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্—ইনিই ভয়ঙ্কর বজ্রের ন্যায় সমুদ্যত রহিয়াছেন।

নিখিল বেদ ইঁহারই মহিমা গান করেন, তপস্বীর তপস্যা, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য ইঁহাকে পাইবার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। কে ইনি ? কি ভাবে ইঁহাকে লাভ করা যাইবে ? ঋষি সংক্ষেপে বলিতেছেন, ওমিত্যেতৎ—ইনি ওম্। ইঁহার প্রতীক এই প্রণব, এই প্রণবই ইঁহার উপাসনার শ্রেষ্ঠ আলম্বন। দুশ্চরিত হইতে বিরত না হইলে, শান্ত ও সমাহিত না হইলে ইঁহাকে পাওয়া যায় না। এই আত্মাকে বহু অধ্যয়ন বা শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা পাওয়া যায় না, কেবল মেধা দ্বারাও

ইঁহাকে লাভ করা সম্ভবপর নহে। এই পুরুষ প্রসন্ন হইয়া যাহাকে বরণ করেন, তিনিই কেবল আত্মাকে—তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে মনে সংযত করিবেন, মনকে বুদ্ধিতে সংযত করিবেন, বুদ্ধিকে তাহারও সূক্ষ্মরূপ মহত্তত্ত্বে সংযত করিবেন; এই মহত্তত্ত্বকে অবশেষে শান্ত আত্মায় সংযত করিবেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

—ওঠো, জাগো, বরণীয় পুরুষদের লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হও। জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, সে পথ ক্ষুরধারার ন্যায় নিশিত, দুরতিক্রমণীয় ও দুর্গম।

ইহাই সংক্ষেপে কঠোপনিষদের যমপ্রোক্ত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান।

প্রশ্নোপনিষদে জিজ্ঞাসু ছয়জন ঋষির ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন গুরু পিপ্পলাদ।

মুণ্ডকোপনিষদেও কঠোপনিষদের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান বা অপরাবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্ম পাওয়া যায় না, ইহা বুঝাইয়া আচার্য্য পরাবিদ্যা প্রকাশ করিলেন। সুদীপ্ত পাবক হইতে স্ফুলিঙ্গরাশির ন্যায় অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম হইতে নিখিল পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে। দিব্য সে পুরুষ মূর্ত্তিহীন; দ্যুলোক তাঁহার মূর্দ্ধা, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্ সকল তাঁহার কর্ণ, বাক্য হইতেছে বেদরাশি, বায়ু তাঁহার প্রাণ, হৃদয় এই বিশ্ব, চরণযুগ হইতে পৃথিবী জাত,—তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। অমৃতস্বরূপ এই ব্রহ্ম পুরোভাগে; ব্রহ্ম পশ্চাদ্ভাগে; ব্রহ্ম উত্তর, দক্ষিণ, উর্দ্ধ ও অধঃ

সকল দিক্ ব্যাপিয়া ; এই বিশাল বিশ্বই ব্রহ্ম। প্রণবরূপ ধনুর্দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে হইবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ— এই আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নয়। সত্যের দ্বারা ইনি লভ্য ; তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও সম্যগ্‌জ্ঞানদ্বারা ইহাকে পাওয়া যায় ; নির্ম্মলহৃদয় সাধকগণ শরীরের মধ্যেই এই শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকেন। ঋষির বাক্য মান্য কর—সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্। —সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের নহে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রণবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ঐতরেয় উপনিষদে শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা অল্পই।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের পিতা বরুণের নিকট হইতে পুত্র ভৃগুর ব্রহ্মবিদ্যালাভের কথা—'আনন্দোব্রহ্ম' এই তত্ত্ব পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বেদাধ্যয়নান্তে আচার্য্যের অন্তেবাসীকে প্রদত্ত অনুশাসন-গুলির কথাও এই উপনিষৎ হইতে গৃহীত। এই উপনিষদের একটি প্রসিদ্ধ বাণী—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতি।

—তিনি রসস্বরূপ, রসস্বরূপকে লাভ করিয়া পুরুষ আনন্দস্বরূপ হয়।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রাণায়াম, যোগ ও জ্ঞানের কথা এবং ব্রহ্মতত্ত্বের দুরূহ কথা বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। রুদ্র ও শিব নামে ব্রহ্মের উল্লেখ বহু মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। চমৎকার কয়েকটি প্রার্থনামন্ত্রও এই উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত। একটি প্রার্থনা এই,—

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া ন স্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাঽভিচাকশীহি॥

[শ্বেতাশ্বতর ৩—৫]

—রুদ্রদেবতা, মঙ্গলময়ী যেই তনু রাজে তব,
নহে নহে ঘোর, অপাপদীপ্ত, সুন্দর অভিনব,
মঙ্গলতম লয়ে সেই তনু ভুবনে ভুবননাথ!
হে গিরিশ! কর আমাদের পরে মঙ্গল আঁখিপাত!

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উভয়ই সুবৃহৎ উপনিষৎ, গদ্যে রচিত এবং আখ্যায়িকা-বহুল। উদ্দালক ও শ্বেতকেতুর আখ্যান, জাবাল সত্যকামের আখ্যান এবং ইন্দ্রের একশত এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন বা দেবাসুরের আত্মজ্ঞানের আখ্যান ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্তর্গত। এই উপনিষদের দুইটি প্রসিদ্ধ বাণী—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি। [ছাঃ উঃ—১৪-১]

—এই সকলই ব্রহ্ম, তাহা হইতে সকল জাত, তাহাতেই লীন এবং তাহাতেই সঞ্জীবিত আছে।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্;
[ছাঃ উঃ ৭-২৩]

—যাহা ভূমা, তাহাই সুখ; অল্পে সুখ নাই; ভূমাই সুখ।

জনকসভায় যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী, যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এই উপনিষৎখানি, কিন্তু অতি ছোট সুন্দর আখ্যায়িকাও ইহাতে দৃষ্ট হয়।

দেবতা, মানুষ ও অসুর একসঙ্গে গেলেন পিতা প্রজাপতির আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে। যথাসময়ে পৃথক্ ভাবে প্রজাপতি সকলকেই উপদেশ করিলেন—দ, দ, দ। দেবতারা বুঝিলেন—দ, দাম্যত—দমন কর। মানুষেরা বুঝিলেন—দ, দত্ত—দান কর। অসুরেরা বুঝিলেন—দ, দয়ধ্বং—দয়া কর। দ, দ, দ—প্রজাপতির

এই দেব-বাণী আজিও মেঘের নির্ঘোষে আকাশে ধ্বনিত হয়। ঋষি বলিতেছেন,—অতএব এই তিনটি শিক্ষা করিবে,—দম, দান ও দয়া।

এই বৃহদারণ্যকে দৃষ্ট হয়, তখনও একদল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন, যাঁহারা কেবলমাত্র আত্মজ্ঞান কামনা করিয়া পরম বৈরাগ্যভরে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা অর্থাৎ পুত্রলাভের ইচ্ছা, বিত্তলাভের ইচ্ছা এবং স্বর্গ-লোক লাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে আর প্রবেশ করিতেন না, বরাবর প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন,—আমরা পুত্রদ্বারা কি করিব, আমরা যে আত্মলোক বা পরমাত্মজ্ঞান পাইতে চাই! বৃহদারণ্যকের ঋষি বলিতেছেন,—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ,
প্রেয়ো ঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়ম্ আত্মা।

[বৃহঃ ১-৪-৮]

—সেই ইনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অন্য সকল হইতেই প্রিয়তর, ইনি যে অন্তরতর আত্মা।

বৃহদারণ্যকের ঋষি আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদি-ধ্যাসনের কথা বলিয়াছেন। আত্মদর্শনের জন্য আত্মার বিষয় গুরু-মুখে শ্রবণ করিতে হইবে, একান্তে মনন বা বিচার করিতে হইবে, অবশেষে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করিতে হইবে।

বৃহদারণ্যকের ঋষির প্রার্থনা মানুষের নিত্যকালের প্রার্থনা—

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যো র্মা ঽমৃতং গময়॥

[বৃহঃ ১-৩-২৮]

—অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও !
অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও !
মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও !

এই উপনিষৎ বা বেদান্তের উপরই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দর্শন, বেদান্ত-দর্শনের প্রতিষ্ঠা। বস্তুতঃ বেদান্তদর্শন বেদান্ত বা উপনিষৎকেই সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে। হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা যেমন বেদে, হিন্দুর অধ্যাত্মসাধনার প্রতিষ্ঠা তেমন এই উপনিষদে।

উপনিষৎ আবৃত্তি করিলেও অন্তরে সদ্য সদ্য অমৃত, অভয় ও আনন্দের স্পর্শ লাগে; ক্ষণতরেও যেন শোক-মোহ হইতে মুক্তি হয়; যুক্তিবিচার বিনাই কেবল শ্রবণমাত্র অন্তর পূর্ণ, শান্ত ও স্তব্ধ হইতে থাকে। আশ্চর্য্য এই জ্ঞানরাশি, আশ্চর্য্য ইহার শক্তি, অপূর্ব্ব ইহার মহিমা! এইরূপ দিব্য প্রভাব হিন্দুর কোন ধর্ম্মগ্রন্থের নাই, গীতারও নাই। হিন্দুর জ্ঞান-গঙ্গার আদি গঙ্গোত্রী এই উপনিষদের পরম ঋষিগণকে নমস্কার! পরম ঋষিগণকে নমস্কার!

নমঃ পরম ঋষিভ্যো নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ।

পূর্ণ মদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

[শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শান্তিপাঠ]

—পূর্ণ ঐ ঊর্দ্ধলোক! পূর্ণ হেথা এ বিশ্ব ভুবন!
পূর্ণ ব্রহ্মে ফুটে উঠে পূর্ণ হ'য়ে সৃষ্টি সুশোভন!
পূর্ণ হ'তে এল পূর্ণ, দীপ্ত তবু পূর্ণই পরম!
ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

রামায়ণ

রাম! রামচন্দ্র! রামভদ্র। কি পবিত্র মধুর এই নাম! ভারতবাসীর মুখে ভয়ের ক্ষণে আপনি ফুটিয়া উঠে অভয় এই নাম! মুমূর্ষুর রসনায় শেষ নিঃশ্বাসের সহিত উচ্চারিত হয় পুণ্য এই নাম! আবার ঘৃণায়, জুগুপ্সায় তাচ্ছিল্যভরেও উচ্চারিত হয় সহজ এই নাম। রাম নামের মহিমার কি ইয়ত্তা আছে! চৈত্রমাসের যে শুক্লা নবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হ'ন, ভারতবাসী ভক্তিভরে সে তিথি রামনবমী তিথি বলিয়া পালন করিয়া আসিতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মহত্ত্বরাশির এই অক্ষয় উৎস হইতে পিতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ, বন্ধু-সৌহার্দ্দ্য, সেবকবাৎসল্য, প্রজানুরাগ, মানব-প্রীতি, আত্মত্যাগ, সত্যপরায়ণতা, বীর্য্যবত্তা, কর্ত্তব্যতৎপরতার সহস্র ধারা ভারতবর্ষকে স্নিগ্ধ, পুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষও শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তির ধারায় অভিষিক্ত করিয়া এই মহামানবকে দেবদুর্ল্লভ মহত্ত্ব দিয়া পূজার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে। হিন্দুস্থান ভরিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির, ভারতের ভাষায় ভাষায় রামচরিত-কাহিনী, কবির কাব্যে এবং নটের অভিনয়ে তাঁহারই জীবনজ্যোতির প্রকাশ। কৃষকের কুটীরে আর ধনীর প্রাসাদে সমান ভক্তির সহিত তাঁহারই চরিত্র-পূজা। রামচন্দ্রের ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের রামচন্দ্র!

নবদূর্ব্বাদলশ্যাম নিখিলের নয়নাভিরাম রাম! তিনি সীতাপতি রাম, তিনি লক্ষ্মণপূর্ব্বজ ভরত-পূজিত রাম! তিনি দশরথকৌশল্যা-তনয় অযোধ্যাবাসীর হৃদয়ানন্দ রাম! গুহকের মিতা, সুগ্রীব-বিভীষণের সখা, হনূমানের প্রভু এবং আর্য্যবন্ধু বানরজাতির হিতৈষী,

আর্য্যশত্রু রাক্ষসজাতির শাস্তা রাবণ-নিধনকারী রাম! তিনি বশিষ্ঠ-বাল্মীকি-শিষ্য ধর্ম্মিষ্ঠ রাম! তিনি সূর্য্যবংশের অবতংস, ঋষিমুনি-সেবিত, রাজচক্রবর্ত্তী রাম!

রামনামের সহিত অভিন্নভাবে গাঁথা রহিয়াছে লক্ষ্মণ ও সীতা এই দুইটি নাম। আমরা বলি রামলক্ষ্মণ এবং রামসীতা বা সীতারাম! লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র এবং সীতার পাতিব্রত্য রামনামের মতই চিরসুন্দর, চিরপবিত্র এবং চির অক্ষয়।

রামচন্দ্রের আকর সূর্য্যবংশ বা রঘুবংশ। সূর্য্যবংশেই পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা, সগর, ভগীরথ প্রভৃতি রাজর্ষিগণের উদ্ভব। রঘু, দিলীপ, অজ ও দশরথ এই রাজন্যবৃন্দের পূর্ণ প্রভা যেন একত্র দীপ্তি পাইয়াছে রামচন্দ্রে। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তাঁহার শিক্ষাগুরু, তাপস-প্রধান বিশ্বামিত্র তাঁহার দীক্ষাগুরু। রামচরিত যেন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী-সঙ্গম। মূল দেবতার পার্শ্ববর্ত্তী দেবতার ন্যায় রামচন্দ্রের পার্শ্ববিহারী রহিয়াছেন সীতা, লক্ষ্মণ ও ভরত; পাদ-মূলে শোভা পাইতেছেন পরমভক্ত মহাবীর হনূমান। তান-লয়-সমন্বিত অনুষ্টুপ্ ছন্দের অম্লান মন্ত্রমালা রচনা করিয়া বন্দনা গাহিয়াছেন কবি-গুরু বাল্মীকি। বাল্মীকির পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া যুগে যুগে নূতন করিয়া অর্চ্চনা করিয়াছেন কবি কালিদাস, কবি ভবভূতি, কবি তুলসীদাস, কবি কৃত্তিবাস, আরও কত কবি ও নাট্যকার।

রামায়ণের বালকাণ্ডে রামচন্দ্রের অলোকসামান্য মহত্ত্বের সুপ্রকাশ না হইলেও একটি মহতী শক্তির আবির্ভাব যে ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। রামচন্দ্রকে শক্তিধর পুরুষ বলিয়া প্রথম চিনিতে পারেন বিশ্বামিত্র এবং তিনিই অগ্রসর হইয়া অযাচিতভাবে এই ক্ষত্রিয়কুমারকে

শিষ্যত্বে বরণ করেন। বিশ্বামিত্র দশরথকে বলিয়াছিলেন, কেবল রাক্ষস-বধের জন্য নহে, শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ হিতার্থেই তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন। কাকপক্ষধারী কুমার রামচন্দ্রের বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর। মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে বলা ও অতিবলা-নামক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রবিদ্যা প্রদান করিলেন। ইহার প্রভাবে বাহুবল, বুদ্ধিবল ও তপোবল বাড়ে, পরিশ্রম-বোধ থাকে না এবং রূপ-বিকার জন্মে না। গুরু বিশ্বামিত্র শিষ্যযুগলকে অমিতপ্রভাব-সম্পন্ন বিবিধ অস্ত্র শিক্ষা দিলেন; তাঁহাদিগকে তৃণশয্যায় শয়ন, নদীতে স্নানাহ্নিক সমাপন, এবং পদব্রজে পথ পর্য্যটনে অভ্যস্ত করিয়া ভবিষ্যৎ কঠোর জীবনের উপযোগী করিয়া গঠিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের মুখেই তাঁহারা সগরোপাখ্যান, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র যজ্ঞবিঘ্ন-কারিণী তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইলে তাঁহারই নির্দ্দেশে রামচন্দ্র প্রস্তরীভূত অহল্যার উদ্ধার সাধন করিয়া জনক-রাজ্যে পদার্পণ করেন এবং বিশাল হরধনু ভঙ্গ করিয়া জনকতনয়া সীতার পাণিগ্রহণ করেন। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কুলগুরু, তাঁহার কাছেই রামচন্দ্রের উপনয়ন এবং বিদ্যাভ্যাস। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার দীক্ষাগুরু, তাঁহার কাছে রামচন্দ্রের অস্ত্রবিদ্যালাভ, তপস্যালাভ, ভারতীয় সংস্কৃতিশিক্ষা এবং কর্ম্মদীক্ষালাভ; তাঁহার প্রসাদেই জীবন-সঙ্গিনী সীতার সহিত পরিণয় এবং পরে ক্ষাত্রশক্তি-উন্মূলনকারী অদ্বিতীয় বীর পরশুরামের পরাজয় সাধন। ঋষি বিশ্বামিত্রের জীবনে ইহাই বোধ হয় শেষ মহৎ কার্য্য; রামসীতা মিলনের পর তিনি হিমালয় পর্ব্বতে প্রস্থান করেন।

ঋষি বশিষ্ঠ ও ঋষি বিশ্বামিত্র ভারতীয় তপঃশক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ, ভাগ্যবান্ রামচন্দ্র এই পুণ্য ঋষিযুগলের সযত্ন চেষ্টায় নিজ শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ আজন্ম ঋষি, শুদ্ধচরিত্র ও তপোধন, শান্ত দান্ত, ক্ষমাবান্, মহাপ্রাজ্ঞ ও যোগসিদ্ধ, সতত ব্রহ্মর্ষি বলিয়া পূজিত। তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বিশ্বামিত্র তপোধন ?

বাস্তবিক ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস ও পুরাণে, মনে হয় পৃথিবীর কোন ভাষার কোন কাহিনীতে এত বড় প্রবল পৌরুষ, উদগ্র তেজ এবং অমিতশক্তির অপর উদাহরণ দেখা যায় না। ইনি দ্বিতীয় বিধাতার ন্যায় আপন মহিমায় স্বতন্ত্র হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিয়াছেন। অদ্ভুত ইঁহার পুরুষকার, অপূর্ব্ব ইঁহার সিদ্ধি এবং আশ্চর্য্য ইঁহার কর্ম্মরাশি! এ চরিত এত অসাধারণ, এত অচিন্তনীয় যে, ভারতবর্ষেও আমরা শ্রদ্ধাভরে শ্রবণ করিতে পারি, অনুসরণের কথা সহজে ভাবিতে পারি না।

গাধির নন্দন বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা। কামধেনু শবলাকে লইয়া বশিষ্ঠের সহিত সংঘর্ষে বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারেন, ব্রহ্মবলের নিকট ক্ষত্রবল তুচ্ছ। তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য সুকঠোর তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হইলেন। সেকালে গুণ ও কর্ম্মের অভাবে সমাজে যেমন পতিত হইতে হইত, তেমন তাহার উৎকর্ষে সমাজে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা লাভও সম্ভবপর ছিল। কত বাধা, কত প্রলোভন, কত কঠিন পরীক্ষা, যুগযুগব্যাপী দুষ্কর তপস্যায় তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। তপস্যা হইতে ভ্রষ্ট তিনি হইয়াছেন, কিন্তু আত্মাকে পরাজিত মনে করিয়া কদাচ তপস্যা ত্যাগ করেন নাই; আবার দৃঢ়তর সঙ্কল্প লইয়া তপস্যায় অগ্রসর হইয়াছেন। শুনঃশেফ ও ত্রিশঙ্কুর

দুঃখদর্শনে তিনি করুণায় বিগলিত হইয়া অলৌকিক কর্ম্মসাধন করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন; অপ্সরা মেনকার প্রণয়-লীলায় তিনি মোহের বশীভূত হইয়া কুটির রচনা করিয়াছেন; আবার অপ্সরা রম্ভার কামবিলাস দেখিয়া ক্রোধবশে তাহাকে অভিশাপ দিয়াছেন। কিন্তু বহু সাধনায় একে একে কাম, মোহ, ক্রোধ, চিত্তের সমস্ত মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বামিত্র অপূর্ব্ব তপঃপ্রভায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহাকে রাজর্ষি সম্বোধন করিয়া তুষ্ট করিতে পারেন নাই; তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিতে বাধ্য হইলেন। বশিষ্ঠও আহূত হইয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা দিলেন। লোকবিস্ময়-কর প্রভাব দর্শনে সমগ্র বেদবিদ্যা ও ওঙ্কার আসিয়া তাঁহাকে বরণ করিল। এই বিশ্বামিত্রই গায়ত্রীমন্ত্রের ঋষি, এই মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিলে তবে দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব জন্মে। বিশ্বামিত্রের জীবনী ও ব্রহ্মণ্য-লাভের বর্ণনাদ্বারা রামায়ণ আরম্ভ হওয়ায় রামায়ণের মহিমা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

এই এক আদর্শ, বশিষ্ঠ এক আদর্শ এবং শ্রীরামচন্দ্র অপর আদর্শ। এই আদর্শত্রয় যে দেশের ইতিহাসে বর্ত্তমান, সে দেশে ব্যর্থতা, ক্লীবতা, মোহ এবং স্বার্থপরতা আসে কেন, সে দেশের এই দুর্দ্দশা কেন?

শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শই শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন আদর্শ। অযোধ্যাকাণ্ডে অভিষেক-মুহূর্ত্তে কেবলমাত্র সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য রাজ্যত্যাগ এবং বনবাস গমনের মধ্যে এই আদর্শের পরিপূর্ণ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। আর প্রকাশ পাইয়াছে এ আদর্শ পালন— জীবনে ধর্ম্মের জন্য এই ত্যাগস্বীকার এবং দুখঃবরণ করা কত বড় কঠিন। মানুষ দূরের কথা, ইহা যেন দেবতাদেরও অসাধ্য। অযোধ্যা-কাণ্ডে রাজ্যশ্রী পরিত্যাগ দ্বারা অসাধ্য-সাধনের মধ্যে আমরা রামচন্দ্রের

যে সুবৃহৎ বজ্র-কঠোর চরিত্রের পরিচয় পাই, তাহাতে সীতা-উদ্ধারে রাবণনিধন-ব্রতী রামচন্দ্র, কিংবা জানকীর নির্ব্বাসন অথবা লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে উদ্যত রামচন্দ্র আমাদের তেমন বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। ইহা যেন রামচন্দ্রের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ছিল, ইহা না ঘটিলেই যেন অসম্ভাব্যতা আসিত। বাস্তবিক অযোধ্যাকাণ্ডের এই একটি ঘটনার মধ্যেই রামচন্দ্রের এবং সমগ্র রামায়ণকাব্যের মূল সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। উহাই নানা বিচিত্র তালমানের সঙ্গে বাজিয়া বাজিয়া উত্তরাকাণ্ডে সরযূ-সলিলে রামচন্দ্রের দেহ বিসর্জনের সঙ্গে থামিয়া গিয়াছে। সে সুরের রেশ আজিও ভারতবাসীকে বাঙ্গালীকে চঞ্চল করে, উন্মনা করে, মোহ চূর্ণ করিয়া কঠিন কর্ত্তব্যসাধনে তাহার চিত্তকে দৃঢ় করে, জীবনের অনিবার্য্য দুঃখকে প্রসন্নভাবে গ্রহণ করিবার উপযোগী বৈরাগ্য ও বীরত্ব দান করে ; ভোগ নয়, ত্যাগদ্বারা ও সংযম-দ্বারা সংসার ও রাষ্ট্রকে ধারণ করিবার শক্তি দেয়।

কৈকেয়ীর ইচ্ছায় এবং বিশেষভাবে পিতা দশরথের সত্য রক্ষা হইবে বলিয়াই রামচন্দ্র নিজের বিবেকের অনুমোদনে রাজ্য ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। পিতা দশরথ তাঁহাকে আদেশ দেন নাই, বরং তিনি বলিয়াছিলেন,—"বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার কর।" কৈকেয়ী চতুরতার সহিত কপটাচার এবং মিথ্যাভাষণদ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু বশিষ্ঠ, জাবালি বা মন্ত্রী সুমন্ত্র কেহই কৈকেয়ীকে সমর্থন করেন নাই ; বরং বিরুদ্ধযুক্তি দিয়াছেন। কৌশল্যাদেবী স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, মাতা পিতা অপেক্ষাও পরম গুরু, এবং মাতার আদেশ—রামচন্দ্র বনে যাইবেন না। লক্ষ্মণ এই অধর্ম্মের জয়ে উত্তেজিত হইয়া বৃদ্ধ দশরথকে বন্ধন ও বধ করিতে চাহিয়াছিলেন, ভরতকেও বধ করিয়া স্বীয় পৌরুষ-

দ্বারা রামচন্দ্রকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন। অন্তঃপুরের মহিষীবৃন্দ এবং রাজ্যের প্রজাগণ গগনভেদী আর্ত্ত চিৎকার করিয়া তাহাদের অমেয় দুঃখ ও অসন্তোষ জানাইয়াছিলেন। তথাপি যোড়ষবর্ষ-বয়স্ক রামচন্দ্র রাজ্য ত্যাগ করিলেন কেন?—এইখানেই তাঁহার মহত্ত্ব ও ধার্ম্মিষ্ঠতার পরিচয়। তিনি জানিতেন, দশরথ কৈকেয়ীর নিকটে ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ এবং ক্রোধাগার-স্থিত কৈকেয়ীর ইচ্ছা পূরণ করিবেন বলিয়া দ্বিতীয় সত্যে আবদ্ধ। তিনি স্বয়ং পিতার পরিম্লান দশা অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসিত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কৈকেয়ীর বাক্য পালন করিবেন। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত না হইলে, বাক্য সত্যানুসারী না হইলে সংসার চলিতে পারে না। বিশেষতঃ এখানে সত্যের রক্ষণে স্বার্থত্যাগ ও দুঃখভোগ এবং সত্যের লঙ্ঘনে স্বার্থসিদ্ধি ও বিলাস-সম্ভোগ। প্রশ্নটি ছিল এই "রাজ্যং বা বনবাসো বা"। সিদ্ধান্ত হইল—"বনবাসো মহোদয়ঃ।—বনবাসই মহাফলজনক।" সুখে বর্দ্ধিত যোড়শবর্ষীয় তরুণ যুবকের এই সিদ্ধান্ত, এবং সিদ্ধান্ত সেই মুহূর্ত্তে, যখন তিনি উপবাসী অবস্থায় পবিত্র পট্টবস্ত্রপরিহিত হইয়া যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন! রামচন্দ্র অনুরূপ অবস্থায় পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কি করিয়াছেন, স্মরণ করিলেন, ধর্ম্মের যুক্তিবল পরীক্ষা করিলেন এবং অচিন্তনীয় দৈবের প্রভাব উপলব্ধি করিলেন। রামচন্দ্র কর্ত্তব্যের শাসনে ক্ষুব্ধচিত্তকে শান্ত করিয়া মুখে কোন বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দিলেন না। তিনি সেই হৃষ্টচিত্ত, চিরধীর প্রশান্ত রামচন্দ্র। পরিণত বয়সে আর একবার তাঁহাকে স্বীয় কঠিন প্রতিজ্ঞা রক্ষার প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং লক্ষ্মণের আনুকূল্যে সহজেই তিনি লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে সম্মতি দিয়া সেই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের আশ্চর্য্য ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া মাতা কৌশল্যা সান্ত্বনালাভ করিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার জন্য মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। সীতাদেবীর কথা আর বলিতে হইবে কি? একমাত্র তিনিই রামচন্দ্রকে বনগমনে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহেন নাই। বিবাহের পর এক বৎসর কালের মধ্যেই তিনি রামচন্দ্রের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন এবং স্বামিসত্তায় নিজ সত্তা মিলিত করিয়া দিয়াছেন। স্বামীর কণ্ঠবিলম্বিনী হইয়া তিনি যখন অশ্রুজলে বলিলেন, "আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, তোমার সঙ্গে যাইব, অন্যথায় আমি বিষপানে দেহ নষ্ট করিব। তোমার বিরহে আমি বাঁচিব না, আমি বনবাসের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি";—তখন রামচন্দ্রের সকল ভয়-প্রদর্শন ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি সীতার প্রেমে দ্রবীভূত হইলেন এবং পূর্ব্বতন বানপ্রস্থাবলম্বী রাজর্ষিগণের ন্যায় পত্নীকে সহচারিণী করিয়া বনগমনে উদ্যত হইলেন। রামচন্দ্রের অটল সঙ্কল্পদর্শনে লক্ষ্মণ অভিভূত হইয়া অগ্রজের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং রাজ্যসুখ, মাতা ও পত্নী পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের বনবাসের সেবক ও সঙ্গী হইবার অনুমতি চাহিলেন। লক্ষ্মণ ছিলেন রামচন্দ্রের অপর প্রাণের ন্যায়—'প্রাণ ইবাপরঃ'। পুরুষকারের জ্বলন্ত বিগ্রহ, নির্ভীক্-স্বভাব লক্ষ্মণ ছিলেন স্পষ্টবক্তা; কিন্তু অগ্রজের শাসন মান্য করিতে গিয়া তিনি অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে সীতার চিতাসজ্জাও রচনা করিয়াছেন, অথবা পূর্ণগর্ভা জানকীকে বনে নির্ব্বাসিতও করিয়াছেন। লক্ষ্মণ-বর্জ্জনও লক্ষ্মণের নির্ব্বন্ধের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছিল।

অদৃষ্টের এই বিপর্য্যয় দর্শনে অন্তরে রামচন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, এবং সে ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছিল বনবাসের প্রথম রাত্রিতে। বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় লইয়া অরণ্য-বাসের দুঃসহ ক্লেশের মধ্যে তিনি দশরথের

ও কৈকেয়ীর আচরণ স্মরণ করিয়া পরিতাপ করিয়াছেন। আর যে দিন রাবণ-কর্ত্তৃক সীতাহরণ হয়, সেদিনও রামচন্দ্র কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন। সমগ্র জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, রামচন্দ্র মানুষ ছিলেন, কিন্তু অমানুষী শক্তিবলে মানুষোচিত স্বাভাবিক ভুলভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মার পরম জয় ঘোষণা করিয়াছেন।

চিত্রকূট-পর্ব্বতে ভরতের আত্মনিবেদনের দৃশ্য কি অপূর্ব্ব! রামচন্দ্র অতি মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু ভরতের এ মহত্ত্বেরই বা তুলনা কোথায়? ভরত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কে ভাবিতে পারিয়াছিল অযত্ন-প্রাপ্ত রাজ্য ভরত অগ্রজের পদতলে লুটাইয়া দিয়া, তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তনে সম্মত করাইবার জন্য প্রায়োপবেশন অবলম্বন করিবেন? কে ভাবিতে পারিয়াছিল অবশেষে রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল সম্বল করিয়া, রামচন্দ্রেরই ন্যায় জটাচীর ধারণ-পূর্ব্বক ভোগসুখে বিমুখ হইয়া, ভরত অযোধ্যার বহির্ভাগে নন্দীগ্রামে চতুর্দ্দশ বর্ষ রামচন্দ্রের প্রতিনিধি-স্বরূপে কঠিন রাজ্যভার বহন করিবেন? ভরতের তুলনা ভরত এবং রামচন্দ্রের তুলনা রামচন্দ্র। উভয়েই সুমহান্ ধর্ম্মবীর, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। ভরত এইভাবে জননী-কৃত পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে রামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠার শেষ পরীক্ষা সম্পন্ন হইল। অযোধ্যার প্রজামণ্ডলী, বশিষ্ঠ-জাবালি, কৈকেয়ী-কৌশল্যা এবং ভরত-শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক প্রদত্ত অযোধ্যারাজ্য তিনি দ্বিতীয় বার প্রত্যাখ্যান করিলেন; তাঁহার যুক্তিবলের নিকটে অপর সকলের যুক্তিবল পরাভূত হইল। শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণেরই ন্যায় গুণসম্পন্ন, ছোট লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র ও ভরতের সুযোগ্য ভ্রাতা।

রামায়ণ কাহিনী সকলেরই পরিচিত, অতি পরিচিত। ইহার অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া সীতাপতি রামচন্দ্র এবং অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া রামময়-জীবিতা সীতা। বনবাসের প্রাক্‌কালে সীতা রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে বীর সত্যবানের অনুব্রতা সাবিত্রীর ন্যায় জানিও।" ভারতীয় নারীকুলে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দিয়াছেন দেবী সাবিত্রী ও দেবী সীতা। কিন্তু সাবিত্রী অপেক্ষাও সীতার জীবনে সে মর্য্যাদা সেবায় সৌন্দর্য্যে, প্রেমে ও মাধুর্য্যে, মিলনে বিরহে, দুঃখে ও লাঞ্ছনায়, চরম ও পরম ত্যাগে মহিমান্বিত, ধন্য হইয়া উঠিয়াছে। গোদাবরী-তীরে পঞ্চবটী বনে উদার অরণ্যপ্রকৃতির শুদ্ধ সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রেম গাঢ়, প্রগাঢ় হইতে থাকে। 'বনোন্মত্তা' মৈথিলীর সঙ্গ-সুখে তৃপ্ত হইয়া রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতেই সীতাকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার সহিত বাস করিয়া অযোধ্যার রাজ্য-পদে আর স্পৃহা করি না।" বানবাসসঙ্গিনী প্রেমপুত্তলী সীতার স্বামিসেবার সার্থকতা এখানেই। রামচন্দ্র মুনিগণের অনুরোধে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে বধ করিতে থাকিলে সীতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "পরিব্রাজকের বেশ ধারণ করিয়াছ, এখানে আর রাক্ষসদিগের শত্রুতা করিও না, অস্ত্র-চর্চ্চায় বুদ্ধি কলুষিত হয়, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অযোধ্যায় গিয়া আচরণ করিও।" রামচন্দ্র করুণাময়ী সীতার সেকথা শুনেন নাই। সীতাই কি সর্ব্বথা শুনিতে দিয়াছেন ?

সীতার জীবনে দুইটি হৃদয়-হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, এক, রাজভগিনী শূর্পণখার তাদৃশ লাঞ্ছনা ঘটান ; দ্বিতীয়, মারীচের ছদ্মকণ্ঠ শুনিয়া লক্ষ্মণের প্রতি তাদৃশ কটূক্তি বর্ষণ। দুইটি ভুলের মিলিত পরিণাম সীতাহরণ। শূর্পণখা সীতাহরণে রাবণকে উত্তেজিত করে এবং লক্ষ্মণের অনুপস্থিতির সুযোগে রাবণ সীতাহরণ করে।

কিন্তু কৈকেয়ীর বনবাসাজ্ঞায় যেমন রামচন্দ্রের চরিত্র-মাহাত্ম্য এক মুহূর্ত্তে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে, এই সীতাহরণ ঘটনায়ও সীতাদেবীর পরিপূর্ণ মহিমা অনন্তকালের নিমিত্ত নিখিলের গোচর হয়। কারুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি রামময়-জীবিতা দুঃখিনী সীতা,—সে তো অশোক-বনে বন্দিনী সীতা, আপন সতীত্বের প্রভায় উদীয়মানা উষার ন্যায় সতত স্নিগ্ধা, সুন্দরী ও ভাস্বতী। রাবণবধ দ্বারা ক্ষুব্ধ রামচন্দ্রের ভীম সঙ্কল্প-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই ঘটনা রামসীতার প্রেমকেই সমধিক মহিমান্বিত করিয়া দেখাইয়াছে। রামচন্দ্রের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি রাবণের লঙ্কাপুরী হইতেও শুদ্ধা প্রেমময়ী সীতাকেই ফিরিয়া পাইবেন: তাই অরণ্য ও সমুদ্রের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ঘুচাইয়া তাহার করাল কার্ম্মুক অসাধ্য সাধন করিয়াছিল। সীতাও মর্ম্মে মর্ম্মে জানিতেন, রামচন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিবেনই, পথে পথে অলঙ্কার-রাশি উন্মোচন বৃথা হইবে না, তাই শত্রুপুরী মধ্যেও তিনি দুঃখের কারণভূত সুন্দর দেহখানি বিসর্জ্জন দেন নাই। সীতাচরিত্রের দীপ্ত তেজের চকিত স্ফুরণ দেখা যায়, যখন বনবাসের প্রাক্কালে তিনি ভয়-প্রদর্শনকারী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "নিজের স্ত্রীকে যে পার্শ্বে রাখিতে ভয় পায়, সে নারী-প্রকৃতি পুরুষের হস্তে পূর্ব্বে জানিলে পিতা আমাকে কিছুতেই সমর্পণ করিতেন না।" সে ক্রুদ্ধ তেজের বজ্র-স্ফুরণ অনুভব করি, যখন সীতা পরিব্রাজকবেশী রাবণের প্রতি অগ্নিময়ী বাক্যজ্বালা বর্ষণ করিয়াছিলেন। চেড়ীদল বা রাবণ সকলেই অনশন-কৃশা, সাশ্রুলোচনা, হিমাগমে পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণ-তনু তাপসীর সম্মুখে খদ্যোতের ন্যায় নিস্তেজ ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল!

রাবণ-বধের পর অগ্নি-পরীক্ষার চিতাগ্নি প্রস্তুত হইয়াছিল স্বয়ং সীতারই ইচ্ছায় রামচন্দ্রের অনুমোদন-ক্রমে। সীতার বিচ্ছেদ-বিহ্বল রামচন্দ্র রাবণবধের পর সহসা স্তব্ধ, গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, এবং লোকনিন্দার আশঙ্কায় সীতার প্রতি বিরূপ হইয়া বিসদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কুসুম হইতে মৃদু এবং বজ্র হইতে কঠোর লোকোত্তর পুরুষদের চরিত্র সত্যই অতি জটিল, দুর্জ্ঞেয়!

হায়! যখন আর আশঙ্কামাত্র নয়, অযোধ্যার গৃহে গৃহে রাবণ-স্পৃষ্টা রাজমহিষী সীতার সম্বন্ধে দারুণ লোকাপবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল, নির্ব্বাসনদণ্ডরূপে সীতার জীবনের দুর্ব্বিষহ দুঃখ আসিল তাঁহারই প্রিয়তম স্বামী অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের হস্ত দিয়া! রামচন্দ্রের বনবাস-দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়াছিলেন প্রণয়-প্রতিমা সীতা, রামচন্দ্রের দেওয়া সীতার এ বনবাস-দুঃখকে সহনীয় করিবে কে? উদরে রামচন্দ্রের বংশধর, তাই ভাগীরথী-সলিলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদুঃখের অতীত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সীতা সকলের মঙ্গল কামনা করিলেন এবং রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রেম ও তাঁহার প্রতি রামচন্দ্রের প্রেম স্মরণ করিয়া বাল্মীকির তপোবনে প্রবেশ করিলেন। সীতার প্রতি কি সুগভীর বিশ্বাস ও সুদৃঢ় প্রেম থাকিলে, প্রজাসমাজে আদর্শ-শুদ্ধি রক্ষার জন্য প্রজারঞ্জন-ব্যপদেশে সীতাকে ত্যাগ করা সম্ভবপর হয়, এবং রামচন্দ্রের প্রতিও কি সুগভীর বিশ্বাস ও সুদৃঢ় প্রেম থাকিলে, দয়িতের হস্ত হইতে রাজবিধানকে দৈববিধান বলিয়া মান্য করা যায়,—তাহা বুঝা ক্ষীণদৃষ্টি ও ক্ষীণপ্রাণ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। রামচন্দ্রের দুঃখকে কবি ভবভূতি পুটপাকের ন্যায় অন্তর্গূঢ় ও ঘনব্যথ বলিয়াছেন, এ দুঃখের পরিমাণ করিবে কে? সুবর্ণময়ী সীতা-প্রতিমা

ধা অশ্বমেধ যজ্ঞের বিপুল আয়োজন কিছুই সে চিত্তে সান্ত্বনা দিতে পারে নাই। তিনি নিজের হস্তে নিজের হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়াছেন। এই রামচন্দ্রের শাসিত রাজ্যই আজ পর্য্যন্তও রামরাজ্য বলিয়া দুর্লভ আদর্শরূপেই পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সীতার অবসান এবং অল্পকাল পরে রাম-লক্ষ্মণের জীবনাবসান ঘটিল। এবার সীতা মুক্ত, যুগল সূর্য্যের ন্যায় লবকুশ রামচন্দ্রের রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া দণ্ডায়মান। তাহাদের সম্মুখে আবার রামচন্দ্র সীতার পরীক্ষা চান? অভিমানিনী সীতা পরীক্ষা দিলেন, এবং দুঃখক্রটিভ্রম-বহুল, অসত্য ও লাঞ্ছনাময়, মার্জ্জনা ও বিবেচনা-হীন সংসারের অতীত দেশে প্রস্থান করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের চরম জয় ঘোষণা করিলেন। হায়! জন্মদুঃখিনী সীতা! কবে তোমাকে হরণ করিবার সময়ে রাবণ স্পর্শ করিয়াছিল, এবং অশোক বনে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল; অগ্নি-পরীক্ষা ও নির্ব্বাসন-দণ্ডেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইলনা! শেষে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া জনগণের সংশয় অপনোদন করিলে! রহিল শুধু কল্পান্ত-স্থায়ী একটি নাম—সতী সীতা!

একটি চরিত্রের উল্লেখ না করিলে রামায়ণের কোন আলোচনাই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সে চরিত্র সুগ্রীব, বিভীষণ বা গুহক মিতা নয়, মতঙ্গ আশ্রমের শবরী তাপসী নয়, সে চরিত্র মহাভক্ত, মহাবীর, মহাপণ্ডিত, অদ্ভুতকর্ম্মা মারুতি। তপঃশুদ্ধ, সুগঠিত-দেহ, চিরব্রহ্মচারী মারুতি ছিলেন অপূর্ব্ব বল ও শক্তির আধার। সুগ্রীবের দূতরূপে ইনিই প্রথম রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অচিরে ভ্রাতৃযুগলের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ইনিই প্রথম রামচন্দ্রের দূতরূপে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া অশোকবনে বিলাপ-রতা সীতাকে

রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক-সহ আশাপূর্ণ সান্ত্বনা দান করেন। প্রথম সাক্ষাতেই রামচন্দ্র সবিস্ময়ে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "এ ব্যক্তির উচ্চারিত বহু কথার মধ্যে একটিও অপশব্দ শ্রুত হইল না। ব্যাকরণ-শাস্ত্র এবং ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে পারদর্শী না হইলে এভাবে কেহ কথা বলিতে পারে না। ইহার কণ্ঠোচ্চারিত বাণী হৃদয়ে হর্ষের সঞ্চার করে।" হনূমানের দাস্যভক্তি ও বলবীর্য্যের কাহিনী সকলেরই পরিজ্ঞাত। অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া সীতাদেবী স্বীয় কণ্ঠের বহুমূল্য মণিহার উপহার দিয়া তাঁহার স্নেহের পরিচয় মাত্র দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ রামচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার এই শ্রেষ্ঠ সেবকের উদ্দেশ্যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে ; এই বানরকুল-বরেণ্যকে মহাভক্ত ও মহাবীররূপে নিত্য পূজা করিয়া আসিতেছে।

সে যুগে রামচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া আর্য্য ও অনার্য্যের মিলন দৃঢ় হইতে থাকে ; অনার্য্য জাতি বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া আর্য্যজাতির প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে থাকে। মারুতির সম্মান ও পূজা আর্য্যজাতির উদারতার ও কৃতজ্ঞতা-বোধেরই পরিচায়ক। রামচন্দ্রের বাল্যসখা ছিলেন নিষাদরাজ গুহক, যৌবনসখা হইলেন বানরমুখ্য সুগ্রীব। দশরথের সময়েও এই মিলনকার্য্য চলিতেছিল, দশরথের সখা ছিলেন পক্ষিরাজ জটায়ু, ইনি রাবণের কবল হইতে সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া স্বেচ্ছায় আত্মপ্রাণ বলি দিয়াছিলেন। ভল্লূকজাতিও আর্য্যদের মিত্র ছিল। কেবল রাক্ষসগণ আর্য্য-সভ্যতার একান্ত পরিপন্থী ছিল বলিয়া তাহারা বৈরি বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে। বিভীষণই বোধ হয়, সে যুগে রাক্ষসজাতির মধ্যে আর্য্যগণের প্রথম মিত্র। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সংস্কৃতি-ধারাকে এক আর্য্য-ধারায় সমন্বিত করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি নিজ

বিশিষ্টরূপে সে যুগেই প্রথম প্রকাশ পাইতে থাকে। ভারতীয় সংস্কৃতি অপর সভ্যতা আত্মসাৎ করিয়া আজও নিজ অঙ্গ পুষ্ট করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিশাল মন্দিরে এক অখণ্ড সত্যের আশ্রয়ে সকল খণ্ড সত্যেরই স্থান আছে।

রামায়ণ হইতে তৎকালীন সমাজ-সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। রামায়ণের আর্য্যসমাজ মনু-প্রবর্ত্তিত বিধিদ্বারা কঠোরভাবে শাসিত হইত বলিয়া মনে হয়। করুণাবতার রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক শূদ্র তপস্বী শম্বূকের শিরশ্ছেদ উহারই একটি প্রমাণ। রাজা দেশের শাসন-কর্ত্তা হইলেও ব্যবস্থা-শাস্ত্র প্রণয়নের ভার ছিল ঋষি বা ব্রাহ্মণ-গণের উপরে। শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা স্বয়ং রাজারও ছিলনা; সুতরাং প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণগণই শাসনযন্ত্রের পরিচালক ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে ক্ষমতালোভী ও ধনলোভী হইতে লাগিলেন; ক্ষত্রিয়গণও স্বেচ্ছাচারী এবং দাম্ভিক হইতে লাগিলেন। ফলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে ঘোর প্রতিযোগিতা ও বিরোধ উপস্থিত হইল। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের সংঘর্ষ, এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের হস্তে জমদগ্নির প্রাণনাশ ও প্রতিশোধ গ্রহণ-কল্পে পরশুরাম-কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়-বংশ ধ্বংস—এই দুইটি ঘটনা বাস্তবিকই শোচনীয়! বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কলহে আভীর, পহ্লব, যবন, কিরাত, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি ভারত-বহির্ভূত বীরজাতিগুলি বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ক্ষাত্রশক্তিকে পর্য্যুদস্ত করে এবং বৈদিক ধর্ম্মে ও ভারতবর্ষে আশ্রয় লাভ করে। আর্য্যেতর সাহসী যোদ্ধৃজাতি ইহার পূর্ব্বেও ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আর্য্যসমাজের বল বৃদ্ধি করিয়াছে। রামায়ণ হইতে জানা যায়, মহর্ষি অগস্ত্য সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণভারতে পদার্পণ করেন এবং আর্য্য-শত্রু রাক্ষসদের সংহার করিয়া সেখানে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করেন।

তথাপি রামায়ণের কথা মুখ্যতঃ ঘরের কথা, একটি পরিবারের ঘরোয়া কাহিনী। সে পরিবার অযোধ্যার রাজপরিবার, কিন্তু রাজনীতি বা রাজধর্ম্মের সম্পর্ক আখ্যানে ক্বচিৎ প্রবল হইয়াছে। মাতার ও পিতার সহিত পুত্রের সম্পর্ক, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালবাসা, পতির সহিত পত্নীর প্রেমবন্ধন এবং প্রভুর সহিত সেবকের হৃদ্যভাব, আর এই সকল আদর্শের উপলব্ধি রামায়ণের আসল কথা। তাই ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে এই গৃহাশ্রমধর্ম্মের কাব্যখানি মহাভারত অপেক্ষাও অধিক আদৃত হইয়াছে। ইহার শক্তি সমুচ্চ নীতি ও ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধি-ধৃত অধ্যাত্মবাদ এবং মহাভারতীয় নিষ্কাম-ধর্ম্ম তখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত উভয়েরই মর্ম্মবাণী সেই প্রাচীন বৈদিক ঋষির অলৌকিক উপলব্ধি—

ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ।

—ত্যাগ দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

আদি কবি বাল্মীকিকে প্রণাম। তিনি নাকি রত্নাকর দস্যু ছিলেন, 'মরা' 'মরা' জপিতে জপিতে তাঁহার রসনায় রামনাম স্ফুরিত হয়। সেই মধুর রামনাম আশ্রয় করিয়া তিনি রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের গুরু ও আচার্য্য; কিন্তু ঋষিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রের দ্রষ্টা ও রামায়ণের স্রষ্টা। বাল্মীকির মানসকমল-বিহারী রামচন্দ্রই ভারতবর্ষের রামচন্দ্র, বাল্মীকির ধ্যানের সীতাই ভারতবর্ষের সীতা! হে কবি! তুমি অমর, তোমার রামায়ণ-কথাও অমর।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

—যতকাল পৃথিবীতে পর্ব্বতমালা ও নদনদী বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল লোকসমাজে রামায়ণকথাও প্রচারিত থাকিবে।

মহাভারত

বিশাল কাব্য এই মহাভারত, ইহা হিন্দুর শ্রেষ্ঠ পুরাণ ও ইতিহাস, হিন্দুর পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্ফীত ক্ষাত্রশক্তির অহমিকা-মত্ত উচ্ছ্বাস, মগধ মথুরা, কুরু ও পাঞ্চাল, ভারতের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রবল সংঘাত, বৃহৎ ব্যক্তিত্ব ও মহৎ নেতৃত্বের অবিরাম সংঘর্ষ, রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপনের বিপুল প্রয়াস, অন্তরস্থ প্রবৃত্তি-নিচয়ের অনাবৃত প্রকাশ এবং তাহারই মধ্যে সত্য-ধর্ম্ম, যোগধর্ম্ম ও নিষ্কামধর্ম্ম সাধনা! এ যেন এক সংক্ষুব্ধ মহা-সমুদ্র, উপরিভাগে উন্মত্ত তরঙ্গমালার বিরামহীন বিক্ষোভ ও গর্জ্জন, অন্তরে অন্তরালে শান্ত, স্তব্ধ, অনন্ত জলরাশি—মহামানব শ্রীকৃষ্ণ আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত! এই মহাভারতের ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র হইতেই যোগস্থ পার্থ-সারথির কণ্ঠে কর্ম্মভক্তিজ্ঞানময়ী গীতার মহাবাণী ধ্বনিত হইয়াছে!

মহাভারতের আদিপর্ব্বে লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত-কাহিনীর মর্ম্মকথা রূপক-আশ্রয়ে মাত্র দুইটি শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে,—

দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনি স্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥

—দুর্য্যোধন অহঙ্কারময় মহাবৃক্ষ; সেই বৃক্ষের স্কন্ধ কর্ণ, শকুনি তাহার শাখা, দুঃশাসন তাহার সমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল, আর তাহার মূল প্রজ্ঞাহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র।

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥

[আদিপর্ব্ব ১-১১০, ১১১]

—যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ ; সেই বৃক্ষের স্কন্ধ অর্জ্জুন, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব তাহার সমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল, আর তাহার মূল শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্‌গণ।

দুই প্রবল শক্তির সংঘাতকে অবলম্বন করিয়া মহাভারত কাব্য পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিয়াছে। একটি শক্তির শেষ প্রধান আশ্রয় দুর্য্যোধন ; কংস ও জরাসন্ধ এই শক্তির পূর্ব্ব আশ্রয়। রাষ্ট্র লাভ করিয়া যিনি তাহাকে ধৃতই রাখিতে চাহিয়াছেন, প্রজ্ঞা ও ধর্ম্ম-দৃষ্টি কদাচ অবলম্বন করেন নাই, সেই অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনরূপ মহাবৃক্ষের মূল। লোভ, ঈর্ষ্যা, কপটতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার ও ও হিংসা দ্বারা নিজ স্বার্থ ও পুত্র দুর্য্যোধনকে তিনি পুষ্ট করিয়াছেন : কখনও তাঁহাকে শাসন করিয়া সত্য ও ধর্ম্মের পথে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন নাই। এই বিপুল কুরুকুল-ক্ষয়ের মূল কারণ ধৃতরাষ্ট্রের স্বার্থ-পর প্রজ্ঞাহীনতা। অন্ধকারে বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় কখন কখন তাঁহার যে উদারতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা মহাত্মা বিদুর ও ধর্ম্মিষ্ঠ ভীষ্মদেবের প্রভাব-ফল ; বিশেষতঃ তাহা নিজ পুত্রগণের অমঙ্গলাশঙ্কা হইতে জাত। তেজস্বী কর্ণ এই বৃক্ষের স্কন্ধরূপে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, এবং খলবুদ্ধি শকুনি শাখারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় শক্তির প্রধান আশ্রয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ইহার মূল মহা-মানব শ্রীকৃষ্ণ, বেদপ্রজ্ঞা দ্বারা তিনি পরিচালিত। এই শক্তিই ধর্ম্ম।

এই দুই শক্তির শেষ বলাবল পরীক্ষিত হইয়াছে যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে; ধর্ম্মের জয় ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে এবং শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতের শেষ শিক্ষা ধর্ম্ম-দর্শিনী গান্ধারী ও মহাত্মা বিদুরের মুখে বহুবার ঘোষিত হইয়াছে,—

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

—যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়।

অপূর্ব্ব মনস্বিতার সহিত বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যানের মধ্য দিয়া এই মূল মর্ম্মবাণী কতরূপেই না প্রচারিত হইয়াছে! মহাভারতের কর্ম্মপ্রেরণা রামায়ণের ন্যায় কেবল শুদ্ধ নৈতিক জগৎ বা শুদ্ধ ভাবের জগৎ হইতে আসে নাই; একটা বলিষ্ঠ প্রজ্ঞা-দৃষ্টি ইহাকে পূর্ণতা ও মহনীয়তা দিয়াছে। নীতিবাদ যেখানে অধ্যাত্মবাদে মিশিয়া গিয়াছে, সেখানেই মহাভারতীয় জীবনের কর্ম্ম-প্রেরণার মূল উৎস। এই উৎস-মূলে দণ্ডায়মান স্থিরপ্রজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া মহাভারতের জটিল জীবনচক্র প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। তিনি মানব, মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাপ্রাজ্ঞ, মহাযোগী, মহাকর্ম্মী, মহাত্যাগী, ব্রহ্মণ্য ও ক্ষাত্র শক্তির মিলিত মূর্ত্ত প্রকাশ, তিনি পরিশুদ্ধ পূর্ণ মানব; তাই মানবত্ব ও দেবত্বকে অতিক্রম করিয়া ভাগবত-সত্তায় আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করি এবং আমরা বলি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। হিন্দুস্থানে তিনি যুগ যুগ ধরিয়া নারায়ণের শ্রেষ্ঠ অবতাররূপে পূজিত হইতেছেন। কোন দেহ-ধারী মানব ভারতবর্ষে অদ্যাবধি এত সম্মান, এত পূজা লাভ করেন নাই। কত কাব্য, কত স্তব তাঁহার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে; কত তীর্থ, কত মন্দির তাঁহার বিচিত্র মহিমা ঘোষণা করিতেছে! তাঁহার জন্ম-তিথি ভাদ্র-মাসের অসিত পক্ষের অষ্টমী তিথি পুণ্য জন্মাষ্টমী বলিয়া ভারতবর্ষের

সর্ব্বত্র বিপুল উৎসবের সহিত পালিত হইয়া আসিতেছে। ঐ দিন ভূভার হরণ করিতে এবং ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ! তিনিই মহাভারতের শ্রেষ্ঠ মানব, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মানব! মানব-ভাবেই তিনি নিজেকে পরিচিত করিয়াছেন, মানব-ভাবেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গৌরব আমরা উপলব্ধি করি। আর ব্রহ্মের যাবতীয় প্রকাশের মধ্যে মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট শরশয্যায় শয়ান প্রজ্ঞাবান্ ভীষ্ম এই পরম রহস্যটি প্রকাশ করিয়াছেন,—

গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি
ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ ॥

[শান্তিপর্ব্ব, ২৯৯-২০]

—তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ রহস্য আজ বলিতেছি, মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।

মহাভারত গ্রন্থকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, তাহার পূর্ব্বভাগ এবং পরবর্ত্তী ভাগ,—এই তিন ভাগে আলোচনা করা যাইতে পারে। ভারতের ইতিহাসে যে সকল ঘটনার অনিবার্য্য পরিণাম এই ক্ষত্রকুলক্ষয়-কর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, তাহা আগে বুঝিতে হইবে।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম আবির্ভাব দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়; যদুবীরগণ কেহই দ্রৌপদীর পাণি-প্রার্থী ছিলেন না, সেখানে দর্শক ছিলেন মাত্র। ইহার পূর্ব্বে ভীমকে বিনাশ করিবার জন্য দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বিষ প্রয়োগ, কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবের ধ্বংসের জন্য জতুগৃহ-দাহ, দুর্য্যোধন ও কর্ণের সখ্য-বন্ধন প্রভৃতি ঘটনা ধৃতরাষ্ট্র-সহায় দুর্য্যোধনের অন্যায় রাজ্যাভিলাষ ও পাপমূর্ত্তি প্রকট করিতেছিল। পাণ্ডবগণ এতদিন মহাত্মা বিদুরের বুদ্ধিবলে রক্ষিত

হইতেছিলেন। দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া পাঞ্চাল-শক্তির সহিত মিলিত হইবার পর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি ও মন্ত্রণা-বলে চালিত হইতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন অনেক পূর্ব্বেই।

বৃন্দাবনে বাল্যলীলা শেষ হইতে না হইতেই বিপুল কর্ম্মের আহ্বান তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে। বৃন্দাবনের খেলাঘর ভাঙ্গিয়া মথুরায় কংস দানবকে শাসনের জন্য মহামল্ল-রূপে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান তখন ভারতের দিকে দিকে দুষ্কৃতকারীদিগকে স্পর্দ্ধিত ও সাধুদিগকে ভীত করিয়া তুলিয়াছে। দুষ্কৃতের বিনাশ করিয়া নবীন ভারতের উপযোগী নবধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে কে? এ আহ্বানে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে একটি মহাপ্রাণ—একটি মহাক্ষত্রিয় সাড়া দিয়াছিলেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, ভেদ-দুর্ব্বল, বিক্ষিপ্ত ভারতকে একচ্ছত্র শাসনের অধীন করিয়া, নব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সে স্বপ্ন কতদূর সফল হইয়াছে, সমগ্র মহাভারতকাব্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমান্বিত জীবনে তাহাই প্রধানরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অত্যাচারী কংসকে বধ করিয়া তিনি কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। উগ্রসেন-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও রাজ্য তিনি গ্রহণ করিলেন না। রাজ্যে তাঁহার লোভ ছিল না, অত্যাচারের প্রতীকার তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কংস-নিধনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত মগধ হইতে প্রবলপ্রতাপ জরাসন্ধ মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের যাদববাহিনীকে ক্রমান্বয়ে সপ্তদশবার আক্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ ছিল জরাসন্ধের উদ্দেশ্য। কেবল কংস তাঁহার জামাতা বলিয়াই যে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি তখন

ভারতবর্ষে একচ্ছত্র সম্রাটের মর্য্যাদা-প্রার্থী। এই মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরবর্ত্তী কালে তিনি শতসংখ্যক নৃপ বলি দিয়া রাজমেধ যজ্ঞের আয়োজনে ব্রতী হইয়াছিলেন। যুবক শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক অভ্যুদয় তিনি সহ্য করিবেন কেন?

শ্রীকৃষ্ণ অহেতুক লোকক্ষয় বারণ করিবার জন্য মথুরাপুরী ত্যাগ করিয়া, ভারতের অপর প্রান্ত-স্থিত সমুদ্রতীর-বর্ত্তী দূর দ্বারকায় আশ্রিত যদু ও গোপকুল-সহ প্রস্থান করেন। জরাসন্ধ আর সে রাজ্য আক্রমণ করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ কোন দিনই লোকক্ষয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না; একান্ত অনিবার্য্য স্থলে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, এবং কেবলমাত্র মূল পাপশক্তিকে ধ্বংস করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। বুদ্ধি-কৌশলে সিংহাসন হইতে আকর্ষণ করিয়া তিনি কেবলমাত্র কংসকেই আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কালে কেবলমাত্র জরাসন্ধ ও শিশুপালেরই বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের দৌত্য স্বীকার-পূর্ব্বক গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম্ম প্রদর্শন ও দুর্য্যোধনকে ভয়প্রদর্শন করিয়া, এবং কর্ণকে জন্মবিবরণ জানাইয়া যুদ্ধ-নিবারণ-কল্পে তিনি সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুর্ব্বার নিয়তির গতি ছিল অন্যরূপ, তাই তাঁহার শেষ চেষ্টা সফল হয় নাই।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্ত্তী এবং ভীমার্জ্জুনকে সহায় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রথম আদর্শ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা পাইলেন পাণ্ডব-গণের রাজসূয়-যজ্ঞে। শ্রীকৃষ্ণের সমর্থনে ও সহায়তায় পাণ্ডবগণ এই মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহারা অর্দ্ধরাজ্য লাভ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলেন, কৃতজ্ঞ ময়দানবের দ্বারা এইবার অপূর্ব্ব যজ্ঞসভা নির্ম্মাণ করাইলেন। কিন্তু জরাসন্ধকে বশ বা বধ না করিলে, রাজসূয়-

যজ্ঞ সম্পাদনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। জরাসন্ধ রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিবার উদ্দেশ্যে গিরিব্রজপুরে ৮৬ জন নৃপতিকে বন্দী করিয়াছেন; আর ১৪ জন ভূপতি বন্দী হইলেই শত-সংখ্যক রাজ-বলি দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারেন। স্নাতকবেশী ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের মন্দিরে তাঁহাকে একক মল্ল-যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং ভীমের হস্তে তাঁহাকে নিপাতিত করেন। কংস-বধে শ্রীকৃষ্ণের মহিমার সূচনা হয়, জরাসন্ধ-বধে তাহা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজসূয়যজ্ঞে অর্ঘ্যাভিহরণকালে জরাসন্ধের সুহৃৎ মহোগ্র শিশুপালকে বধ করা হইলে, তাহা রাজন্যগণের সমাজে যথাবিধি স্বীকৃত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ কুরু-পিতামহ ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া ঘোষণা ও বন্দনা করেন; শিশুপাল বধের পর যজ্ঞসভায় সমবেত রাজন্যবৃন্দ তাহা অপ্রতিবাদে স্বীকার করেন। পাণ্ডবগণের পক্ষে সহদেব অর্ঘ্য অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিনয়ের সহিত গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয়যজ্ঞে সমবেত অভ্যাগত-বৃন্দের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। শিশুপালেরও তিনি একশত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন; শিশুপালের প্রচেষ্টায় যখন রাজসূয়যজ্ঞ পণ্ড হইবার উপক্রম হইল, তখনই শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র দলপতিকে সকলের সম্মুখেই সংহার করেন। বলা বাহুল্য, যজ্ঞ-সাধনে শ্রীকৃষ্ণের ছিল চারিত্র-প্রভাব এবং মন্ত্রণা-প্রভাব; কর্ম্মশক্তি, বীর্য্যশক্তি, অর্থশক্তি ও অন্যান্য সমুদয় শক্তিই ছিল পাণ্ডবগণের। পাণ্ডবগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণের পিসী কুন্তীর পুত্র বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভাই; গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ছিলেন আবার শ্রীকৃষ্ণের সখা, এবং সুভদ্রার স্বামী বলিয়া তাঁহার ভগিনীপতি; পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সখী; কিন্তু ধর্ম্ম, ন্যায় ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত

ছিলেন বলিয়া পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত আপনার জন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীম শ্রীকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

রাজসূয়যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট দীর্ঘকাল সুসিদ্ধ রহিল না। বিরুদ্ধশক্তি দুর্য্যোধনকে কেন্দ্র করিয়া প্রবল হইতে লাগিল। কর্ণ ও শকুনি-সহায় দুর্য্যোধন অন্ধরাজের প্রশ্রয় পাইয়া অক্ষক্রীড়ার সাহায্যে ক্ষত্ররীতি-বিগর্হিত উপায়ে দ্রৌপদী-সহ পাণ্ডবগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া বনবাসে পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার ব্যসনে আসক্তি ছিল, তৎকাল-প্রচলিত রীতি-অনুযায়ী পাণ্ডবগণ পাশা খেলার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যানও করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায় ছিলেন, কিছুই জানিতেন না। শকুনি-চালিত এই কপট অক্ষক্রীড়ার ফলে ভরতকুলের দুই শাখা, যাহা পাণ্ডব ও কৌরব নামে পরিচিত, চিরতরে বিচ্ছিন্ন, বিদ্বিষ্ট হইয়া গেল। নারীত্বের তাদৃশ লাঞ্ছনার পর কেশাকর্ষণ-কুপিতা দ্রৌপদী আর মুক্তকেশ বাঁধিলেন না, ভীম ও অর্জ্জুন প্রতিশোধ লইবার জন্য কুরুকুলসংহার ও কর্ণবধের ভীষণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন! দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবর্ষ অজ্ঞাতবাসের পর বিরাটরাজকে সহায় করিয়া পাণ্ডবগণ আবার মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন এখন পরিণত-বুদ্ধি এবং পরিণত-বয়স্ক হইয়াছেন, এবার অর্দ্ধরাজ্য দূরের কথা, পাঁচখানি গ্রাম বা সূচ্যগ্র মেদিনীও পাণ্ডবগণকে বিনাযুদ্ধে দিতে চাহিলেন না। কৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ হইল; বিদুরের পরামর্শ, ভীষ্ম দ্রোণ ও গান্ধারীর শান্তিবাণী, মুনিঋষি ও সজ্জনগণের ধর্ম্ম-নিবেদন সকলই বিফল হইল। প্রলয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমুপস্থিত, সেখানেই বাহুবলের ও ধর্ম্মবলের পরীক্ষা হইবে।

কি বিশাল এই মহাভারত কাব্যের পরিপ্রেক্ষণী! কত পুরুষ-চরিত্র, কত নারী-চরিত্র, প্রত্যেকেরই ভিন্ন প্রকৃতি, ভিন্ন সঙ্কল্প, অথচ সকলেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যেও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সকলেরই শক্তি প্রবল প্রকৃতি ও প্রবল প্রবৃত্তির পথে নিজ স্বরূপ অনাবৃত করিয়া আপন বৃহত্ত্বায় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। দর্প, দম্ভ, পাপ, অন্যায়, মান, ক্রোধ, হিংসা, প্রতিশোধ, প্রণয়, সংযম, দান, তপস্যা সকল প্রবৃত্তিই অসাধারণ বলিষ্ঠতার সহিত দুর্দ্ধর্ষ বা দুর্জ্জয়-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অভাবনীয় বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ঐ হোথায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহামানী দুর্য্যোধন, মহাবীর কর্ণ, মহাবল ভীম, স্থিরপ্রজ্ঞ মহাযোদ্ধা ধনঞ্জয়, অতিখল শকুনি, আবার বীরকেশরী অভিমন্যু; ঐ হেথায় পাণ্ডব-জননী কুন্তী, ধর্ম্মদর্শিনী গান্ধারী, মহাতেজস্বিনী দ্রৌপদী, মনস্বিনী সুভদ্রা, আবার অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মাত্মা বিদুর এবং সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বগুণাধার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ! মহাকবির চিত্রণ-নৈপুণ্যে সকলেই যেন নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মে মহান্ ও প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছেন।

মহাভারতের মহাকবি অনন্ত জ্ঞানের মহাভাণ্ডার, ঋষিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাস; তিনি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র এবং কৌরব-পাণ্ডবের পিতামহ। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মকে তিনি প্রজ্ঞাদ্বারা স্বীকার করিয়া প্রচার করিয়াছেন; মহাভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ দ্রষ্টা হইয়াও বিশিষ্ট প্রয়োজনে কর্ম্ম করিয়াছেন; নিজ জন্মকাহিনী ও জীবন-বিবরণী অকুণ্ঠ সত্যনিষ্ঠার সহিত নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রজ্ঞা, মনস্বিতা ও আর্ষ প্রতিভার বলে তিনি সর্ব্বদাই জীবনের উচ্চতম ভূমিতে বিচরণ করিয়াছেন।

কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব একদিন যুবক দেবব্রত ছিলেন। পিতার কামনা পূর্ণ করিতে গিয়া, তিনি যে স্বেচ্ছায় কুরুরাজ্যের অধিকার পরিত্যাগ

এবং জীবনব্যাপী কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহা হয়তো শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যত্যাগ ও বনবাস গমন অপেক্ষাও কঠিন। এই ঘটনায় লোক-সমাজে তিনি যে বিস্ময়-বিমিশ্র ভয় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করেন, তাহাই তাঁহাকে ভীষ্ম বা ভয়ঙ্কর নামে পরিচিত করিয়াছে। ভীষ্ম নাম তাঁহার মহত্ত্ব-মুগ্ধ দেশবাসীর দত্ত উপাধি। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি কুমারী অম্বার প্রার্থনায়, কিংবা গুরু পরশুরামের আদেশে, অথবা মাতা সত্যবতীর অনুরোধেও এই কৌমার্য্য-ব্রতকে ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। পাণ্ডবগণের প্রতি পরম স্নেহশীল হইয়াও তিনি নিজেকে অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনের অন্নদাস মনে করিতেন; এই জন্যই দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনার সময়েও বাক্যছাড়া কার্য্যদ্বারা কোন প্রতিবাদ করেন নাই, এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সর্ব্বদা পাণ্ডবগণের জয় ও দুর্য্যোধনের পরাজয় কামনা করিয়াও দুর্য্যোধনের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগসিদ্ধ পুরুষ, ধর্ম্মবীর এই ভীষ্মদেব স্থবির-বয়সেও মহাকর্ম্মবীর এবং শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবীর ছিলেন। কুরুকুলের প্রধান সেনাপতি-রূপে অগণিত অরাতি নিপাত করিয়া, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মদেব ক্ষত্রিয় শূরগণের দুর্ল্ভ আদর্শস্থল হইয়া থাকিবেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরম দেবতা বলিয়া মান্য করিতেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, তাঁহার শরীরপাত দ্বারা কুরু-পাণ্ডবের আত্মকলহের—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসান হয়, ভাই ভাই আবার মিলিত হইয়া ভরতকুলকে রক্ষা করে। কিন্তু দম্ভী দুর্য্যোধন কর্ণের ভরসা করিয়া পিতামহের শেষ অনুরোধেও কর্ণপাত করেন নাই। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের মুখনিঃসৃত রাজধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মময় শান্তিপর্ব্ব ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, ইহা তাঁহার বহুমুখী অপূর্ব্ব প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেছে। মাঘ মাসের পুণ্য শুক্লাষ্টমী তিথিতে ভীষ্মদেব যোগবলে দেহ ত্যাগ করিয়া পরম লোকে

প্রস্থান করেন। ঐ তিথিতে প্রত্যেক ধর্ম্মনিষ্ঠ ভারতবাসীকে চিরকুমার ভীষ্মদেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে হয়। এই তর্পণের নাম ভীষ্ম-তর্পণ, ইহাই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বীরপূজা।

সেকালকার মহাবীর ক্ষত্রিয়গণ যেমন যোগসিদ্ধ ও জ্ঞানসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও আবার তেমনি অস্ত্রবিদ্যা-পারদর্শী মহাযোদ্ধা ছিলেন। আচার্য্য দ্রোণ তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ-স্থল। মৃত্যু সন্নিকট হইলে তিনি কার্ম্মুক পরিত্যাগ করিয়া যোগাবলম্বনে তনু ত্যাগ করেন।

ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, প্রজ্ঞাবান্ যুধিষ্ঠির চিরদিনই ধর্ম্মময়। তাঁহার বাল্য বা যৌবনে, বিপদ বা সম্পদের কালে কখনও তিনি এই স্বভাব-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই জন্যই ভীমার্জ্জুনের ন্যায় তেজস্বী ভ্রাতৃযুগল এবং দ্রৌপদীর ন্যায় অতি তেজস্বিনী পত্নী সর্ব্বদাই তাঁহার শাসন মান্য করিয়া চলিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বেদব্যাসের মন্ত্রণা-দ্বারা নিজেকে চালিত করিতেন; কিন্তু তাঁহারা এবং জননী কুন্তী দেবী পর্য্যন্ত তাঁহাকে সর্ব্বদা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, ঈর্ষ্যাকাতর দুর্য্যোধন, অথবা ছিদ্রান্বেষী কর্ণ কখনও তাঁহার অমর্য্যাদা করেন নাই। শত্রুমিত্র সকলেরই আশ্রয়, সকলেরই বিশ্বাসপাত্র যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ নাম সার্থক। যিনি বনবাসকালে বনবাসের মূল কারণ দুর্য্যোধন ঘোষযাত্রায় লাঞ্ছিত এবং আবদ্ধ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, অবিলম্বে বিরূপ ভীমার্জ্জুনদ্বারা তাঁহার মুক্তি সাধন করেন, যিনি মহাপ্রস্থানের পথে সহচর সারমেয়কে ত্যাগ করিয়া স্বর্গভূমিতে পদার্পণ করিতে চাহেন নাই, যিনি কপট দ্যূত-ক্রীড়ায় নিজেকে পরাজিত মনে করিয়া পত্নী এবং ভ্রাতৃগণের অশেষ লাঞ্ছনা-সত্ত্বেও ধীর, স্তব্ধ ছিলেন, এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে ইন্দ্রপ্রস্থের

ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হ'ন, ধর্ম্মরাজ নাম কেবলমাত্র তাঁহাকেই শোভা পায়। এই অবিচল ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য মহাভারত-কারের বর্ণনায় একমাত্র নিষ্পাপ যুধিষ্ঠিরকেই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে দেখা যায়।

দুঃখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া দুঃখ ও বিপদের শিক্ষায় বর্দ্ধিত হইয়াছেন যুধিষ্ঠির; তথাপি সুখের প্রথম প্রভাতেই তিনি শকুনির চতুরতায় পরাভূত হইয়া কেবল নিজেকে নহে, কনিষ্ঠ ভাই চারিজন ও রাজপুত্রী দ্রৌপদীকে পুনরায় বনবাসে পাঠাইলেন। রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠির উভয়েই রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বনগমন কত মহৎ। যুধিষ্ঠিরের দুর্ভাগ্যের কারণ যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়ায় আসক্তি, রামচন্দ্রের গৌরব তিনি পাইবেন কি করিয়া? কিন্তু বাক্যাশ্রয়ী সত্যনিষ্ঠার গৌরব উভয়েরই সমান।

দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম অযুত হস্তীর বল ধারণ করিতেন; কোপনস্বভাব এবং সরল-প্রকৃতি, অতএব স্পষ্টবক্তা বলিয়া মনোভাব তিনি সহসা বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাশ করিতেন। নামের সদৃশ তাঁহার কার্য্য ছিল; বক রাক্ষস, হিড়িম্ব, জরাসন্ধ এবং দুর্য্যোধনকে তিনি বধ করেন। দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখিয়া তিনি যখন বলিয়াছিলেন, "সহদেব! অনল আনয়ন কর, যুধিষ্ঠিরের বাহুযুগল ভস্মসাৎ করিব", তখন তাহা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু যুক্তি ও ন্যায় প্রদর্শন করিলে, তিনি অগ্রজ যুধিষ্ঠির অথবা অনুজ অর্জ্জুন উভয়ের শাসন মান্য করিতেন। প্রতিহিংসা-পরায়ণ, শূর-প্রকৃতি ভীমকে উত্তেজিত করিয়া দ্রৌপদী সহজেই অভীষ্ট পূরণ করিতেন; কীচক বধ এবং দুঃশাসনের বক্ষো-

রক্তপান উহার উদাহরণ। এই ভীমও কর্ত্তব্য বুঝিয়া কৃষ্ণকে কুলক্ষয়কর যুদ্ধ নিবারণ-কল্পে সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। জীবনকেন্দ্রে সকল পাণ্ডবেরই ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রাণ। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ, অর্জ্জুন নর ঋষি ; শ্রীকৃষ্ণ সারথি, অর্জ্জুন রথী ; শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর, পার্থ ধনুর্দ্ধর ; উভয়ে মিলিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে এক পূর্ণ শক্তির প্রকাশ ঘটাইয়াছেন। এই মধ্যম পাণ্ডব ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের সখা হইবার যোগ্যতা আর কাহার ছিল ? বাহুবলে, বীর্য্যবলে, বুদ্ধিবলে, হৃদয়ের বলে, অস্ত্রবলে, ধর্ম্মবলে এবং তপোবলে, যোগে ভোগে ও ত্যাগে অর্জ্জুন সত্যই মহান্ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণের মিলন একমাত্র অর্জ্জুন-চরিত্রেই দেখা গিয়াছিল। বাল্যে বৃক্ষস্থিত মৃৎ-পক্ষী ছিন্ন করিয়া, যৌবনে যন্ত্র-পথে মৎস্য-চক্ষু বিদ্ধ করিয়া, এবং প্রৌঢ় বয়সে দ্বৈরথ যুদ্ধে কর্ণকে নিহত করিয়া তিনি আপন শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। সত্যরক্ষার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় পৃথক্ ভাবে দ্বাদশবর্ষ নির্ব্বাসিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি দুষ্কর তপস্যা করেন, উর্ব্বশীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া চিত্তজয়ের অপূর্ব্ব পরিচয় দেন, কিরাতবেশী রুদ্রকে অসম সাহসিকতা গুণে প্রীত করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। বিচিত্র এবং বিস্ময়কর তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী। গুরু দ্রোণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য, ভীষ্মের প্রিয়তম পৌত্র, পাণ্ডবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বল, সতী সুভদ্রার স্বামী, অভিমন্যুর জনক, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণেরই অপর মূর্ত্তি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবদ্গীতা তাঁহারই উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হইয়াছিল। হায় ! শ্রীকৃষ্ণের বিহীনে মহাধনু গাণ্ডীব তুলিবার শক্তিও আর তাঁহার ছিল না !

অপর পক্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষ দুর্য্যোধন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিশোর বয়সেই রঙ্গক্ষেত্রে হতমান কর্ণকে তৎক্ষণাৎ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তিনি যে দূরদৃষ্টি, সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। এই ঘটনারই শেষ পরিণাম কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ; কর্ণই ছিলেন অন্যায় কার্য্যে দুর্য্যোধনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। মহামানী দুর্য্যোধনের প্রবল পৌরুষ ও প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল। ভীষ্ম দ্রোণকে তিনি কখনও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে দেন নাই, এবং কর্ণের হৃদয় ও বুদ্ধি তিনি সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সহদেবের মাতুল চেদিরাজ শল্যকে তিনি তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিবিধ উপচার দিয়া এরূপ তুষ্ট করিয়া ছিলেন যে, আত্মীয়তা অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা বড় মনে করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি শেষ পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষেই যোগ দেন। দুর্য্যোধনের চরিত্রের বৃহত্তম কলঙ্ক ছিল পাণ্ডব-বিদ্বেষ। জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দুর্য্যোধন ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়া-ন্যায় কিছুমাত্র বিচার না করিয়া ছলে, বলে, কৌশলে পাণ্ডব-বিনাশের চেষ্টা করিয়াছেন। পাণ্ডব-সম্পর্কে তাঁহার মনে কদর্য্য নীচতা ছিল। ঘোষ-যাত্রায় পাণ্ডব-সাহায্যে মুক্তি লাভ করিয়া দুর্য্যোধন নিজেকে অপমানিত মনে করেন; অনাহারে প্রাণ ত্যাগে উদ্যত হইয়া অবশেষে অর্জ্জুন-বধে কর্ণের প্রতিজ্ঞার পর তাহা হইতে নিবৃত্ত হ'ন।

দ্যূতসভায় পিতা, ভ্রাতা এবং পূজ্য সভাসদ্‌বর্গের সম্মুখে তিনি রজস্বলা, একবস্ত্রা, পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীর প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ও মানব-ধর্ম্ম অতল সলিলে ডুবিয়াছিল। রাক্ষসরাজ রাবণও করতলগতা

সীতার সম্বন্ধে কোনরূপ অশিষ্ট ব্যবহারের কথা ভাবিতে পারেন নাই। সেই রাক্ষসরাজ রাবণ যদি অধার্ম্মিক হ'ন, দুর্য্যোধন তবে কি? ভীষ্মদেব দিব্যচক্ষে দেখিয়া দ্রৌপদীকে যথার্থই বলিয়াছিলেন, কুরুকুলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যে রাজ্যে রাজসভায় রাজার আচরণ এইরূপ, সে রাজ্যে প্রজাবর্গ কি ভাবে ধর্ম্মে স্থিত হইবে? যে দেশে প্রজাবর্গের আদর্শ-শুদ্ধি রক্ষার জন্য রামচন্দ্র অগ্নিশুদ্ধা সীতাকে পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, সে দেশের সিংহাসনে মূর্ত্তিমান্ পাপ আসীন হইল। তথাপি 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'—এ উক্তির মধ্যে একটা পৌরুষের শঙ্খনাদ শোনা যায় বই কি! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য এবং নিজে হত হইয়াছেন; কিন্তু মানী পুরুষ সন্ধি করিয়া নিজের মানকে হত হইতে দেন নাই। রাজ্য তিনি চিরদিন সুশাসন করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেও ভারতের বীরবৃন্দ-পরিরক্ষিত একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলরামের প্রিয় শিষ্য দুর্য্যোধন বলশালিতায় এবং গদা-যুদ্ধ-নিপুণতায় ভীমেরই সমকক্ষ ছিলেন। দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্য হইতে রাজ্যকামী যুধিষ্ঠিরের প্রতি তিনি যে জ্বালাময় তীব্র বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা জয়ের সুধাতেও বিষ বিসর্পিত করিয়া দিয়াছিল। দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন, "এই পৃথিবী এখন তোমারই হউক, ইহার ভোগে আমার আর স্পৃহা নাই। শত ভাই বিনষ্ট হইয়াছে; পিতামহ, দ্রোণ, কর্ণ, সুহৃদ্‌গণ এবং পুত্রগণ কেহই আর বাঁচিয়া নাই। রাজ্য ভোগ করিব কাহাদের লইয়া? রাজ্যে আর আছেই বা কি? ধনরত্ন সকলই নিঃশেষ হইয়াছে; হস্তী, অশ্ব, রথ সকলই নষ্ট হইয়াছে; বীর ক্ষত্রিয়গণ সকলেই নিহত হইয়াছে। আছে শুধু ভারতব্যাপী বিধবাকুলের আকুল হাহাকার!

আমি মৃগচর্ম্ম পরিয়া বনে যাইব। যাও, এ পৃথিবী তুমিই ভোগ কর,—এই বন্ধুশূন্য, বীরশূন্য, অর্থশূন্য ভারত-শ্মশান।"

হাঁ, ইহাই দুর্য্যোধনের কার্য্যের শেষ পরিণাম। আর যুধিষ্ঠির জয়ী হইয়াও সুখপূর্ণ সমৃদ্ধ ভারত ভোগ করিতে পারিবে না, ইহাই দুর্য্যোধনের শেষ সান্ত্বনা।

পৌরুষের প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি কর্ণের জীবন ছিল দৈবদ্বারা অভিশপ্ত। জন্মক্ষণে মাতা কুন্তী মাতৃস্নেহে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে সত্য পরিচয়েও বঞ্চিত করিলেন। সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, দিব্যকবচ-কুণ্ডলধারী, অনুপম ক্ষত্রিয়-কুমার সূতপুত্ররূপে পরিচিত হইলেন; কিন্তু স্বভাবের আকর্ষণে তিনি বড় হইতে চাহিলেন ক্ষত্রিয়ের বীরধর্ম্ম পালন করিয়া। এখানেই তাঁহার জীবনের দ্বন্দ্ব, জীবনের দুঃখের মূল কারণ। আর তাহার জন্য দায়ী একমাত্র তাঁহার জননী, যিনি মহাবীর পুত্রের জন্ম-কাহিনীকে চিরদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। সূতপুত্ররূপে পরিচিত বলিয়া গুরু দ্রোণের নিকটে অস্ত্র-শিক্ষা বা অস্ত্র-পরীক্ষা হইল না; আবার সূতপুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াও জাতি গোপন করার অপরাধে অস্ত্র-গুরু পরশুরামের অভিশাপ পাইতে হইল; দ্রৌপদী তাঁহাকে স্বয়ংবর-সভায় সূতপুত্র বলিয়া লাঞ্ছিত করিলেন; অবশেষে ইন্দ্র-সদৃশ সহোদর অর্জ্জুনের বধে উদ্যত হইয়া, দৈব-বিড়ম্বনায় সেই সহোদরের হস্তেই নিহত হইলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে কৃষ্ণ ও কুন্তী কর্ণের আত্মপরিচয় দিয়া, পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠত্ব এবং ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরত্বের লোভ দেখাইয়াও কর্ণকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে পারেন নাই। দানে, মানে, জ্ঞানে, গুণে, সত্য-নিষ্ঠায় এবং ধর্ম্ম-নিষ্ঠায় তিনি পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠ হইবার যোগ্যই ছিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধনের

সংসর্গদোষে পাণ্ডবগণ-সম্পর্কে তিনি ছিলেন দুর্য্যোধনেরই ন্যায় নীচ-মনা, দুর্য্যোধনের ভাবেই ভাবিত। দুর্য্যোধনের অন্নদাস হইয়া তিনি পাণ্ডবগণের সম্পর্কে স্বাধীন বিচার-শক্তিও হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং কৌরব-দ্যূতসভায় দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিয়া তিনিই দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিবার আদেশ দেন। কর্ণের সমর্থন ও সহায়তা না পাইলে দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আয়োজন করিতেন কিনা সন্দেহ। সমপ্রকৃতির দুই সখা; একদিকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, অপর দিকে দুর্য্যোধন ও কর্ণ!

নারী গান্ধারী, তাঁহার মহিমা নারীত্বের বা মনুষ্যত্বের মহিমা; পত্নীত্বেরও নয়, বা মাতৃত্বেরও নয়। মহাভারত-কার তাঁহাকে বলিয়াছেন ধর্ম্ম-দর্শিনী। স্বামী ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতা শকুনি, পুত্র দুর্য্যোধন-দুঃশাসন, আপনার জন সকলেই একদিকে; তাঁহারা অধর্ম্মের আশ্রয়ে পাণ্ডবদের বিনাশ চান। দেবী গান্ধারী এই আবেষ্টনীতে অবস্থান করিয়াও মনে প্রাণে ধর্ম্মের জয় প্রার্থনা করিয়াছেন। দ্যূতক্রীড়ার পর তিনি পুনঃ পুনঃ অন্ধরাজকে বলিয়াছিলেন, "কুরুকুল রক্ষার নিমিত্ত পাপাচার দুর্য্যোধনকে নির্ব্বাসিত কর।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি দুর্য্যোধনকে বুঝাইয়াছিলেন, ন্যায়ানুসারে রাজ্যে তাঁহার কোনই অধিকার নাই, অর্দ্ধরাজ্য দিয়া পাণ্ডবগণের সহিত মৈত্রী স্থাপিত হইলে, তাহা পরম সুখের হইবে। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্ব্বে জয়ার্থী দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক বহুবার অনুরুদ্ধ হইয়াও কিছুতেই তাঁহার জয় উচ্চারণ করেন নাই; বলিয়াছিলেন,—

"শৃণু মূঢ় বচো মহ্যং যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

—হে মূঢ়! আমার বাক্য শোন, যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেরই জয় হইবে।" সত্যই দেবী গান্ধারী আশ্চর্য্য ধর্ম্ম-দর্শিনী!

মহাভারত-কারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি দ্রৌপদী-চরিত্র। দ্রৌপদী আদর্শ পত্নী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি আদর্শ ক্ষত্রনারী; চরিত্র-তেজে, আভিজাত্য-গর্ব্বে এবং মহিষীত্বের মহিমায় তিনি মহীয়সী। সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে পূর্ব্বে বা পরে এরূপ দ্বিতীয় চরিত্র আর অঙ্কিত হয় নাই। এই দর্পিতা নারীর তেজোবহ্নির প্রথম স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পায় সেই বিশাল স্বয়ংবর-সভাক্ষেত্রে, যখন লক্ষ্য-ভেদোদ্যত কর্ণকে দেখিয়া তিনি তাচ্ছীল্যভরে বলিয়াছিলেন, "আমি সূত-পুত্রকে বরণ করিব না।" এই তেজোবহ্নির প্রখরতম দীপ্তি জ্বলিয়া উঠে কৌরব-দ্যূতসভায়। এই নারীকে হরণ করিতে আসিয়াই সিন্ধু-সৌবীরাধিপতি জয়দ্রথ তাঁহার বাহুবলে প্রথমে ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন; ইঁহারই প্রতি কামদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মহাবল কীচক প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এই মনস্বিনীর চরিত্রের দুর্ল্ভ গুণসমুদয় যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছিল তাঁহার জীবনের কঠিনতম সঙ্কটের মুহূর্ত্তে কৌরব-দ্যূতসভায়। কেশাকর্ষণ-ধর্ষিতা মানিনী দ্রৌপদী বীর পঞ্চ-পতির দাসত্ব দেখিয়া ঘোষণা করেন, দ্যূত-বিজিত দাসের নিজ পত্নীকে পণ রাখিবার অধিকার নাই, তাঁহার স্বাতন্ত্র্য যুধিষ্ঠিরের পরাভবে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সকলকে দুর্য্যোধনের পাপাভিনয়ের সম্মুখে চিত্রপুত্তলিকাবৎ স্তব্ধ দেখিয়া মহাক্ষোভে তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্। ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ-গণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের বিন্দুমাত্র স্বত্ব নাই।" এই অন্নদাসগণের কিছুমাত্র স্বাধীন স্বত্ব ছিলও না; তাই তিনি নিজেই অমর্ষপূর্ণ কণ্ঠে প্রথমে দুঃশাসনকে শাসন করিলেন, ইন্দ্র সহায় হইলেও পাণ্ডবগণ কখনও তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন

না। কর্ণ যখন তাঁহাকে বন্ধকী বলিয়া সভামধ্যে বস্ত্র কাড়িয়া লইতে আদেশ করিলেন, এবং দুরাচার দুঃশাসন সবলে বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন দ্রৌপদী সাশ্রুনেত্রে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বীর পঞ্চপতির বিমুখতা দেখিয়া একমনে অসহায়ের সহায়, অনাথের নাথ, বিপদ-ভঞ্জন শ্রীহরি, যিনি বিশ্বাত্মা মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকেই ডাকিতে লাগিলেন, "আমি কৌরব-সাগরে মগ্ন হইয়াছি, হে জনার্দ্দন! শরণাগত আমি, আমাকে রক্ষা কর।" ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদী ধর্ম্মকে শেষ আশ্রয় জানিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে আত্ম-নিবেদন করিয়া বাহ্য ব্যাপার যেন ভুলিয়া গেলেন। হাঁ, কৌরবগণ ধর্ম্মহীন হইয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণ স্বভাব হইতে স্খলিত হইয়াছেন, দ্রৌপদীর রোষানলে সেদিন হীন ক্ষত্রিয়গণের স্বত্ব দগ্ধ হইয়াছে; অবশিষ্ট ছিল কায়া, তাহাই পতিত হইয়াছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে। যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য অপেক্ষাও দ্রৌপদীর সাহস বিস্ময়কর, আর বিস্ময়কর দ্রৌপদীর এবং সেই যুগের ধীর বিচার-শীলতা। রজস্বলা, একবস্ত্রা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রহরণ অথবা তাঁহাকে ঊরু প্রদর্শন—নারীর এই চূড়ান্ত লাঞ্ছনা যেন ক্ষত্রিয়গণকে চঞ্চল করিবার যথেষ্ট কারণ নয়। দুর্য্যোধনের এইরূপ অত্যাচার করিবার অধিকার আছে কিনা, ইহাই যেন সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। দ্রৌপদী স্বয়ং সকলকেই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি দ্যূত-বিজিতা কিনা। ভীষ্ম, বিদুর, বিকর্ণ, কর্ণ সে আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। ভীষ্ম বলিলেন,—ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম, তিনি মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না; একমাত্র যুধিষ্ঠিরই সত্য নির্ণয়ে সমর্থ; তবে লোভমোহ-পরায়ণ কুরুকুলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বিদুর ও বিকর্ণ দ্রৌপদীকে সমর্থন করিলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির তূষ্ণীম্ভূত, অচেতন-প্রায়। এমন সময়ে ক্রোধ-বিস্ফারিত নেত্রে করে কর

নিষ্পিষ্ট করিয়া ভীমসেন প্রতিশোধের ভীষণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে দুর্নিমিত্ত দেখা দিল। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীতচিত্তে দ্রৌপদীকে বর দিয়া প্রসন্ন করিতে চাহিলেন। দ্রৌপদী পতি ও পুত্রগণকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তৃতীয় বর প্রত্যাখ্যান করিলেন, বলিলেন, "পতিগণ এখন পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন; আমি তৃতীয় বরের যোগ্য নই।" প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চপুত্র নিশা-যোগে চোর অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হইলে অশ্বত্থামার প্রাণ অথবা প্রাণাধিক মান হরণ না করিয়া তিনি অশ্রু মার্জ্জনা করেন নাই।

দ্যূতসভার একটি দৃশ্যে দ্রৌপদীর বুদ্ধিমত্তা, সাহস, তেজ, ঈশ্বর-ভক্তি, এবং নির্লোভ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈশ্বরে দ্রৌপদীর অচলা ভক্তি ছিল, ধর্ম্মে স্থির নিষ্ঠা ছিল; কৃষ্ণের তিনি সখী ছিলেন। পঞ্চ পতিকে তিনি একপতি-জ্ঞানে অনাসক্তির সহিত সেবা করিয়াছেন। মহাভারত-কারের নির্ম্মম, নির্ম্মল দৃষ্টি কিছুই এড়ায় না। দ্রৌপদীর একটু পক্ষপাত ছিল অর্জ্জুনের প্রতি, এবং সেই অপরাধেই না স্বর্গারোহণের পথে সর্ব্বাগ্রে তিনি পথিমধ্যে পতিতা হইলেন!

তারপর শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণের নব ধর্ম্ম ও নব দর্শনের আকর শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত কুরুপাণ্ডবের সমবেত সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে বিষাদ-প্রাপ্ত অর্জ্জুনকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যোগস্থ পার্থসারথির কণ্ঠে এই ধর্ম্ম গীত হয়, তাই ইহার নাম গীতা। অর্জ্জুনের মোহ উপস্থিত হইয়াছে, যুদ্ধার্থ সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছেন তাঁহারই পিতামহ, তাঁহারই আচার্য্য, তাঁহারই ভ্রাতা, শ্বশুর, সুহৃৎ ও স্বজন। এই আত্মীয়বর্গের রুধির-লিপ্ত রাজ্য গ্রহণে তৃপ্তি হইবে কাহার? অতএব অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবেন না। ভগবান কৃষ্ণ নীরব। অর্জ্জুন

আবার যুক্তি প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন, "কর্ত্তব্য উপদেশ কর।" তথাপি কৃষ্ণ উদাসীন। অর্জ্জুনের অহমিকা চূর্ণ হইতে লাগিল, তিনি বলিলেন, "আমি কিছুই বুঝিতেছিনা; যাহা শ্রেয়, তাহা নির্দ্দেশ কর। আমি তোমার শরণ লইলাম,' তোমার শিষ্য আমি, আমাকে শিক্ষা দাও,—

" শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্। "

শ্রীকৃষ্ণ তখন শরণাগত অর্জ্জুনকে উপদেশ করিলেন,—" মিথ্যা পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার কেন? কে কাহাকে হত করে? কেই বা হত হয়? আত্মা অজর, অমর, নিত্য এবং শাশ্বত, শরীর হত হইলেও আত্মা হত হ'ন না। অস্ত্র ইঁহাকে ছেদন করিতে পারে না, পাবক ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ও মরুৎ ইঁহাকে সিক্ত বা শুষ্ক করিতে পারে না। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করেন, মানুষের আত্মা তেমনি জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করেন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য-সাধনে ভীত হইতেছে কেন? এ যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কি আছে? তুমি ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার করিয়া ওঠো। যখন জন্মিয়াছ, মৃত্যু তখন ধ্রুব। স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া যদি হত হও, স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে, আর জীবিত থাকিলে মহী ভোগ করিবে। অতএব, হে কৌন্তেয়! ওঠো, যুদ্ধের জন্য কৃত-নিশ্চয় হও!"

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, উপনিষৎসমূহ যেন ধেনু, গীতামৃত এ ধেনুর দুগ্ধ, দোহন করিয়াছেন গোপাল-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, ধীমান্ পার্থ বৎস-রূপে এই দুগ্ধের ভোক্তা। বাস্তবিক উপনিষদের আত্মবিদ্যার মহান্ সুর আমরা গীতার আরম্ভেই ধ্বনিত হইতে দেখি। কিন্তু

ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিবেন, তাহা তাঁহার প্রজ্ঞাদৃষ্টির দান, জীবনব্যাপী কর্ম্ম-সাধনার উত্তম রহস্য, তাহা গীতার অপূর্ব্ব কর্ম্মযোগ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"ভয় কি? কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মের ফলের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি থাকিবে কেন? মানুষের কর্ম্মেই অধিকার, ফলে অধিকার নাই। অতএব ফলে আসক্তি-শূন্য হইয়া কেবলমাত্র ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম কর। নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য-সাধনেই ভগবানের প্রীতি। সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া হে অর্জ্জুন! কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিয়া যাও। কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সমত্ব-জ্ঞানই কর্ম্মযোগ।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—যাহা যাহার কর্ত্তব্য, তাহা তাহাকে করিতে হইবে। সমুদয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়াই করিতে হইবে; অতএব, তাহাতে আসক্তি বা ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। কর্ম্ম আমরা সকলেই করি; সেই কর্ম্মই যোগ হয়—কর্ম্মযোগ হয়, যদি স্বার্থবুদ্ধি-বশে অনুষ্ঠিত না হইয়া তাহা বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে অথবা ঈশ্বর-প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। কর্ম্ম মাত্রেই বাহিরে সাধারণতঃ একরূপ, তাহার ভিন্নতা আসে উদ্দেশ্য-বিচার হইতে। একই দানকর্ম্ম লোকের সমালোচনা এড়াইবার জন্য, কেবল যশের জন্য, কেবল পরোপকারের জন্য অথবা শ্রীহরির প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ভগবান্ ভাবগ্রাহী, ভাব দেখিয়া কর্ম্মের বিচার করেন। ভাব-শুদ্ধ হইতে হইবে। কেবলমাত্র মানুষের নিজ চেষ্টার উপরই তো কর্ম্মের সাফল্য নির্ভর করে না। অন্যলোকের নানাবিধ পৃথক্ চেষ্টা এবং দেশ কাল প্রভৃতির

অর্থাৎ দৈবের আনুকূল্য না থাকিলে কর্ম্মের সিদ্ধি আসিতে পারে না। ভগবান্ বলেন,—

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

[গীতা ৩—৩০]

—সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, চিত্ত পরমাত্মায় লগ্ন রাখিয়া, নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর; শোক বা বিষাদ করিও না।

ভয়ের কিছু নাই। ভগবান্ বলিতেছেন,—

উদ্ধরেদ্ আত্মনাত্মানং নাত্মান মবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপু রাত্মনঃ॥

[গীতা ৬—৫]

—আত্মাদ্বারা আত্মার উদ্ধার কর, আত্মাকে অবসন্ন করিও না। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু।

যোগবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, শুদ্ধচিত্তে আপনা আপনি জ্ঞানের বিকাশ ঘটিতে থাকে।

কর্ম্মযোগের মধ্যে যে আত্মনিবেদনের ভাব রহিয়াছে, তাহাই ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ হইতেও জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। ভগবানের মুখের চরম দুইটি শ্লোক প্রপত্তি-যোগ বা ভক্তিযোগের শেষ কথা—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

[গীতা ১৮—৬৫, ৬৬]

—আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার উপাসনা কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে, কেননা তুমি আমার প্রিয়।

—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব, শোক করিও না।

ইহা ভগবানের মুখের পরম অভয় বাণী।

আঠার অধ্যায়ে এবং সাত শত শ্লোকে এই গীতা-গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতবাদের সার গ্রহণ করিয়া এবং কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়া এই গীতা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ দান এই কর্ম্মযোগ ও গীতা-তত্ত্ব। ভারতবাসী ও জগদ্বাসীর জীবনে গীতাগ্রন্থের প্রয়োজন ফুরায় নাই, তাহা বরং দিন দিনই বাড়িতেছে। নবযুগে গীতার নব নব ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়া জগৎকে ধারণ করিবে।

অর্জ্জুনের মোহ চূর্ণ হইল। গাণ্ডীবধন্বা নিরাসক্তচিত্তে কিন্তু দৃঢ় হস্তে গাণ্ডীব ধরিলেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের নির্ঘোষের সঙ্গে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দশদিনে পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যায় পতন হইল। তখনও অর্জ্জুনের হৃদয়কোণে স্নেহবেশে মোহ সঞ্চিত ছিল। অন্যায় যুদ্ধে সপ্তরথার আক্রমণে বীরকেশরী অভিমন্যুর পতনের পর ধূমায়মান আগ্নেয় গিরি অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে আর আট দিনের মধ্যে দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, শকুনি, ভ্রাতৃবর্গসহ দুঃশাসন, দুর্য্যোধন সকলেই নিহত হইলেন। এ পক্ষেও পঞ্চপাণ্ডব ভিন্ন দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাট, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কেহই জীবিত রহিলেন না। তারপর ধৃতরাষ্ট্রের মর্ম্মভেদী বিলাপ, স্ত্রীপর্ব্বে কুরুক্ষেত্র-শ্মশানে ভারতের বীরপত্নী বিধবাগণের

শোক-ক্রন্দন, শূন্য হৃদয়ের বিহ্বল হাহাকার! যুধিষ্ঠিরের সমস্ত জয়গৌরব যেন ম্লান হইয়া গেল।

কৃষ্ণের অভীপ্সিত ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এখন ভারতবর্ষের অধিপতি। অধর্ম্ম-ক্ষয়ে অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়কুল বশে আসিয়াছে, দিকে দিকে গীতোক্ত নবধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। ইহারই মধ্যে পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মহিষী দ্রৌপদী-সহ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

কিছুকাল পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর সহিত বনে গমন করিলেন, সেখানে একদিন প্রজ্বলিত দাবানলে দগ্ধ হইয়া তাঁহাদের দেহাবসান ঘটিল।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলাও সাঙ্গ হইয়া আসিয়াছে। উহার শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর! কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ৩৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। যদুবংশীয়গণ স্বেচ্ছাচারী, পাপাচারী, মদ্যপায়ী, লম্পট এবং আত্মদ্রোহ-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের শত চেষ্টায় তাঁহাদের সংশোধন বা ধর্ম্মপথে আনয়ন সম্ভবপর হইল না। তাঁহাদের বিনাশ না হইলে শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রত সিদ্ধ হইবে কি করিয়া? প্রভাসক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে উৎসব-উপলক্ষে মিলিত যাদবগণ মদ্য পান করিয়া পরস্পর বিনাশে মাতিয়া উঠিল। বলরাম ও কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদের বিনাশ করিতে লাগিলেন। ভোজ, অন্ধক, কুকুর, বৃষ্ণি সমুদয় যাদব-গোষ্ঠী আত্ম-কলহে একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। বলরাম বিষণ্ণচিত্তে এক বনে প্রবেশ করিয়া যোগবলে দেহ ত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও দেহত্যাগ করিতে যোগাবলম্বন করিয়া শয়ান হইলেন, এমন সময়ে মৃগ-বোধে এক ব্যাধ তীক্ষ্ণ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। ধীরে ধীরে মহাভারতের

মহাসূর্য্য পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে উদিত হইয়া সমান গৌরবে পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে অস্তমিত হইলেন। সহসা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দ্বারকাক্ষেত্র সমুদ্রের আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

ঘন আঁধার যেন ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়া ফেলিল! চারিবৎসর পরে পঞ্চ পাণ্ডব আবার বল্কল পরিয়া দ্রৌপদী-সহ ইন্দ্রপ্রস্থ ও ভারত-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের তুষারাস্তীর্ণ তুঙ্গ পথে মহাপ্রস্থান করিলেন। মহাভারতের বিরাট যবনিকা পতিত হইল।

অদ্ভুত মনীষা ও প্রতিভা লইয়া মহাকবি বেদব্যাস নির্ম্মম নিরাসক্ত চিত্তে মহাভারতের বিশাল পরিপ্রেক্ষণীতে মানবজীবন, মহামানবজীবন, একটা বিরাট জাতি ও সমগ্র দেশের জীবন আদ্যন্ত অখণ্ডরূপে পরিদর্শন করিলেন। এ জীবনের শেষ পরিণাম কি? ধ্বংস, বিনাশ? হাঁ, কিন্তু আত্মার নয়, দেহের। এ জীবনের শেষ কথা কি? ধর্ম্ম? হাঁ! কিন্তু মানুষের স্বভাব কি? মহাকবি একটি আশ্চর্য্য রূপকে তাহারও উত্তর দিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর স্ত্রীপর্ব্বে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে বলিতেছেন,—

কণ্টকময় এক অরণ্যের মধ্যদিয়া শ্রান্ত এক পথিক আশ্রয়-আশায় চলিতেছিল। এক উন্মত্ত হস্তী আসিয়া তাহাকে সহসা আক্রমণ করিল, এক ভীষণ রাক্ষসীও মুখ ব্যাদান করিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রাণ-ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে পথিক এক লতাজালে সমাচ্ছন্ন কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল। পড়িতে পড়িতে গর্ত্তমুখে লতাজালে পা আটকাইয়া যাওয়ায় পথিক পনস ফলের ন্যায় হেঁটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে ঝুলিতে লাগিল। কূপের নীচে ছিল এক মহাসর্প, ক্রূর ফণা বিস্তার করিয়া সে পথিককে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। মহাগজ এবং ভীষণ রাক্ষসী তো কূপ-পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময়ে সমীপবর্ত্তী

বৃক্ষশাখার মৌচাকটি হইতে ক্ষিপ্ত মৌমাছির দল দংশন-জ্বালায় পথিককে অস্থির করিয়া তুলিল, পথিক কিন্তু ভয়ে একটু নড়িতেও পারিল না। ওদিকে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ দুইটি মূষিক আসিয়া লতাগুলির মূল একটি একটি করিয়া কাটিতে লাগিল। কিন্তু তখন উপরের মৌচাক হইতে ফোঁটা ফোঁটা মধু নীচে পড়িতেছে। পথিক চাটিয়া মধুর আস্বাদ পাইতেই আর এক ফোঁটা মধু আসিয়া পড়িল। আসন্ন বিনাশের মুখে, ঐ মধুর লোভে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, নিশ্চিন্ত আরামে সে ফোঁটা চাটিতে চাটিতে পথিক ভাবিতে লাগিল, আবার কখন এক ফোঁটা পড়িবে।

বিদুর বলিলেন,—ঐ অরণ্য মহাসংসার, ঐ গজ মহাব্যাধি, ঐ রাক্ষসী ভীষণ জরা, ঐ কূপটি মানুষের অনাদি বাসনা, ঐ মহাসর্প মহাকাল, ঐ লতাজাল মানুষের আশা, কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ দুই মূষিক রাত্রি ও দিবস, মধুকরগুলি কাম বা লোভ প্রভৃতি রিপু, মৌচাক বিষয়-সুখ, আর ঐ মধু কামরস বা সংসারের ভোগ।—এই ভোগ-বাসনার লোলুপতাই মানুষের সাধারণ রূপ। এই সংসারে দুঃখও অনিবার্য্য। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জীবনও আদিতে, অন্তে এবং মধ্যভাগে দুঃখ, বিচ্ছেদ ও বঞ্চনায় ভরপূর। আর কতরূপেই না এই দুঃখ আসে! সংসার-সমুদ্রের জল দেখিতেই ভাল, স্নানেও মন্দ নয়, পানে লবণাক্ত, লবণাক্ত।

রামায়ণের পরে মহাভারতের যুগে আর্য্য অনার্য্যের রক্ত-মিশ্রণও চলিয়াছে। ব্যাসদেব এক ধীবর-বালার পুত্র, রাজা শান্তনু পরে সে কন্যাকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণ জাম্ববতীকে, অর্জ্জুন নাগকন্যা উলূপী এবং মণিপুর-দুহিতা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভীম হিড়িম্বাকে শূর্পণখার ন্যায় লাঞ্ছিত না করিয়া অগ্রজের আদেশে বিবাহ

করিয়াছিলেন। আর্য্য অনার্য্যের প্রবল বিদ্বেষভাবও ছিল। নাগ-কর্ত্তৃক রাজা পরীক্ষিতের দংশন এবং তৎপুত্র জন্মেজয়-কর্ত্তৃক সর্প-যজ্ঞে নাগ-কুলের বিনাশ, তাহার প্রমাণ। নাগ এক প্রসিদ্ধ অনার্য্য-বংশের নাম। তথাপি আর্য্য ও আর্য্যেতর জাতিগুলি ভাব ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ক্রমশঃ পরস্পরের সমীপবর্ত্তী হইতেছিল, আদান ও প্রদান অবাধে চলিতেছিল।

মহাভারত-কাব্যের মূল আখ্যানের সংক্ষিপ্ততম উল্লেখ শেষ হইয়াছে। কিন্তু এই বিশাল রত্নাকরের অগণিত রত্নরাশির সংখ্যা করিবে কে? মহাভারতের অন্তর্গত রাম-সীতার কাহিনী, সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী, নল-দময়ন্তীর কাহিনী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনী, কচ ও দেবযানীর কাহিনী বড় কাহিনী। ছোট কাহিনী, ছোট গল্প, নীতি-গর্ভ কথা, তাহাও যে অগণিত। একলব্য, বিদুলা, ধর্ম্মব্যাধ, স্বর্ণনকুল, বৃক্ষ ও পবনের কলহ, আরও কত কথা ও কাহিনী আছে!

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিস্ময়কর অংশ শান্তিপর্ব্ব। সংসার-জ্ঞান, নীতিজ্ঞান, রাজনীতিজ্ঞান, আপদ্ধর্ম্ম-জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্মযোগ, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের শিক্ষা, নানাবিধ তত্ত্বালোচনায় ভীষ্ম-প্রোক্ত এই শান্তিপর্ব্ব অতিমহান্, অতি বিপুল।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বেদের জটিল যাগযজ্ঞকে প্রাধান্য দেন নাই, বরং তাহা ত্যাগ করিয়া সরল আত্মযজ্ঞ, জপযজ্ঞ, কর্ম্মযোগ, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের সাধনাই পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন। ভীষ্মদেবও শান্তি-পর্ব্বে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য প্রচার না করিয়া নীতিধর্ম্ম, সাংখ্যযোগ ও উপনিষদ্-ধর্ম্মের কথাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ

* রূপকটি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

এই সময় হইতে ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির নব গঠন হইতে থাকে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সরল পথেই সাধক সমাজ বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন।

ভারতবর্ষের দুইখানি মহাগ্রন্থ, একখানি ঋগ্বেদ, অপর এই মহাভারত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আলোচনায় এই অদ্ভুত গ্রন্থে যাহা আছে, তাহা অন্যত্র থাকিলেও পারে ; কিন্তু যাহা নাই, তাহা অন্যত্র নাই ;—

যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ ॥

[আদিপর্ব্ব ৬২-৬৩]

যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে ;

—ইহা সত্য সত্য সত্য।

পুরাণ

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্ত্তি।

ধ্যান-স্তিমিত-লোচন চতুরানন ব্রহ্মা একটি রক্ত-পদ্মে সমাসীন। উন্নত উজ্জ্বল দেহের বাম করে কমণ্ডলু, দক্ষিণ করে যজ্ঞের স্রুব বা হাতা, আর দু'খানি করে জপমালা এবং অভয়। তাঁহার বামপার্শ্বে সাবিত্রী দেবী, দক্ষিণে সরস্বতী, সম্মুখে বেদরাশি অবস্থিত। পুরোভাগে ঋষিগণ বেদধ্বনি করিতেছেন! ইনি দেবতা ও অসুরগণের পিতামহ, ইনি প্রজাপতি, ইনি কখনও বা হংসপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া থাকেন। ইনি সৃষ্টি-কর্ত্তা, অনাদিকাল হইতে সতত অসংখ্য জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিতেছেন!

বিষ্ণু বা নারায়ণ জ্যোতির্ম্ময় সবিতৃমণ্ডলের মধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার হিরণ্ময় অঙ্গে কণক কেয়ূর, কিরীট, কুণ্ডল ও হার। ইনি চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন এবং সর্ব্বদা সকল জগৎ পালন করিতেছেন।

শিব বা মহেশ্বরের কান্তি রজতগিরির ন্যায় শুভ্র। ইনি পঞ্চ-মুখ ও ত্রি-নয়ন, ললাটে চারুচন্দ্র এবং পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম শোভমান। পদ্মাসীন এই দেবতা সতত অমরগণ-কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া বরাভয়হস্তে নিখিলের ভয় হরণ করিতেছেন। মহাপ্রলয়ে তাণ্ডবে মত্ত হইয়া ইনিই রুদ্ররূপে বিশ্বসংহার করিয়া থাকেন।

এই ত্রিমূর্ত্তি মিলিত হইয়া একমূর্ত্তি,—পরমেশ্বর, যিনি জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। এ দেবতা নূতন, রূপকল্পনা নূতন এবং পূজাবিধিও নূতন। বৈদিক যাগযজ্ঞ বা উপনিষদের অরূপের ধ্যান-ধারণা আর নাই। এক একটি গুণ আশ্রয় করিয়া

এক একটি দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা হইতেছে, মাটি বা ধাতুর নির্ম্মিত প্রতিমায় দেবতার আবির্ভাব মনে করিয়া তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ্য, ধূপ-দীপ, পুষ্প-পত্র ও নৈবেদ্য দ্বারা অর্চ্চনা করা হইতেছে; দেবতার তৃপ্তির জন্য বাদ্য, গীত ও নৃত্য হইতেছে। এই দেবতা পৌরাণিক দেবতা এবং এই উপাসনাও পৌরাণিক উপাসনা। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে গৃহে বা মন্দিরে এই পৌরাণিক দেবতাই এখন প্রতিষ্ঠিত, এবং পৌরাণিক মতে এই দেবতারই উপাসনা নানা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতির সহিত বৈদিক দেবতাও অদৃশ্য হইয়াছেন। পৌরাণিক দেবতা একেবারে বেদ-বহির্ভূত নূতন দেবতা না হইলেও ঋগ্বেদের দেবসভায় তাঁহাদের স্থান ছিল অপ্রধান বা নগণ্য।

এ এক ভিন্ন সংস্কৃতি এবং সভ্যতা! ইহা পূরাপূরি আর্য্য-সংস্কৃতি, আর্য্য-সভ্যতা নহে, আবার পূরাপূরি আর্য্যেতর সংস্কৃতি এবং আর্য্যেতর সভ্যতাও নহে; টানা ও পড়েনের সূত্রের ন্যায় উভয়ের মিশ্রণে, উভয় এক হইয়া হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুসভ্যতার জন্ম দিয়াছে। হিন্দুজাতি, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসংস্কৃতি এবং হিন্দুআচার সর্ব্বত্রই এই আর্য্য ও আর্য্যেতর জাতির দান, দৃষ্টি, সাধনা মিলিত হইয়াছে, সমন্বিত হইয়াছে, একীভূত হইয়াছে। আর্য্যেতর জাতি অগণিত সংখ্যায় ছিল বলিয়া ভারতবর্ষ তাহাদের বিশেষ উপলব্ধি ও বিশেষ উপায়কে অস্বীকার করিতে পারে নাই; কিন্তু আর্য্যপ্রতিভা তাহার সমুন্নত তত্ত্ব-বিচার ও প্রজ্ঞাদ্বারা তাহাকে সংস্কৃত করিয়াছে, শুদ্ধ করিয়াছে, রূপকাশ্রয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদ্বারা মহনীয় ও বরণীয় করিয়াছে, সত্য-শিব-সুন্দরের যুগপৎ প্রকাশে তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়াছে।

দেবাদিদেব মহাদেবকেই আমরা সর্ব্বাগ্রে ধারণা করিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বেদ-পূর্ব্ব মোহেন্-জো-দড়োর যুগে শিব, শুধু শিব নয়, শিব ও উমা,—এমন কি তাঁহাদের লিঙ্গ ও গৌরী-পট্টময় প্রতীক যে পূজিত হইত, পণ্ডিতগণ সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। পুরাণের বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস। আর্য্যদের বৈদিক যজ্ঞে শিবের ভাগ নাই; তিনি অবহেলিত, অনিমন্ত্রিত, অশুচি দেবতা; ব্রহ্মণ্যশক্তির আশ্রয়-স্থল, প্রজাপতি দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করিবার চেষ্টা পাইলেন। বীরভদ্র-চালিত ভূত-প্রেতের তাণ্ডবে যজ্ঞ ধ্বংস হইয়া গেল, বৈদিক ঋষিগণের নানা লাঞ্ছনা ঘটিল এবং দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ হইল। শিবকে প্রধান দেবতা বলিয়া স্তব করা হইলে তুষ্ট শিবের বরে দক্ষ পুনর্জীবন লাভ করিলেন। বৈদিক দেবসভায় শিবের প্রধান আসন লইয়া আর্য্য ও আর্য্যেতর জাতির যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, এ কাহিনী তাহারই পল্লবিত ইতিহাস। শক্তিধর যত রাক্ষস, যত অসুর, যত দানব, সকলেই প্রায় শিবের ভক্ত ও উপাসক। অপর দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, বৈদিক রুদ্র দেবতা ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শিবদেবতায় পরিণত হইতেছেন। এই রুদ্র বা শিবের উদ্দেশ্যেই যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়ে বন্দনা উঠিয়াছে,—

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ।
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

—শম্ভুকে নমস্কার, সুখভবকে নমস্কার।
শঙ্করকে নমস্কার, সুখকরকে নমস্কার।
শিবকে নমস্কার, শিবতরকে নমস্কার।

বৈদিক অগ্নিদেবতাও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লইয়া শিবরূপে লীন হইতেছিলেন। এই শিবই যাযাবর ব্রাহ্মণ ও ব্রাত্যদের দেবতা। ব্রাত্যস্তোম বা শুদ্ধিযজ্ঞের পর হাজার হাজার ব্রাত্য একসঙ্গে বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ হইয়া যাইতেন এবং বেদপাঠ, বৈদিক যজ্ঞ ও শিবার্চ্চনা করিয়া ঋষিদের সহিত একত্র পানভোজন করিতেন।

শিবের বাহ্যরূপ বিচার করিলে অনার্যভাবেরই পরিচয় হয়। শিব উলঙ্গ বা তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কণ্ঠে সর্পমালা, বৃষভ তাঁহার বাহন, পর্ব্বতে তাঁহার বাস, ভূতপ্রেত লইয়া শ্মশানে তিনি বিচরণ করেন এবং চিতাভস্ম গায়ে মাখিয়া বিষ, সিদ্ধি বা ধুস্তূর সেবন করিয়া থাকেন।

সংখ্যাতীত অনার্য্য নরনারীর নিত্য-পূজিত এই শ্মশানচারী উন্মত্ত দেবতাকে আর্য্যঋষিগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু বৈদিক রুদ্রদেবতার অঙ্গীভূত করিয়া শিবদেবতাকে তাঁহারা নূতন করিয়া প্রকাশ করিলেন। শিবের প্রত্যেকটি ভূষণ ও আচারের রূপকাশ্রয়ে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদ্বারা ঋষিগণ তাঁহাকে এমন মহিমান্বিত করিলেন যে, তিনি হইলেন হিন্দুস্থানের প্রধান দেবতা, দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁহার পূজায় স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলেরই সমান অধিকার। ভক্তি ছাড়া এ পূজায় আর কোন উপচারই লাগে না; শুধু একটি বিল্বপত্র, শুধু একটু জল, তাহাতেই আশুতোষ পরম তুষ্ট।

এ দেবতার বাহন বৃষ হইতেছে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম। দেবতা উলঙ্গ ন'ন, তিনি দিগম্বর—দিক্ ব্যাপিয়া অম্বর যাঁর, বিশ্বব্যাপী ভূমা তিনি, তাঁহার আবার বসন হইবে কি করিয়া? প্রপঞ্চ-পরাঙ্মুখ মহাযোগী তিনি বাঘাম্বর এবং বাঘাম্বরেই ধ্যানাসীন। পৃথিবীর ভয়স্থান বিষধর সর্প—পৃথিবীর যত দুঃখ, যত ব্যাধি, বিপদ ও অমঙ্গল, সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া, জটার কিরীট-ভূষণ করিয়া পরম শিব

তিনি নির্বিকার রহিয়াছেন। তাঁহার অগণিত রত্ন-ভাণ্ডার তিনি স্পর্শ করেন না, সেবক কুবের তাহা রক্ষা ও ভোগ করিতেছেন। শ্মশানে চিতাবিভূতি অঙ্গে মাখিয়া সংহারের দেবতা তিনি সৃষ্টির ক্ষণভঙ্গুর সত্তা, সংসারের নশ্বরত্ব, এই জগতের চরম পরিণাম পরম বৈরাগ্যভরে ঘোষণা করিতেছেন। দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনে যখন উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, কৌস্তুভমণি বা পরম অমৃত উত্থিত হইল, তখন শিবকে কেহ স্মরণ করেন নাই, দেবতাগণ সুধা বাঁটিয়া লইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই যখন পীড়িত বাসুকি নাগের উদ্গীর্ণ কালকূট—হলাহল গরলরাশি দুগ্ধসমুদ্রকে নীল করিয়া বিশ্ব বিনাশ করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনিই সে হলাহল পান করিয়া বিশ্বকে সুস্থির করেন। মঙ্গলের দেবতা তিনি, সৃষ্টির সমস্ত অমঙ্গল-বিষকে পান করিয়া হইয়াছেন নীলকণ্ঠ, নীল-লোহিত। শিবের তৃতীয় নেত্র প্রজ্ঞানেত্র, যোগিরাজের যোগসিদ্ধির ফলে যে জ্ঞান-নেত্রের আবির্ভাব ঘটে, ইহা তাহাই। এই নেত্রজাত জ্ঞানবহ্নিদ্বারাই তিনি রতি-সহায় মদনকে ভস্মীভূত করিয়া উমার পরিণয়-প্রসঙ্গে কামের দৌত্যকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই জ্ঞাননেত্রের কেবল উপরি-ভাগেই ভক্তের প্রতি অমৃত-বর্ষী স্নিগ্ধ চন্দ্রকলা দীপ্যমান। তাঁহারই জটিল শীর্ষ অবলম্বন করিয়া ভূলোকে গঙ্গাবতরণ হয়। হিমালয়ের বিশালতায় ও স্তব্ধতায় তাঁহারই মহিমা ফুটিয়াছে, হিমালয়ের গভীর অরণ্য-পরম্পরায় তাঁহারই গহন জটাজালের আভাস জাগিতেছে ; সে জটারণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুরধুনী মন্দাকিনী মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়ছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে বুদ্ধের ধ্যান-প্রশান্ত মহিমা তাঁহাকেই সংসার-বিরাগী যোগিরাজরূপে পরিচিত করিয়াছে। তিনিই তন্ত্রের মহাভৈরব, তিনিই বেদের মহারুদ্র, তিনিই নটরাজরূপে বিশ্বে সৃষ্টি-

লীলার অপরূপ অভিনয় করিয়া, আবার প্রলয়-তাণ্ডবে ধ্বংসের আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। বামে উমাকে সঙ্গিনী করিয়া তিনিই সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-রূপে প্রকাশিত হ'ন। তিনি আদর্শ গৃহী, তাঁহার গৃহস্থালীর তুলনা কোথায়? দশদিকে দশভুজ বিস্তার করিয়া সিংহ-বাহিনী অসুরমর্দ্দিনী মহাশক্তি দুর্গা তাঁহার গৃহিণী, ঋদ্ধি ও বিদ্যা-স্বরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁহার দুই কন্যা, বল ও সিদ্ধিরূপী কার্ত্তিকেয় ও গণেশ তাঁহার দুই পুত্র। এই সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া ও অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান মহাগৃহী শঙ্কর; হস্ত-ধৃত ত্রিশূল জীবের ত্রিতাপ বিনাশ করিতেছে। ইনি জ্ঞানীশ্বর, সাক্ষাৎ পরম জ্ঞান। শিবশক্তির ভেদ ঘুচাইয়া ইনিই হ'ন বেদান্তের অদ্বৈত ব্রহ্ম, রজতগিরি-নিভ-কান্তি পরম জ্যোতিরূপে প্রকাশমান। এই পুরুষ হইতে জাত মঙ্গল বলিয়া ইনি শম্ভু, মঙ্গল করেন বলিয়া ইনি শঙ্কর; ইনিই সাক্ষাৎ মঙ্গল, তাই শিব। ইনি আশুতোষ, মৃত্যুঞ্জয়; ভুজগভূষণ, নীলকণ্ঠ; ইনি স্মরহর, চন্দ্রশেখর; ইনি গঙ্গাধর, পরমেশ্বর; ইনিই পরম ব্রহ্ম। শিবের কত নাম, কত রূপ! কত কাহিনী আশ্রয় করিয়া পর্ব্বতে, নদীতটে, অরণ্যে, নগরে ও গ্রামে ইনি নিত্য পূজিত হইতেছেন। কত কুৎসিত কাহিনী প্রেত পিশাচের ন্যায় ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে। শিবের মহীয়সী কল্পনা ব্যাখ্যা করিতে পারে কে? সত্যই ইনি আদিদেব, দেবদেব, মহাদেব; সর্ব্বভাব, সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বজ্ঞান ইঁহাতেই সমন্বয় লাভ করিয়াছে; মানুষের কল্পনার চূড়ান্ত পরিস্ফূর্ত্তি এখানেই। শৈবগণের উদার মন্ত্র হইতেছে,—যত্র জীবঃ, তত্র শিবঃ।

তাঁহারা বলেন,—

মাতা মে পার্ব্বতী দেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

—মাতা আমার পার্ব্বতী দেবী, পিতা দেবতা মহেশ্বর, বান্ধব শিবভক্তগণ এবং স্বদেশ হইতেছে ত্রিভুবন।

পৌরাণিক সকল দেবতা-সম্বন্ধেই অল্প বিস্তর এইরূপ ইতিহাস ও এইরূপ ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইতে পারে। আর্য্য ও আর্য্যেতর উভয় জাতির ঐতিহ্য, উভয় জাতির দেবতাবাদ, উভয় জাতির প্রচলিত রাজকাহিনী ও শক্তিধর পুরুষদের কাহিনী সম্মিলিত হইয়া হিন্দু পুরাণের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহা প্রথম হইতেই আর্য্য-প্রতিভা দ্বারা আর্য্য-ভাষায় গ্রথিত হইয়া আর্য্যের প্রাধান্য ও প্রভাব প্রচার করিয়াছে। পুরাণগুলি এই নব সংস্কৃতি ও নব সভ্যতার রূপ বহন করে।

আমাদের শাস্ত্রে পুরাণগ্রন্থের দুইটি পরিচয় আছে। প্রথম. ইহা বেদ-মূলক, ইহা বেদের শিক্ষাকে আখ্যান ও রূপকের সাহায্যে মনোরম করিয়া জনসমাজে প্রচারিত করে, ইহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই জন্য পুরাণের অপর নাম পঞ্চম বেদ। রামায়ণ-মহাভারতও এই অর্থে পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পরিচয় এই,—ইহা পঞ্চলক্ষণ-সমন্বিত। সেই পঞ্চ লক্ষণ হইতেছে,—সৃষ্টির বিবরণ, প্রলয়ের বিবরণ, মন্বন্তর বা মনুকালের বিবরণ, রাজা, ঋষি বা প্রধান ব্যক্তিদের বংশ-বিবরণ এবং সেই সকল বংশজাত বিখ্যাত পুরুষদিগের কীর্ত্তি কলাপের বিবরণ। এই দুই পরিচয়ে কোন পার্থক্য নাই, প্রথমটি পুরাণের স্বরূপ লক্ষণ, দ্বিতীয়টি বাহ্য লক্ষণ। সৃষ্টি ও প্রলয় প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিয়া বৈরাগ্য ও ভক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্যই বর্ণিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে যাহা পুরাণ বা পুরাতন, তাহাই পুরাণ। বেদের সমকাল বা হয়তো তাহারও পূর্ব্বকাল হইতে

প্রচলিত পুরাবৃত্ত, ইতিবৃত্ত, ইতিহাস, আর্য্য বা আর্য্যেতর জাতির রূপ-কথা, ইতিকথা, নীতিকথা, ব্যাবহারিক জ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞান, অন্যান্য বিদ্যা, তাহার ভূয়োদর্শন ও চিন্তার সমস্ত ফল, তাহার ভাবজগৎ ও কর্ম্মজগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, উদ্দীপনাময় ও অনুপ্রাণনাময়, তাহা এই পুরাণ-নামক গ্রন্থরাশিতে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব বিশ্বকোষ। অলঙ্কার-শাস্ত্র, ব্যাকরণ-শাস্ত্র, বৈদ্য-শাস্ত্র, বিজ্ঞান-শাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র প্রভৃতির সহিত ভূগোল এবং আফ্রিকার নীলনদ ও তাহার উৎস-স্থলের বিবরণ পর্য্যন্ত ইহাতে পাওয়া যায়। পুরাণের সংখ্যা আঠারখানি, আঠার খানি পুরাণের মোট শ্লোক-সংখ্যা চারি লক্ষ, অর্থাৎ উহা চারিখানি মহাভারতের সমান। ইহা ব্যতীত আঠার খানি উপপুরাণও আছে। পুরাণ-সমুদয় সংস্কৃতশ্লোকে, ক্বচিৎ সংস্কৃতগদ্যে রচিত। কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান, সকল বিষয়ের শিক্ষা থাকিলেও পুরাণে ভক্তি-ধর্ম্মের শিক্ষাই মুখ্য, কারণ উহা জনগণের সদ্য কল্যাণ করে এবং উহা সহজেই অনুসরণ করা যায়।

যে প্রতিমাপূজা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, এবং যাহার জন্য বিদেশীয়গণ হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া থাকেন, বেদে তাহার কোন উল্লেখ নাই। বেদে উপাসনার জন্য কোন দেবতার রূপকল্পনা হয় নাই। ইহা আর্য্যেতর জাতির সংশ্রব হইতে হিন্দু উপাসনায় পরে প্রবেশ করিয়াছে। আর্য্যগণ ইহাকে কি বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়াছেন? প্রতিমা শব্দটির মধ্যেই তাঁহাদের চিন্তার মূল সূত্র পাওয়া যাইবে। প্রতিমা অর্থই প্রতিমূর্ত্তি, কল্পিত শরীর, যাহা image, যাহা আসল বা স্বরূপ নয়; কিন্তু আসলের ছায়ায় তাহারই গুণাবলম্বনে রূপ-কল্পনা মাত্র। কবিগণ যেমন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষকে

স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেন, মুনিগণ তেমনই অপ্রত্যক্ষ, অরূপ কিন্তু গুণময়কে বুঝাইবার জন্য গুণাশ্রয়ে রূপের কল্পনা করিয়া থাকেন। শাস্ত্র নিজেই বলেন, "ব্রহ্মা যদিও চিন্ময়, অপ্রমেয়, নির্গুণ এবং অশরীরী, তথাপি সাধকগণের হিতের জন্য তাঁহার রূপকল্পনা হইয়া থাকে।"

[কুলার্ণব—৬ষ্ঠ উল্লাস]

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—ধ্যান, ধারণা বা স্তুতিজপ অন্তঃপূজা ; প্রতিমা পূজা বাহ্যপূজা, তাহা অধম তাহাতে সন্দেহ নাই। রূপ, চিহ্ন বা প্রতীক, অথবা শব্দ আশ্রয় না করিয়া অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়ের ধারণা ও আরাধনা করিতে পারিয়াছে কয়জন? সাধারণ মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া অতীন্দ্রিয়কে বুঝা সম্ভবপর কি? পরমেশ্বরকে নামদ্বারা চিহ্নিত করিয়া হরি, God বা আল্লা শব্দদ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া যে জপ বা উপাসনা, তাহা নাম-প্রতিমার সাহায্যে উপাসনা নয় কি? নাম শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে হয়, নামব্রহ্মের উপাসনাও তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াবলম্বনে উপাসনা। এইরূপেই রূপ-প্রতিমার সাহায্যে উপাসনা, রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়, অবশ্য ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্থূল। কিন্তু পুরাণের মুনিগণ মনে করিতেন, প্রথমাবস্থায় সগুণ ঈশ্বরের গুণরাশিকে রূপ বা প্রতীকদ্বারা প্রকাশ করিতে পারিলে সাধারণ লোকের পক্ষে রূপাশ্রয়ে গুণের উপলব্ধি সহজ হইবে। সাধকগণ রূপাবলম্বনে উপাসনা করিতে করিতে অরূপ জ্যোতি, এবং পরে স্বরূপ সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ভক্তরাজ রামপ্রসাদ সেন এবং পরমহংস রামকৃষ্ণদেব উভয়ই ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল। ভক্তকবি রামপ্রসাদের সেই মর্ম্মস্পর্শী গান,—

ত্যজিব সব ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ,
তারা আমার নিরাকারা।"

—এই সত্যেরই ইঙ্গিত করে। মন্দির, মস্‌জিদ বা গীর্জ্জায় বিশ্বব্যাপী ভাগবতসত্তার বিশেষ প্রকাশস্থান মনে করা অপরাধ নয় কি? ক্রুশ বা লিঙ্গ প্রতীক গ্রহণ করাও অনেকটা জড়োপাসনার সামিল নয় কি? ঈশ্বর সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রকাশমান; অগ্নিতে, বারিতে, সূর্য্যে, শশাঙ্কে, মৃত্তিকায় ও প্রস্তরে, বিশ্বভুবনে একমাত্র তাঁহারই সত্তা দীপ্যমান। 'এখানে তিনি নাই'—একথা যেমন মিথ্যা কথা, 'একমাত্র এখানেই তিনি আছেন'—ইহাও তেমনই মিথ্যা কথা। যেখানে সাধকের মনঃসংযোগ হয়, মন সমাহিত হয়, যেখানে রূপাশ্রয়ে রূপ-সূচিত গুণরাশির সহজ উপলব্ধি হয়, সেখানেই দেবতার বিশেষ প্রকাশ ঘটিবে। মুনিগণ-ব্যাখ্যাত প্রতিমা বা প্রতীকোপসনার ইহাই রহস্য। একটি সত্যকে সকলদিক হইতে সমগ্রভাবে দেখিয়াছি, এ স্পর্দ্ধা কোনও মানুষের পক্ষে সাজে না। অনন্ত যাঁহার সত্তা, অনন্ত যাঁহার বিভূতি, অনন্ত যাঁহার গুণ, অনন্ত যাঁহার রূপ, অনন্ত যাঁহার সৃষ্ট মানুষের প্রকৃতি ও রুচি, তাঁহার উপাসনা-প্রণালীও অনন্ত হইবে। পৌরাণিক প্রতিমা-কল্পনা ও তাহার সাহায্যে উপাসনা একটি প্রণালীমাত্র, একটি বিশেষ সংস্কৃতির পরিচায়ক মাত্র। তথাপি হিন্দুগণের নিকটেই—

"ব্রহ্মসদ্ভাব উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম, বাহ্যপূজা অধমেরও অধম।"

[মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ১৪শ উল্লাস]

কিন্তু ইহা পূজা, ইহা ব্রহ্মসান্নিধ্য আনয়ন করে ; ইহা নিষ্ক্রিয়তা, নাস্তিকতা বা ব্রহ্মবিমুখতা হইতে সহস্রগুণে বরণীয়।

ভাব কি প্রকারে রূপ গ্রহণ করে, সরস্বতীর মূর্ত্তি লক্ষ্য করিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। সরস্বতী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিদ্যার আলোকে সমস্ত অবিদ্যার অন্ধকার দূরীভূত করেন ; তাই তিনি সর্ব্বশুক্লা বা অখণ্ড জ্যোতিঃ-স্বরূপা। সরস্বতীর বর্ণ শুক্ল, বসন শুক্ল, আসন যে পদ্ম বা হংস তাহাও শুক্ল ; তিনি শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী, তাই জ্যোতির্ম্ময়ী। এক হস্তে পুস্তক, যাবতীয় বিদ্যার প্রতীক ; অপর হস্তে বীণা, মহানাদ প্রণব অথবা গীতবাদ্য প্রভৃতি সুকুমার কলার প্রতীক। যোগিগণের প্রস্ফুটিত মানস-শতদলে শুদ্ধ বিদ্যার অধিষ্ঠান, নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করিতে পারে যে মরাল, সেই তাঁহার বাহন। এই রূপ-কল্পনায় কিছুমাত্র আর্য্যেতর জাতির প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। বেদমাতা সরস্বতীরই ইহা উপযুক্ত প্রতিমা। আরম্ভে ব্রহ্মার যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও কেবলমাত্র বৈদিক ধারণা-অনুসারেই কল্পিত। আর্য্যেতর জাতির প্রভাব নাই বলিয়াই ব্রহ্মার কোন উপাসকমণ্ডলী বা ভক্তসম্প্রদায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও লক্ষ্মী সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না ; ইহারা হিন্দুস্থানের প্রধান দেবতা। কোটি কোটি ভক্ত তাঁহাদের স্মরণে, তাঁহাদের ধ্যানে, তাঁহাদের আরাধনে ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে, পরম ভক্তি ও পরম জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে। এই দেবতা-যুগলকে ঘিরিয়া কত কাহিনী, কত আখ্যায়িকা হিন্দু জীবনের মহত্তম নীতি ও জ্ঞানকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

পুরাণে হিন্দুর উপাস্য পঞ্চ দেবতা সম্বন্ধেই অনেক আলোচনা রহিয়াছে। এই পঞ্চ দেবতা হইতেছেন,—সূর্য্য, গণপতি, শিব,

বিষ্ণু এবং শক্তি। এই পঞ্চ দেবতার উপাসনার মূল যে বেদেও পাওয়া যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের যে কোন দেবতার পূজায় পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া লইতে হয়। ইহাদের উপাসকমণ্ডলী সৌরসম্প্রদায়, গাণপত্যসম্প্রদায়, শৈবসম্প্রদায়, বৈষ্ণবসম্প্রদায় এবং শাক্তসম্প্রদায় নামে পরিচিত; এবং ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দুসমাজ সাধারণতঃ এই পঞ্চ উপাসক-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বাঙ্গালাদেশে সাধারণতঃ শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই তিন সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। শিব দেবতার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা হইয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী দুইটি পরিচ্ছেদে পৃথক্ আলোচনা হইবে। এই পঞ্চ দেবতার মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুদেবতার অবতার স্বীকৃত হইয়া থাকে। বিষ্ণুর অবতার-সংখ্যা দশ, কোন পুরাণ-মতে চব্বিশ, কোন পুরাণ-মতে অসংখ্যেয়। যেখানেই সৃষ্টি ও ধর্ম্মরক্ষা-কর অতিমানুষী মহা-শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানেই মানুষ ভগবানের বিশেষ বিভূতি উপলব্ধি করিয়া অবতার স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশে শরৎকালে গৃহে গৃহে যে মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, তাহারও মূল এই পুরাণে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী-অনুযায়ী বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব এই বার্ষিক দুর্গাপূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় হিন্দুর একখানি নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ। অবশ্য এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য অন্যরূপ। চণ্ডীগ্রন্থে মহাদেবীর তিনটি চরিত দৃষ্ট হয়; প্রথম চরিতে মধুকৈটভ-বধ, মধ্যম চরিতে মহিষাসুর-বধ এবং উত্তর চরিতে শুম্ভনিশুম্ভ-বধ বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যম চরিতে উল্লিখিত আছে,—মহিষাসুর-কর্ত্তৃক স্বর্গভূমি অধিকৃত হইলে ক্রুদ্ধ দেবগণের দেহ হইতে এক একটি মহৎ তেজ প্রকাশ পাইতে থাকে, এই সমুদয় তেজ এক হইয়া জ্বলন্ত পর্ব্বতের

আকার ধারণ করে, এবং এই মিলিত মহাতেজ হইতে নারীরূপে মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই শক্তিই দেবগণ-কর্তৃক পূজিতা হইয়া মহিষাসুর বিনাশ এবং স্বর্গভূমি উদ্ধার করেন। তিন চরিতে দেবীর চারিটি স্তব আছে, এই স্তব কয়টির প্রভাব ও মহিমা অতুলনীয়। চৈতন্যই শক্তি, শক্তির বহুবিধ প্রকাশ এই ভালমন্দ যাবতীয় সৃষ্টি। এই শক্তিই মায়া, মায়ার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, সকল মানুষ, সকল জীব মহামায়ার প্রভাবে মোহিত হইয়া স্বার্থবশে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। কে এই দেবী? মুনি বলেন,—তিনিই সৃষ্টি-কারিণী, স্থিতি ও সংহার-কারিণী শক্তি; মহাবিদ্যা, মহামায়া ও মহাসুরী তিনিই; তিনি কালরাত্রি ও মোহরাত্রি; তিনি শ্রী, লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি ও ক্ষান্তি; তিনি সৌম্যা, সৌম্যতরা, অশেষ সৌম্য হইতেও তিনি অতিসুন্দরী; সৎ বা অসৎ যাবতীয় বস্তুর তিনিই একমাত্র শক্তি, তিনি পরমেশ্বরী। পুণ্যবানের ভবনে তিনি লক্ষ্মী-স্বরূপা, পাপাত্মাদের গৃহে তিনি অলক্ষ্মী-স্বরূপা, বুদ্ধিমানের হৃদয়ে তিনি বুদ্ধি এবং সাধুপুরুষগণের অন্তরে শ্রদ্ধা-স্বরূপা, তিনিই সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে এবং সর্ব্ববিধ শক্তি-রূপে অবস্থিতা। তিনিই বিশ্বের বীজ, পরমা মায়া; সমস্ত বিদ্যা এবং সমস্ত নারী তাঁহারই রূপভেদ; সমস্ত জগৎ তাঁহার প্রভাবেই সম্মোহিত হইয়াছে, এবং একমাত্র তিনি প্রসন্না হইলেই মানুষের মোহমুক্তি সম্ভবপর হয়। দেবী নিজেই বলেন,—

একৈবাঽহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

—এ জগতে আমি একাই বর্ত্তমান, আমার আবার দ্বিতীয় কে? বহুরূপে দেবী একাই জগৎ-খেলা খেলিতেছেন। চণ্ডীপাঠ দ্বারা, পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-যুক্ত পূজাদ্বারা এবং হোম ও আত্মনিবেদন-

দ্বারা তিনি প্রীতা হইয়া থাকেন। এই পরমেশ্বরীর শরণ লও, আরাধিত হইলে তিনি বিত্ত, পুত্র, ভোগ, স্বর্গ, ধর্ম্মে শুভা মতি এবং মোক্ষ দান করিয়া থাকেন। কথিত আছে, এই দেবীকে প্রসন্ন করিবার জন্য মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি তিন বৎসর পূজা ও তপস্যা করেন, এবং নিজ নিজ গাত্র হইতে রুধির-ধারা বলিরূপে অর্পণ করেন। দুর্গাপূজার মূল ইতিহাস ইহাই।

পুরাণে দেবতার সংখ্যা নাকি তেত্রিশ কোটি। দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ হউক, অথবা তেত্রিশ কোটি হউক, হিন্দুর শাস্ত্রকারগণ দেবতার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব কখনও বিস্মৃত হ'ন নাই। ইষ্ট দেবতা শিব, বিষ্ণু অথবা শক্তিই হউন, আরাধনার সময়ে প্রত্যেক দেবতাই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারী, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বগুণাধার পরমেশ্বর-রূপেই অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। সাধকের রুচি-ভেদ এবং প্রকৃতি-ভেদের জন্যই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরমেশ্বরের বহুরূপে উপাসনা দৃষ্ট হয়। পুরাণকার ব্যাসকাশী প্রভৃতি নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন দেবতার একত্ব ও অভিন্নত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্দ্ধাঙ্গ হরি এবং অর্দ্ধাঙ্গ হর লইয়া এক হরিহর-মূর্ত্তি, অথবা অর্দ্ধাঙ্গ উমা এবং অর্দ্ধাঙ্গ শিব লইয়া অখণ্ড অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি বৈষ্ণব ও শৈবের দ্বন্দ্ব এবং শাক্ত ও শৈবের দ্বন্দ্ব ঘুচাইবার জন্যই পরিকল্পিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—ঋগ্বেদের এই মহাবাণী পুরাণকার মুনিগণ নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

যখন একজন ভক্ত বলেন, "তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে",

এবং অপর ভক্ত বলেন, "তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমল-লোচনঃ",

তখন বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি-ভেদে উপাসকদের রুচি-ভেদ আছে। তাই শ্রেষ্ঠ ভক্ত স্বীয় ইষ্ট-দেবতার স্তব পাঠ করিতে বলিয়া থাকেন,—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্য স্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

—রুচির বৈচিত্র্য-হেতু ঋজু এবং কুটিল নানাপথই মানুষ সেবা করে, কিন্তু সকলেরই একমাত্র গম্যস্থল তুমি, সমুদ্র যেপ্রকার ঋজু-গামিনী অথবা বক্র-গামিনী সকল নদীরই একমাত্র মিলন-স্থল! হিন্দুশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশ যক্ষের প্রশ্নোত্তরে বনবাসী যুধিষ্ঠিরের মুখে ধ্বনিত হইয়াছে,—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

—বেদ বিভিন্ন, স্মৃতিশাস্ত্রও বিভিন্ন, এমন মুনি নাই যাঁহার মত ভিন্ন নয়, ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত আছে—তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; মহাজন যে পথে গিয়াছেন, তাঁহাই প্রকৃত পথ।

হিন্দুধর্ম্ম রুচির বিভিন্নতা, মতের বিভিন্নতা এবং পথেরও বিভিন্নতা স্বীকার করে। এই ধর্ম্ম তাই মতবাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা দিয়া ব্যক্তিগত গুণ বিকাশের সুযোগ দিয়াছে। এই ধর্ম্মের উদারতার অবধি নাই, ইহার dogma বা creed নাই, এই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ আচার—সদাচার।

পুরাণে কত কাহিনী, কত আখ্যায়িকা, কত রূপক, কত নীতিকথা, কত ব্রতকথা রহিয়াছে; কত রাজচরিত, ঋষিচরিত, দৈত্যচরিত, কত মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ রহিয়াছে! পুরাণের একটি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা ধ্রুবের আখ্যায়িকা; একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, উহার চরিত্রগুলির নামের মধ্য দিয়াও উচ্চাঙ্গের রূপক ফুটিয়া উঠিতেছে।

রাজার নাম উত্তানপাদ; উত্তান অর্থাৎ চিৎ করা পাদ যার, অস্বাভাবিক বা বিপরীত আচরণ যার, তিনিই উত্তানপাদ। রাজার দুই পত্নী, সুরুচি ও সুনীতি। শোভনা রুচি, দীপ্তি বা কান্তি যার, তিনি সুরুচি, রূপসী বিলাসিনী; তিনিই রাজার প্রেয়সী। শোভনা নীতি যাঁর, তিনি সুনীতি; রাজা তাঁহাকে দেখিতে পারেন না। সুরুচির পুত্র উত্তম অর্থাৎ প্রেয়, রাজার আদুরে দুলাল। সুনীতির পুত্র ধ্রুব অর্থাৎ শ্রেয় এবং শাশ্বত, সুরুচি ও উত্তমের প্ররোচনায় রাজা তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তারপর মাতা সুনীতির শিক্ষা, নারদের দীক্ষা, ধ্রুবের তপস্যা, ভক্তির উদয়, শ্রীহরির অনুগ্রহ লাভ এবং রাজা, সুরুচি, উত্তম ও সকল রাজ্যবাসি-কর্তৃক ধ্রুবের সম্মাননা এবং ধ্রুবের সিংহাসন লাভ।

পুরাণে অনেক পরাক্রমশালী অসুর ও দৈত্যবংশের কাহিনী রহিয়াছে। বিষ্ণু-দ্বেষী দুই মহাদৈত্য হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকেই বধ করিতে চাহেন। শ্রীহরি অনন্যোপায় হইয়া মহাবরাহ-মূর্ত্তি ও নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বধ করেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্র পরম ভাগবত প্রহ্লাদ; তাঁহার নিষ্কাম হরিভক্তির তুলনা দৈত্যলোকে দূরের কথা, সুরলোকে বা নরলোকেও নাই, ধ্রুবের ভক্তিও যেন সেখানে ম্লান হইয়া যায়। প্রহ্লাদের পুত্র মহাদৈত্য বিরোচন বাক্য রক্ষা করিতে গিয়া বঞ্চক ব্রাহ্মণকে আপনার পরমায়ু দান করেন। বিরোচনের পুত্র অদ্ভুত-কর্ম্মা বলি, শ্রীহরি বামনাবতার ধারণ করিয়া ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা-চ্ছলে তাঁহার দানের অহঙ্কারকে একেবারে চূর্ণ করেন। আশ্চর্য্য এই দৈত্যবংশের বিক্রম ও ক্রিয়া-কলাপ। ইঁহাদের তপস্যার অবধি ছিল না, অর্জ্জিত শক্তি এবং শক্তি-লব্ধ রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যেরও অবধি ছিল না। দানাদি পুণ্যকর্ম্ম

এবং ভক্তিধর্ম্মেও কোন কোন দৈত্য ত্রিভুবনে অতুলনীয় ছিলেন। যে বংশ চারি পুরুষের মধ্যে তিনবার শ্রীহরির অবতার ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিল, সে বংশ কত বড় বল-ভূয়িষ্ঠ এবং মহিষ্ঠ!

পুরাণের কোন কোন অংশ যে অতি প্রাচীন, হয়তো বেদেরও প্রায় সমকালীন, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে উহারা বর্ত্তমান আকারে নিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে।

আমাদের বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যগুলিও এক হিসাবে বাঙ্গালা পুরাণ। ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল কাব্য বাস্তবিকই অনেকাংশে পুরাণ-লক্ষণান্বিত। খুল্লনা বা বেহুলার চরিত্র পৌরাণিক সতী-চরিত্রের ন্যায়ই আদর্শ শুদ্ধ চরিত্র; ত্যাগে ও তপস্যায়, নারীত্বের অপরূপ মহিমায় তাঁহারা সীতা সাবিত্রীরই সহোদরা। অন্যদিকে বণিক্ চন্দ্রধরের ন্যায় অনভিভবনীয় তেজ ও উদগ্র পৌরুষ-সম্পন্ন চরিত্র সংস্কৃতপুরাণেও বড় বেশী নাই।

সংস্কৃত পুরাণের ব্রতকথাগুলির ন্যায় বাঙ্গালায়ও অনেক ব্রত-কথা প্রচলিত আছে, এবং বাঙ্গালী বালিকা বা জননীদের দ্বারা নিত্য পালিতও হইয়াছে। বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্য এবং বাঙ্গালা ব্রত কথাগুলি বাঙ্গালার সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ বহন করে এবং তাহা কতকাংশে পৌরাণিক সংস্কৃতির সদৃশ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম

কাশ্মীর হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষে একদিন কোটি কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইত,—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

আজ সেদেশে বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ কেবলমাত্র কথা-শরীর লইয়া বাঁচিয়া আছে। সমগ্র ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া একখানি বৌদ্ধগ্রন্থও সংগ্রহ করা যায় নাই, তাহা মিলাইতে হইয়াছে ভারতের বহির্ভূত তিব্বত কিংবা চীন দেশ হইতে, অথবা সিংহল ও ব্রহ্মদেশ হইতে। বৌদ্ধমতের প্রচলিত অর্থ ছিল একটি পাষণ্ড ধর্ম্মমত। বাস্তবিকই কি বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতমহাসাগরের একটি বিপুল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ভারতবর্ষকে সহসা প্লাবিত করিয়া আবার ভারতমহাসাগরেই মিলাইয়া গিয়াছে? ভারতবর্ষ কি তাহার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট রাখে নাই? অথবা ইহা ভারতবর্ষেরই ভূতলজঠর-জাত মহান্যগ্রোধ-বৃক্ষের ন্যায় একদা বিশাল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষকে শীতল ছায়া ও অমৃতফল দানে পালন করিয়া কালধর্ম্মে ক্ষীণ, শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে বৃক্ষের বীজোদ্ভূত সহস্র তরু নানা আকারে, নানা দিকে বর্ত্তমান; এবং তাহার সুদৃঢ় শিকড়রাশি আজিও ভূগর্ব্তে লোকলোচনের অগোচরে ভারতীয় জীবনবৃক্ষের মূলে আশ্চর্য্যরূপে রসধারার সঞ্চার করিতেছে? বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কি ভারতবর্ষ হইতে ধ্বংস পাইয়াছে, না ইহার ভাল মন্দ সমস্ত

লইয়া ইহা সনাতন ভারতীয় ধর্ম্মে বিলীন হইয়া আছে ? ভারতের সংস্কৃতি ও আমাদের পরিচয় বুঝিবার জন্য বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিবার আবশ্যকতা নাই কি ?

ভারতবর্ষের মাটি খুঁড়িলেই অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধমন্দিরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ভারতের অধ্যাত্মসাধনা ও দার্শনিক চিন্তা-ভূমি সন্ধান করিলেও বৌদ্ধ সাধনা ও বৌদ্ধ চিন্তার প্রচুর পরিচয় মিলে। হিমালয়ের তুঙ্গ তুষার-দেশে বদরীনাথের মন্দিরে সন্ধান কর, দেখিবে দেবতা চতুর্ভুজ বিষ্ণু নহেন, তিনি দ্বিভুজ ধ্যানী বুদ্ধ। আবার বঙ্গোপসাগরের সৈকতদেশে জগন্নাথের মন্দিরে সন্ধান লও, দেখিবে বৌদ্ধ ত্রিরত্ন জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম নামে নিত্য পূজিত হইতেছেন। অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি শিবমূর্ত্তি বা বিষ্ণুমূর্ত্তিরূপে অর্চ্চনা পাইতেছে ; এবং অনেক বৌদ্ধতীর্থ হিন্দুতীর্থরূপে সম্মানিত হইতেছে। স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধদেব পুরাণের দশাবতারের নবম অবতার-রূপে সতত স্তুত হইতেছেন,—

নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতং
কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর জয় জগদীশ হরে !

বৈদিক যাগযজ্ঞ ও নিষ্ঠুর পশুঘাত কর্ম্ম লুপ্ত হইল এবং অহিংসার মহিমা স্বীকৃত হইল কাহার প্রভাবে ? যে পুরাণের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধ-আবির্ভাবের অনেক পরে রচিত ; পৌরাণিক উপাসনা-প্রণালীও অনেক পরে আবিষ্কৃত। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার ফলে সে যুগের অর্থ-হীন, প্রাণ-হীন, ঈশ্বরবুদ্ধি-হীন যাগযজ্ঞ ও পশুবলি বিরল হইয়া আসে। পরবর্ত্তী যুগে পুরাণকার বৌদ্ধদের এই মঙ্গলবিধি মানিয়া লইয়া এবং বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের

আবর্জ্জনারাশি যথাসম্ভব দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ঈশ্বর-বুদ্ধিকে প্রধান করিয়া জনসাধারণের জন্য সহজ পৌরাণিক উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত করেন। বৈদিক ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এবং আর্য্যেতর ধর্ম্মের মিলনের ফলে আর্য্য-সংস্কৃতির শাসনে উহাদের পরিণত রূপ, হিন্দু ধর্ম্মের আকারে প্রকাশ পায়। ধ্যানস্থ বুদ্ধদেব যোগাসনারূঢ় মহাদেবে পরিণত হ'ন। চিন্তার জগতেও পৃথিবীর বিস্ময়স্থান বেদান্তদর্শন ও ন্যায়দর্শন, যাহা যথার্থই মানবীয় বুদ্ধির চরমোৎকর্ষের পরিচায়ক বলিয়া সম্মানিত হয়, তাহা বৌদ্ধ দার্শনিক মতের সহিত হিন্দু দার্শনিক মতের সংঘর্ষের ফল। বৌদ্ধ দর্শনের অস্তিত্ব না থাকিলে হিন্দুদর্শনের এতাদৃশ উন্নতি সম্ভবপর হইত না। অন্য দিকে দেখা যায়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী মৈত্রী ও প্রেম, অহিংসা ও দয়া, মানুষে মানুষে সাম্যভাব, ধর্ম্মপালনে সকল জাতির সমান অধিকার প্রভৃতি বৌদ্ধ উদারনীতি স্বীকার করিয়া লইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মেরই ন্যায় আপামর সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকৃষ্ট অংশ বেদান্ত ও ন্যায়দর্শন এবং শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্মে রক্ষিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিকার-বহুল নিকৃষ্ট অংশও নষ্ট হয় নাই, তাহা বৈষ্ণব-দের সহজিয়া উপাসনায় এবং তান্ত্রিকদের উৎকট আচারে আজিও জীবিত রহিয়াছে। তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম ধ্বংস হইল কি করিয়া? এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা ছাড়া আমাদের পূর্ণ পরিচয়ই বা মিলিবে কি করিয়া?

আমাদের এই বাঙ্গালদেশ বৌদ্ধদের একটি প্রধান কর্ম্ম-ক্ষেত্র ছিল; সুদূর অতীতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ বুদ্ধোপাসকই ছিলেন। বাঙ্গালাভাষার আদি গান 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা', বাঙ্গালা-ভাষার আদি পুরাণ শূন্যপুরাণ। বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্যগুলির,

অনেক দেবতাই নাকি ছদ্মবেশী বৌদ্ধ দেবতা, বাঙ্গালাভাষায় মধ্যযুগে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ ছিল নাকি বৌদ্ধধর্ম্ম এবং ধর্ম্মপূজা ছিল নাকি বুদ্ধপূজা। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম না বুঝিলে বাঙ্গালার তথা ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় হইতে পারে না।

ভগবান্ বুদ্ধকে প্রণাম! যিনি শাক্যসিংহ, গৌতমচন্দ্রিমা, যিনি সিদ্ধার্থ, সুগত ও তথাগত, যিনি দশবল ও শাস্তা, যিনি জিন, অর্হৎ ও ভগবান, সেই বুদ্ধদেবের চরণে কোটি কোটি প্রণাম! অপূর্ব্ব অহেতুক বৈরাগ্য তাঁহার! স্নেহময় পিতা, মমতাময়ী মাতা, সুগঠিত রাজ্য, বিপুল ঐশ্বর্য্য, প্রেমপুত্তলী পত্নী, নবজাত পুত্র, নবীন বয়স এবং বলিষ্ঠ সুন্দর বপু—মানুষের যাহা কিছু কামনার ধন, সমস্তই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। কোনও অভাব তাঁহার ছিল না; কোন ব্যাধি, বিচ্ছেদ, শোক, দুঃখ বা বঞ্চনা তাঁহার জীবনকে পীড়িত করে নাই। রামচন্দ্রের ন্যায় কোন কঠিন সত্যরক্ষার প্রশ্ন তাঁহার ছিল না। ধূর্জ্জটির ন্যায় কালকূট পান করিবার আহ্বান তাঁহার আসে নাই। তথাপি সৃষ্টির অনাদি ব্যথাবোধ তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল, সর্ব্বমানবের পুঞ্জীভূত হাহাকার তাঁহার হৃদয়ে গভীর বৈরাগ্যের সঞ্চার করিল। ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু, অভাব, অজ্ঞান ও অবিদ্যার দুঃখ জগৎকে সতত ক্লিষ্ট করিতেছে। জীবের সুখ কোথায়? স্বস্তি কোথায়? শান্তি ও স্থিতি কোথায়? তিনি সৃষ্টির অনাদি দুঃখ মোচন করিবার জন্য অমৃতের সন্ধানে গৃহ হইতে বিনির্গত হইলেন। এই বৈরাগ্য স্বার্থশূন্য অহেতুক বৈরাগ্য। বিশ্ববাসী দুঃখমোচনকল্পে বুদ্ধের শরণ লইবে না তো কাহার শরণ লইবে?

কথিত আছে, রথারোহণে নগর পর্য্যটন করিবার সময়ে শাক্য-কুমার ব্যাধি-গ্রস্ত, জরা-গ্রস্ত এবং মৃত শরীর দেখিয়া চমকিত, ভীত

ও চঞ্চল হইয়া উঠেন; অন্য একদিন কাষায়বসন-পরিহিত, শান্ত প্রশান্ত-চিত্ত ভিক্ষু দেখিয়া তিনি জীবনে 'পথের সন্ধান পান। তারপর গভীর নিশীথে সুপ্ত পত্নী, পুত্র, পিতা ও প্রিয়জন এবং কপিলাবস্তু ত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ মহাভিনিষ্ক্রমণ করিলেন। অন্তরের সঙ্কল্প ছিল এই,—"জন্মমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে কপিলাবস্তুতে আর প্রবেশ করিব না।" তিনি তরবারির দ্বারা চাঁচর কেশগুচ্ছ কাটিয়া ফেলিলেন, রাজমুকুট এবং মণিমুক্তার আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ব্যাধের সহিত বস্ত্র বিনিময় করিয়া চীর ধারণ করিলেন। সিদ্ধার্থের তপস্যা আরম্ভ হইল। সম্রাট্ বিম্বিসার অর্দ্ধ মগধরাজ্য দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রামচন্দ্রের ন্যায় দ্বিতীয়বার রাজ্য উপেক্ষা করেন।

সিদ্ধার্থ তৎকালীন প্রসিদ্ধ আচার্য্য ঋষি আরাঢ় এবং উদ্রক-রামপুত্রের নিকট হইতে জ্ঞান, যোগ ও সমাধি অভ্যাস করিলেন; কিন্তু তাঁহার বাঞ্ছিত লক্ষ্য-সাধনে উহা পর্য্যাপ্ত মনে হইল না। তখন তিনি নির্জ্জনে নৈরঞ্জনানদী-তীরে উরুবেলা বনে কঠোর কৃচ্ছ্রাচরণ আরম্ভ করিলেন।

কঠোর কৃচ্ছ্রাচরণে "শূন্যে আলম্বিত বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায়" তাঁহার তপস্যার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল; কিন্তু তিনি ইষ্টলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি চাহেন দুর্লভ পরম জ্ঞান, যাহা সমস্ত মোহপাশ ছিন্ন করে; শক্তি বা সিদ্ধাই তাঁহার কাম্য ছিল না। ক্রমাগত ছয় বৎসর কঠোর চর্য্যায় ও অনশন ব্রত পালনে দেহ অস্থিচর্ম্মসার ও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তিনি যেন সংজ্ঞাহীন হইতে লাগিলেন, ধ্যান করিবার শক্তি তাঁহার লুপ্ত হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, উদার মধ্য পন্থাই তপঃসাধনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। উপযুক্ত

পানাহার দ্বারা দেহ ও মনকে সবল না রাখিলে ধ্যানের সহায়তায় সত্যলোকের সন্ধান সম্ভবপর নয়। এই সময়ে বণিগ্‌বধূ সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া তিনি অনশন ব্রত ত্যাগ করিলেন। অনুগামী শিষ্য পঞ্চজন তপোভ্রষ্ট মনে করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু সিদ্ধার্থের সিদ্ধি-লাভের ক্ষণ নিকটবর্ত্তী হইল।

বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনা-তীরে অশ্বত্থদ্রুম-মূলে যোগাসনে আসীন হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। অন্তরের স্থির সঙ্কল্প এই,—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প-দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

—এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হয়, হউক; ত্বক্, অস্থি ও মাংস ধ্বংস পায়, পাউক; বহুকল্প-দুর্লভ বোধিকে লাভ না করিয়া, এই আসন হইতে শরীর কদাচ বিচলিত হইবে না।

প্রহরের পর প্রহর অতীত হইতে লাগিল, বোধিসত্ত্বের ধ্যান গভীর হইতে গভীরতর, ক্রমে গভীরতম হইতে লাগিল। মাঝে অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনা, প্রসুপ্ত লালসানিচয় নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল,—চারিদিকে কাম-মোহ সূক্ষ্ম কমনীয় জাল বিস্তার করিয়া কুমারের মন বন্দী করিতে চাহিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভয় বিভীষিকা অট্টহাসি হাসিয়া উঠিয়াছে, কামলোকের অধিপতি মার সসৈন্যে আক্রমণ করিয়াছে; পৃথিবীতে তাহার শাসন বুঝি শিথিল হইয়া যায়, বোধিসত্ত্বকে বশ করিতেই হইবে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! নির্ব্বাণ-ভূয়িষ্ঠ প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইল। মার পরাভূত হইয়া সসৈন্যে পলায়ন করিল। বোধিসত্ত্বের অন্তরে শেষ অবিদ্যা ও

অজ্ঞানের সংস্কারও বিনষ্ট হইল। অন্ধকারের বক্ষ চিরিয়া জ্ঞানের অপরূপ জ্যোতি বিভাসিত হইল। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হইলেন, তিনি বলিতে পারিলেন,—

ভিন্না ময়া হ্যবিদ্যা দীপ্তেন জ্ঞানকঠিন-বজ্রেণ।

—জ্ঞানরূপ কঠিন বজ্রে আমি অবিদ্যার বক্ষ দীর্ণ করিয়াছি।

মৈত্রী-বলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।

—মৈত্রীবলে সকল জয় করিয়া আমি অমৃতরস পান করিয়াছি।

কথিত আছে, বোধিসত্ত্ব প্রথম প্রহরের ধ্যানে শত শত অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিলেন। তাঁহার অন্তরে সকল জীবের প্রতি করুণার সঞ্চার হইল। মধ্যরাত্রির ধ্যানে বোধিসত্ত্ব দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন, কর্ম্মফলে জীবগণের উত্থান ও পতন ও নানা দুঃখভোগ দেখিয়া তাঁহার অন্তর জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণায় পূর্ণ হইয়া গেল। রাত্রির শেষ প্রহরে গভীর সমাধিযোগে তিনি জন্মমৃত্যুর কারণ উপলব্ধি করিলেন এবং সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তির পথ আবিষ্কার করিলেন। তিনি দেখিলেন,—

ব্যাধি, জরা, দুঃখ ও মৃত্যুর কারণ জন্ম।

জন্মের কারণ ভব অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম।

ভবের কারণ উপাদান অর্থাৎ আসক্তি।

উপাদানের কারণ তৃষ্ণা।

তৃষ্ণার কারণ বেদনা অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অনুভব।

বেদনার কারণ স্পর্শ অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক।

স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন অর্থাৎ মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

আয়তনের কারণ নামরূপ অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও চারি ভূত বা দেহ।

নামরূপের কারণ বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান।

বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার।

সংস্কারের কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান।

কার্য্যকারণশৃঙ্খলাযুক্ত এই দ্বাদশাঙ্গ মতবাদের নাম প্রতীত্য-সমুৎপাদ। ইহাই সিদ্ধার্থের প্রধান আবিষ্কার। এই দার্শনিক তত্ত্বধারা আজিও পণ্ডিতগণের অপার বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

বোধিসত্ত্ব দেখিলেন অবিদ্যা ও অজ্ঞানই সকল দুঃখের মূলীভূত কারণ। অবিদ্যার উচ্ছেদ হইলে সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, যড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব এবং জন্মবন্ধন ছিন্ন হইবে। জন্মদুঃখের সহিত ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুদুঃখ এবং সর্ব্ববিধ দুঃখ সর্ব্বকালের তরে বিনষ্ট হইবে। অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে হইবে সংস্কার ক্ষয় করিয়া। এই পথ বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষে নূতন পথ নহে। বুদ্ধদেব নিজেই বলিয়াছেন, তিনি প্রাচীন পরিত্যক্ত পথকেই আবিষ্কার করিয়া নূতন করিয়া লইয়াছেন।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৬০ অব্দে কিংবা তাহার নিকটবর্ত্তী কালে কপিলাবস্তুর নিকটবর্ত্তী লুম্বিনী বনে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদন, মাতা দেবী মহামায়া, মহাপ্রজ্ঞাবতী গোতমীদ্বারা তিনি পালিত হ'ন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই রূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব বিরল। শাক্যকুমার ২৯ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন; ছয় বৎসর কঠিন সাধনার পর ৩৫ বৎসর বয়সে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সেই অশ্বত্থদ্রুম পরবর্ত্তী কালে বোধিদ্রুম নামে প্রসিদ্ধ হয়, সেই উরুবেলা বন মহাতীর্থ বুদ্ধগয়া নামে পূজিত ও প্রসিদ্ধ হয়, সেই নৈরঞ্জনা নদী এখন ফল্গুনদী নামে পরিচিত। বুদ্ধত্বলাভের পরে বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথক্ষেত্রে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করেন। ৪৫ বৎসর কাল ধর্ম্মপ্রচার-দ্বারা ভারতবর্ষে

বৌদ্ধমত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আশীবৎসর বয়সে ভগবান্ বুদ্ধ সমাধিযোগে পরি নির্ব্বাণ লাভ করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁহার জন্ম, বোধি-লাভ ও নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় তাঁহার গৃহত্যাগ এবং ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন। আশ্চর্য্য মহাকাব্য ভগবান্ বুদ্ধের এই জীবনী। বুদ্ধচরিত, ললিতবিস্তর, Light of Asia এবং অমিতাভ কাব্য এই মহাপুরুষের চরিত অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। ইঁহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী অসংখ্য জাতক-কথায় বিবৃত হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভের পর সিদ্ধার্থের চিত্ত অমৃতরসপানে পরিতৃপ্ত হইল। তাঁহার অন্তরে বিশ্বজনের প্রতি মৈত্রী ও করুণা উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, বিশ্ববাসীকে তিনি দুঃখ হইতে মুক্ত করিবেন। বুদ্ধচিত্ত তখন মৈত্রী-ভাবনায় ভরপূর,—

"সকল পুরুষ, সকল নারী, সকল আর্য্য, সকল অনার্য্য, সকল দেবতা, সকল মনুষ্য, সকল অমনুষ্য, সকল প্রেতপিশাচ, নরকের সকল জীব শত্রুহীন হউক, বিপদহীন হউক, রোগহীন হউক এবং সুখী হউক।"

বুদ্ধদেব তাঁহার পূর্ব্বতন পঞ্চশিষ্যকে সারনাথ নামক স্থানে ঋষিপত্তনে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং সিদ্ধিলাভের ঠিক দুইমাস পরে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। বর্ষমধ্যে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা ৬০ হইল। ধর্ম্মনীতি, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, অহিংসা, করুণা, মৈত্রী এবং নির্ব্বাণ-মুক্তির অমৃতবর্ষণে শিষ্যসংখ্যা ক্রমে ৬০ শত, ৬০ সহস্র, ৬০ লক্ষ এবং পরবর্ত্তী কালে সমগ্র এসিয়াখণ্ড ব্যাপিয়া ৬০ কোটি হইল। ভগবান্ বুদ্ধ স্বয়ং অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, ভজ্জি ও

মল্লদেশে তাঁহার সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি পণ্ডিত-গণের বোধ্য সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া জনগণের স্বকীয় ভাষা—তাহাদের মাতৃভাষায় জনগণের উপযোগী করিয়া সহজ সরল ভাবে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিকটে বর্ণ-ভেদ, জাতি-ভেদ, উচ্চ-নীচ-ভেদ, ধনি-নির্ধন-ভেদ, স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ কোনও ভেদ রহিল না। তিনি সকলকেই নির্ব্বিশেষে মৈত্রী ও করুণাদ্বারা আকৃষ্ট করিয়া পরম উপদেশামৃত দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আসন হইল জনগণেরই মধ্যে গ্রামে, বেণুবনে, পর্ব্বতপ্রান্তে, নদীতীরে। তাঁহার নিকটে সকলেরই অবারিত প্রবেশ।

পূর্ব্বভারতব্যাপী জনগণের মধ্যে এক বিপুল শক্তি-তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। সে তরঙ্গের জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া গেল কালক্রমাগত পুঞ্জ পুঞ্জ কুসংস্কার, প্রাণহীন অর্থহীন মিথ্যা আচার ও ক্রিয়াকাণ্ড, ভাসিয়া গেল জনগণের ভয় ভাবনা, চিত্তের দীনতা, ক্লীবতা ও সঙ্কীর্ণতা। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের পূর্ণ অধিকার পাইয়া সকলেই নিজেকে মহিমান্বিত মনে করিতে লাগিল; আশা ও উৎসাহের বলে সকলেরই পূর্ণশক্তির প্রকাশ হইতে লাগিল। ইহাই বিপ্লব। এই বিপ্লব ব্রাহ্মণদের বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণদের জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণ-শাসিত তৎকালীন বিকৃত বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষের প্রথম ও প্রধান বিপ্লবী ভগবান্ বুদ্ধদেব। বুদ্ধের উদার আহ্বানে ভারতবর্ষে প্রথম জন-জাগরণ ও গণশক্তির উদ্বোধন। মগধ-সম্রাট্ বিম্বিসার, তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু, কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ, উজ্জয়িনীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোৎ, শাক্যরাজগণ এবং বিম্বিসারের মহিষী ক্ষেমা, শ্রাবস্তী নগরের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া উৎপলবর্ণা, শাক্যরাজবংশ-সম্ভূতা সুন্দরী নন্দা ও মহাপ্রজাবতী গৌতমী বুদ্ধের

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সদ্ব্রাহ্মণ সারিপুত্র, মুদ্গলায়ন, বৎস্যগোত্র, মহাকাত্যায়ন এবং মহাকাশ্যপের সহিত, অথবা ক্ষত্রিয় আনন্দ ও দেবদত্তের সহিত নাপিত উপালি, ক্রীতদাস দাসক ও ছন্ন, কুম্ভকার ধনিয়, দস্যু অঙ্গুলিমাল, নীচ বংশীয় সুপ্রিয় বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য-বর্গের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। বৈশালীর সুপ্রসিদ্ধ বারবনিতা অম্বাপালী ও তাহার পুত্র, রাজগৃহের সুন্দরী বারবনিতা সিরিমা, বারাণসীর বেশ্যা কাসিকা ও তাহার উপপতি পূর্ণও বুদ্ধদেবের করুণা লাভে বঞ্চিত হয় নাই। এই বিপুল জাগরণের ফলে ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-বিদ্যা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। অজন্তা বা এলোরার গুহায়, করালী চৈত্যে, বুদ্ধগয়ার মন্দিরে, সাঁচি বা সারনাথের স্তূপে, প্রয়াগের স্তম্ভে এই শিল্পোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হইয়া বৌদ্ধজ্ঞান এবং পার্থিব ও অপার্থিব যাবতীয় বিদ্যা অনুশীলন ও ধারণ করিতে লাগিল। তক্ষশিলা,—নালন্দা, বিক্রমশিলা বিদ্যায়তনের নাম না শুনিয়াছে কে? নালন্দা, বিক্রমশিলা ও ওদন্তপুরীর সুবৃহৎ গ্রন্থালয় হইতেই তিব্বতীয়গণ মূল্যবান্ হস্তলিপিগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে রাজতন্ত্র ভাঙ্গিয়া গিয়া রাষ্ট্রশাসনে সন্থাগারের ন্যায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধ বিহারগুলিও গণতন্ত্রতার নীতিতে মত-বহুলতা দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বুদ্ধের বাণী প্রচার করিতে হিমালয়ের চিরতুহিনাবৃত অভ্রংলিহ গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশে, সাগরতুল্য সুবিশাল গোবির মরুভূমি পার হইয়া মহাচীন, মোঙ্গলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে উপস্থিত হইলেন। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন, পঞ্চ বৌদ্ধ ভিক্ষু

রুশ দেশের উত্তর সীমানা দিয়া প্রশান্ত মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আমেরিকায় এবং পরে মেক্সিকো পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। দক্ষিণে অর্ণবপোত আশ্রয় করিয়া উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুল ভারত-মহাজলধির বক্ষ দলিয়া ভিক্ষুদল সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশে পদার্পণ করেন। যীশুর জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বেও সম্রাট্ অশোক পশ্চিমে সিরিয়া ও মিশর দেশ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণ ভগবান্ বুদ্ধের মৈত্রী, প্রেম ও করুণার বাণী লইয়া যে দেশের ভূমি স্পর্শ করিয়াছেন, সে দেশেই সাদরে সম্মানিত ও পূজিত হইয়াছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দীর সাধনায় ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্ম সমগ্র ভারতবর্ষ ও তৎকালপরিচিত পৃথিবীতে উদার সার্ব্বভৌমরূপ লাভ করে। এই ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সম্রাট্ অশোক অহিংসা ও মৈত্রীর বলে যে ভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিয়া গিয়াছেন, বিদেশে দূত এবং স্বদেশে ধর্ম্মমহামাত্র নিয়োগ করিয়া যে ভাবে মঙ্গলময় ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন শাসকশক্তির আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে। এই মহাধর্ম্মের প্রেম, মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষ ও এশিয়ার কত অসভ্য বর্ব্বর জাতি নূতন প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়া মহত্তর জীবনের পথে যাত্রা করে। অনেক নিম্নবর্ণের লোকও শিক্ষা ও ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হইয়া উচ্চবর্ণের লোকের ন্যায় পান্থশালা স্থাপন, জলাশয় খনন, রাজপথ নির্ম্মাণ, পথপার্শ্বে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, এমন কি ধর্ম্মপ্রচাররূপ মহৎ কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী প্রেম কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া আশ্রয় দান করিয়াছিল পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গকেও। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে আরম্ভ-অবস্থায় খ্রীষ্টধর্ম্মও অনেকাংশে

পুষ্টি লাভ করিয়াছিল,—এই মত অনেক পণ্ডিত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেছেন।

বুদ্ধ-প্রচারিত এই মহান্ ধর্ম্মের স্বরূপ কি? ইহার মর্ম্মবাণীই বা কি? বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে হইলে চারিটি আর্য্য সত্য, আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। চারিটি আর্য্য সত্য হইতেছে,—(১) দুঃখ, (২) দুঃখের উৎপত্তি, (৩) দুঃখের নিরোধ এবং (৪) যে পথ অবলম্বনে দুঃখের নিরোধ হয়, তাহা। ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, জন্ম, শোক, বিচ্ছেদ, জীবনের সহস্র অভাব ও অপূর্ণতা, বিপদ ও ব্যর্থতা সকলই দুঃখের অন্তর্ভুক্ত। এই দুঃখের নিরোধ হইবে যে পথ বা মার্গ অবলম্বন করিয়া তাহাই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে প্রসিদ্ধ। এই অষ্টাঙ্গ হইতেছে,—(১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সঙ্কল্প, (৩) সম্যক্ বাক্য, (৪) সম্যক্ কর্ম্ম, (৫) সম্যক্ জীবিকা, (৬) সম্যক্ চেষ্টা, (৭) সম্যক্ স্মৃতি ও (৮) সম্যক্ সমাধি। ইহাদের প্রথম ছয়টি দ্বারা সম্যক্ স্মৃতি এবং তাহাদ্বারা সম্যক্ সমাধি বা একাগ্র ধ্যানের সহায়তা হয়। বিচার ও ধ্যানের সাহায্যেই প্রতীত্যসমুৎপাদের কার্য্যকারণ-পরম্পরার দ্বাদশ শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলিয়া মনকে নির্ব্বাণ অর্থাৎ পরম শান্তি বা শূন্যতার অধিকারী করা যায়। এই নির্ব্বাণই বৌদ্ধগণের চরম লক্ষ্য। নির্ব্বাণ এক পরম রহস্য, স্বয়ং বুদ্ধদেবও স্পষ্ট করিয়া ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। নির্ব্বাণ মানুষের সর্ব্বদুঃখ-বিমুক্তি, পরম শান্তি, পার্থিব সত্তার বিনাশ এবং অহংবোধের বিলোপ অর্থাৎ শূন্যতাপ্রাপ্তি; নির্ব্বাণ পরম সুখ,—"নিব্বানং পরমং সুখং"—ধম্মপদ। বৌদ্ধগণ শীলকে সমস্ত সদ্‌গুণের মূল বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং নানাভাবে তাহা অভ্যাস করিতেন। তাঁহাদের প্রসিদ্ধ দশশীল হইতেছে,—

(১) জীবহিংসা করিবে না। (২) পরদ্রব্য হরণ করিবে না।
(৩) ব্যভিচারদোষ করিবে না। (৪) মিথ্যা বাক্য বলিবে না।
(৫) মদ্যপান করিবে না। (৬) অকালভোজন করিবে না।
(৭) নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি দেখিবে না বা শুনিবে না।
(৮) মাল্য, গন্ধ, বিলোপন প্রভৃতি ব্যবহার করিবে না।
(৯) উচ্চ শয়ন এবং মহাশয়ন ব্যবহার করিবে না।
(১০) রৌপ্য এবং সুবর্ণ গ্রহণ করিবে না।

ইহাদের প্রথম পাঁচটি শীল গৃহস্থসাধারণের পালনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শীল অর্থ সদাচার। শীল পালনের জন্য এবং নির্ব্বাণ লাভের জন্য বলের আবশ্যক। বৌদ্ধদের প্রসিদ্ধ পঞ্চ বল হইতেছে,—

(১) শ্রদ্ধা, (২) সমাধি, (৩) বীর্য্য, (৪) স্মৃতি, (৫) প্রজ্ঞা। বুদ্ধ-কথিত বৌদ্ধধর্ম্মবীজ হইতেছে,—

সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উগাসম্পদা।
সচিত্ত পরিয়োদপণং এতং বুদ্ধানুসাসনং॥

—সকল পাপের অকরণ, কুশলের উপার্জ্জন, চিত্তের সম্যক্ শোধন, —ইহাই বুদ্ধানুশাসন।

বুদ্ধবচনের কি অবধি আছে? সমুদয় বুদ্ধবচন সংগৃহীত হইয়া ত্রিপিটক বা তিন পেটারা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রথম পিটক বিনয় পিটক, ইহাতে সঙ্ঘের নিয়মাবলী এবং শীল-বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পিটক সূত্র পিটক, ইহাতে বুদ্ধের উপদেশ এবং ব্যবহার-বিষয়ক ও ধ্যানসমাধি-বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পিটক অভিধর্ম্ম পিটক, ইহাতে প্রধানতঃ দর্শনভাগ অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও পরমার্থ-বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পিটকে

পাঁচখানি করিয়া ত্রিপিটকে মোট ১৫ খানি গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট আছে। ইহাদের মধ্যে সূত্র-পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক-নিকায় গ্রন্থে আবার ১৫ খানি গ্রন্থ আছে; এই ১৫ খানি গ্রন্থের দ্বিতীয় গ্রন্থ হইতেছে সুপ্রসিদ্ধ ধম্মপদ গ্রন্থ। ধম্মপদ গ্রন্থখানি ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক পদাবলী, ইহার একটি পদ নিম্নে দেওয়া হইল,—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলিকবাদিনম্॥

—অক্রোধদ্বারা ক্রোধ জয় করিবে, সাধুতাদ্বারা অসাধুতা জয় করিবে, দানদ্বারা কদর্য্য কৃপণকে জয় করিবে এবং সত্যদ্বারা অসত্য-বাদীকে জয় করিবে।

এই জাতীয় ধর্ম্মপ্রবচন ও নীতিবচন হিন্দুদের গীতা, মহাভারত এবং অন্যান্য নীতিশাস্ত্রেও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

এতক্ষণ যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ নাই, জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মের প্রসঙ্গ নাই; ইহাতে উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্মবাদ অল্প। বৌদ্ধধর্ম্ম উপনিষদের ন্যায় জ্ঞানপ্রধান অথবা পুরাণের ন্যায় ভক্তিপ্রধান ধর্ম্ম নহে, ইহা নীতিমূলক এবং নীতিপ্রধান। দুঃখবাদকে ইহা প্রধান করিয়া, দুঃখের নিবৃত্তিকে ইহার লক্ষ্য করিয়াছে। উপনিষদের ন্যায় ইহা নেতি নেতি করিয়া প্রপঞ্চের অন্তরালে এক শাশ্বত, আনন্দঘন, চিন্ময় সত্তায় হয়তো পৌঁছায় নাই; ইহা প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছে নিত্য পরিবর্ত্তন-শীলতাকে, ক্ষণিকসত্তাকে এবং মহাশূন্যতাকে। বুদ্ধদেব তৎকালীন অর্থহীন কঠোর কৃচ্ছ্রাচরণের পরিবর্ত্তে শোভন মধ্যপন্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জটিল যজ্ঞানুষ্ঠানের স্থলে শীল ও নীতিজ্ঞানকে গ্রহণ

করিয়াছেন ; তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষাও নীতিশিক্ষাকে অনেক সময়ে উচ্চতর আসন দিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের দুইটি প্রধান শাখা হীনযান ও মহাযান নামে পরিচিত। হীনযানে বৌদ্ধমত অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় আছে ; ইহা সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে প্রচলিত। এই মতে একমাত্র সাধকের নিজের মোক্ষ বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য। মহাযান-মতে নিখিল জীবের মোক্ষ বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তিই প্রত্যেক জীবের উদ্দেশ্য। এই জন্য বোধিসত্ত্ব এবং বুদ্ধগণও দেহাবসানে জীব-কল্যাণের জন্য অনন্তকাল কর্ম্ম করিয়া থাকেন। হীন অর্থ ছোট, স্বার্থপর, যাহা নিজের লইয়া ব্যস্ত ; মহান্ অর্থ বড়, নিঃস্বার্থ, যাহা বহুর কথা ভাবে। মহাযান-মত নেপাল, তিব্বত, চীন ও জাপান দেশে আদৃত। এই মহাযান-মতেই মূর্ত্তিপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া বহু নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়। বাস্তবিক পক্ষে মহাযান-মতের ভিতর দিয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছে, নির্ব্বাণের শান্ত আদর্শ নির্গুণ-ব্রহ্ম ধারণায় এবং বুদ্ধপূজা শিবপূজায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণের ত্যাগ, তপস্যা এবং লোকহিত ও লোকসেবা-ব্রতও পরবর্ত্তী হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

গৌতমবুদ্ধের জীবনী আলোচনা-প্রসঙ্গে আর একজন ভারতীয় মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। তিনি হইতেছেন জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাবীর স্বামী। গৌতমবুদ্ধের ন্যায় তিনিও ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের যাগযজ্ঞ ও পশুবধের প্রতিবাদে এবং জ্ঞান ও নীতিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় ক্ষত্রিয়গণই অগ্রণী ছিলেন। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের গুরু রাজা প্রবাহণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ; মহাভারতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

বর্ক্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় কথিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত মহাবীর স্বামী এবং গৌতমবুদ্ধ তৎকালীন ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া যথাক্রমে জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান। মহাবীর খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৯৯ অব্দে বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে বনবাসী হইয়া ঋজুকুলা নদীর তীরে জৃম্ভিকা গ্রামের সন্নিহিত এক শালবৃক্ষ-মূলে দ্বাদশবর্ষকাল তপস্যা করিয়া তিনি পরম জ্ঞান লাভ করেন। এই দিন হইতে তিনি জিন নামে খ্যাত হন এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম কালে জৈনধর্ম্ম আখ্যা লাভ করে। যিনি তপস্যা করিয়া কামাদি রিপু এবং অবিদ্যা জয় করিয়াছেন, তিনিই জিন। জিন বুদ্ধ শব্দেরই ন্যায় একটি উপাধি মাত্র; জিন অর্থ জয়ী, জয়শীল; বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত, জ্ঞানী। বুদ্ধদেবও জিন নামে উক্ত হইয়া থাকেন। পরবর্ত্তী জৈন আচার্য্যগণও জিন উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। জৈনধর্ম্মে চব্বিশ জন জিন তীর্থঙ্করের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুইটি সম্প্রদায় আছে। জৈনদের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ৪৫ খানি। জিনদেব মহাবীর ৭২ বৎসর বয়সে মোক্ষ লাভ করেন।

মহাবীর ও বুদ্ধদেব সমসাময়িক, মহাবীর বয়োজ্যেষ্ঠ। উভয়েই এক সময়ে কোশল, মগধ ও বিদেহে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটে নাই। জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। উভয় ধর্ম্মেই ঈশ্বর অস্বীকৃত হইয়াছে, উভয় ধর্ম্মেরই মূল কথা অহিংসা ও চিত্তশুদ্ধি। অবশ্য জৈনগণ অহিংসা-ধর্ম্মের সর্ব্বাধিক প্রাধান্য স্বীকার করেন। অহিংসাধর্ম্ম ভারতবর্ষে নূতন নহে। বেদের আদেশ,—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি।—কোন জীবকে হিংসা বা বধ করিবে না।" কিন্তু ইহারই সঙ্গে আবার বেদে বিধান দেওয়া হইয়াছে,—"সর্ব্বমেধে সর্ব্বং হন্যাৎ।—সর্ব্বমেধ-যজ্ঞে

সর্ব্বপ্রকার পশু বধ করিবে।” এই উভয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? ভারতবর্ষে বৌদ্ধগণ এবং বিশেষভাবে জৈনগণ সমাজের মানুষ, বনের পশু, আকাশের পক্ষী, জলের মৎস্য, এমন কি অদৃশ্য কীটকে পর্য্যন্ত অভয় দিয়া অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা বৈদিক যাগযজ্ঞে অজস্র পশুবধ এবং অতি নিষ্ঠুর উপায়ে পশু-বধেরই প্রতিক্রিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। জৈনগণের কতকগুলি আচার হিন্দুধর্ম্মের অনুযায়ী, তাঁহারা জন্ম-মরণ অশৌচ পালন করিয়া থাকেন, জিন-প্রতিমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। জৈনগণ ভারতবর্ষে কখন প্রবল হ'ন নাই এবং ভারতের বহির্ভাগেও ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। ক্ষুদ্র স্বল্পসংখ্যক জৈনমণ্ডলী হিন্দুধর্ম্মের সহিত অবিরোধে আজিও পশ্চিম ভারতে টি'কিয়া আছে।

তথাগতের বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইল কি করিয়া?

ভগবান্ বুদ্ধ যখন আনন্দের একান্ত অনুরোধে ভিক্ষুসঙ্ঘের আদর্শে মহাপ্রজাবতী গোতমীকে অগ্রণী করিয়া ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ গঠন করেন, তখনই বলিয়াছিলেন, তাঁহার এ ধর্ম্ম যতদিন বাঁচিবার কথা, তাহা অপেক্ষা অন্ততঃ সহস্র বৎসর অল্প বাঁচিবে। বুদ্ধদেব জানিতেন, যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে, বিনাশের পূর্ব্বে তাহাতে বার্দ্ধক্যের বিকার ও জরার লক্ষণও প্রকাশ পাইবে। ব্যক্তিবিশেষ-দ্বারা যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত, তাহার আশু নশ্বরতাই স্বাভাবিক। ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম বহু মত, বহু পথ, বহু সাধনার সমষ্টিকরণে বহু আচার্য্য দ্বারা পুষ্ট হইয়া, মূল সত্যকে অবিকৃত রাখিয়া, কখন কখন বাহ্যতঃ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াও চলিয়াছে। এ ধর্ম্ম বিপদের সময়ে সহ্য করে, সমন্বয় করে, অপরের শ্রেষ্ঠগুণ থাকিলে, তাহা আত্মসাৎ করে; কিন্তু কখনও

ভাঙ্গিয়া পড়েনা। যে ধর্ম্মের সর্ব্বক্ষর শক্তি নাই, যে ধর্ম্মে যুগে যুগে মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া কালোপযোগী উপলব্ধি দ্বারা সত্যকে প্রচার করিতে পারেন না, সে ধর্ম্ম কি চিরায়ু বা স্থিরায়ু হইতে পারে?

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রথম একটি সম্প্রদায় হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহা ছিল মুখ্যতঃ সংসার-বিরাগী ভিক্ষু ও ভিক্ষুদের ধর্ম্ম, বিহার ও সঙ্ঘারাম-বাসীদের ধর্ম্ম। সঙ্ঘের বাহিরে বিশাল গৃহস্থ-সমাজে ইহা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-ব্যবস্থা প্রণয়ন করে নাই। গৃহস্থ-সমাজে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আচার বরাবরই শিথিলভাবে চলিতেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরবময় যুগেও হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল না, তাহা দুর্ব্বল হইয়াছিল মাত্র। ব্রাহ্মণগণ অনেকেই বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞ করিতেন। হিন্দুধর্ম্ম যখন নিজেকে সুগঠিত ও সুসংস্কৃত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিল, তখন তাহাকে বাধা দিবার শক্তি এ ধর্ম্মের আর ছিল না।

এই ধর্ম্মের শেষ আচার্য্যগণই যে কেবল দুর্ব্বল ছিলেন, তাহা নহে; কতকগুলি কারণে ইহা জনসমাজেরও বিশেষ অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম্মকে সহজ করিতে গিয়া মহাযানের অন্তর্গত সহজযান যে মত প্রচার করিতে লাগিল, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত প্রবল হইয়া উঠিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সমাজ ইহার পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়াসক্ত ও বিলাসী হইয়া উঠিতেছিল। বিকৃত বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায় বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মেও কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণই ধর্ম্মের প্রধান অনুষ্ঠান হইয়া উঠিল। বুদ্ধের তিরোভাবের অর্দ্ধ সহস্র বৎসর পরেই একদল ভিক্ষু বিবাহ করিয়া গৃহস্থভিক্ষু হইতে লাগিল; তাহাদের পুত্রগণও সহজেই ভিক্ষু বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল। প্রকৃত ভিক্ষুদের দুঃখের দিন উপস্থিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মে দেবতার সংশ্রব ছিল না; কিন্তু

বুদ্ধের নির্ব্বাণ-লাভের পাঁচ শত বৎসরের মধ্যেই নানা বুদ্ধমূর্ত্তি, ক্রমে তাহাদের শক্তিমূর্ত্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার আশ্রয়ে ডাকিনী, যোগিনী, প্রেতিনী, ভৈরব, পিশাচ প্রভৃতির উপাসনা চলিতে লাগিল ; এবং মৎস্য, মাংস ও মদিরার সহযোগে জঘন্য আচারই ধর্ম্মের নামে প্রবল হইয়া উঠিল। নির্ব্বাণ-স্থলে কাম্য হইয়া উঠিল ইহলোকে ইন্দ্রিয়-সুখ, ঐশ্বর্য্য ও সিদ্ধাই, এবং পরলোকে স্বর্গ। আধ্যাত্মিকভাব নাই। ঈশ্বর নাই, ঈশ্বরে ভক্তি ও ঈশ্বর-জ্ঞান আসিবে কোথা হইতে ? ধর্ম্মের কঠোরতা প্রতিক্রিয়া-বশে বিলাসভোগের পেলবতা নহে, বীভৎসতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। নীতিধর্ম্মের প্রাচীর শিথিল হইয়া গিয়াছে, শীল-সদাচারের পাষাণভিত্তি টলিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় বজ্রবলে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রাসাদে আঘাত হানিলেন ভট্টপাদ কুমারিল ও ভগবান্ শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর। সহস্রাধিক বৎসরের জীর্ণ বিপুল প্রাসাদ স্তম্ভ ও ভিত্তিগাত্র লইয়া ধ্বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বেদ ও বেদান্তের জয়-ডিণ্ডিম ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বেদান্ত দর্শন

বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধমত নিরসন-কল্পে যত বড় প্রতিভার আবশ্যকতা ছিল, তত বড় প্রতিভার অধিকারীই ছিলেন আচার্য্য শঙ্কর। ত্যাগে ও তপস্যায়, জ্ঞানের মহিমায় ও যোগৈশ্বর্য্যে, ধী-শক্তিতে ও তর্ক-নৈপুণ্যে, মানব-প্রেমে ও দার্শনিক প্রজ্ঞায়, সংগঠনশক্তিতে ও কর্ম্মিষ্ঠতায় আচার্য্য শঙ্কর বুদ্ধদেব অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। বুদ্ধদেবকে যদি বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়া থাকে, শঙ্করকে বলা হইয়াছে সাক্ষাৎ শঙ্কর।

ভারতবর্ষে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে যুগে যুগে এমনই ঘটিয়া থাকে। দুষ্কৃতের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ঘর্ষিত কাষ্ঠ-খণ্ড হইতে অগ্নির ন্যায় পীড়িত ভারতবর্ষের অন্তর হইতে এক মহাভাস্বর জ্যোতির আবির্ভাব হয়। সেই জ্যোতিই ভারতবর্ষের শুদ্ধ আত্মা। প্রতিজনের সংবেদনশীল মন হইতে শক্তি আহরণ করিয়া যুগপুরুষগণ ভারতবর্ষকে নব ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। বিকৃত বৈদিকধর্ম্মের যুগে এমনি করিয়া পূর্ব্বভারতে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে, যাগযজ্ঞ ও অজস্র নিষ্ঠুর বলি এবং নীতিহীনতা ও ভোগলোলুপতার অবসান হয়। বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের যুগেও তেমনি করিয়া শঙ্করের আবির্ভাব ঘটে, তান্ত্রিক অভিচার ও ব্যভিচার, অসংযম ও বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও নাস্তিক নিরীশ্বর বুদ্ধির অবসান হয়। কিন্তু বৈদিক যুগের আর পুনরাবির্ভাব হয় নাই। প্রত্যেকটি প্লাবন যেমন পলিমাটি ফেলিয়া ভূমিকে উন্নত ও উর্ব্বর করিয়া যায়, প্রত্যেকটি ধর্ম্মবিপ্লবও তেমনি ভারতীয় ধর্ম্মকে বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন করিয়া গিয়াছে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য, যাগযজ্ঞ

ও পশুবধের ব্যাপক অভিনয় আর ভারতবর্ষে হয় নাই, অহিংসাধর্ম্মের মাহাত্ম্য আর অস্বীকৃত হয় নাই। এবার যে নবীন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল, তাহার প্রধান প্রতিষ্ঠা-ভূমি হইল বেদের কর্ম্মকাণ্ড তত নয়, যত বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষৎ। এই নূতন ধর্ম্ম বিধৃত হইয়াছে প্রধানতঃ যুক্তি ও বিচার-পুষ্ট সুদৃঢ় প্রজ্ঞাদ্বারা। ইহারই আশ্রয়ে বৌদ্ধযুগের নীতি-জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-ভক্তি ভারতীয় ধর্ম্মে এক রূপান্তর ঘটাইল। একদিকে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, অন্যদিকে ভারতীয় পুরাণগ্রন্থ নবীন বল লাভ করিয়া এই ধর্ম্মকে পণ্ডিত ও অপণ্ডিত, পুরুষ ও নারী এবং উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ সকল সমাজে অবিরাম প্রচার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। এই সাধনায় ভারতের অনেক শতাব্দী লাগিয়াছিল। পুরাণ-শাস্ত্রের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, দর্শন-শাস্ত্রের কথা অতি সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত হইবে। দর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দর্শন বেদান্ত দর্শন, এবং তাহার শ্রেষ্ঠ আচার্য্য জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

বটতরুর তলে এক বিচিত্র দৃশ্য! বৃদ্ধ শিষ্যগণ, সম্মুখে যুবা গুরু। শান্ত গুরু শাস্ত্রের মৌন ব্যাখ্যান করিতেছেন, শিষ্যগণের সকল সংশয় ছিন্ন হইতেছে। এই যুবা গুরুই আচার্য্য শঙ্কর। ইনিই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় দার্শনিক, অদ্বৈতবাদের মহান্ প্রচারক, বেদান্তসূত্রের বিখ্যাত ভাষ্যকার, নবীন হিন্দুধর্ম্মের সংস্থাপক এবং সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের সংগঠক; ইনিই বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধধর্ম্মকে শেষ আঘাত করেন।

শঙ্কর দক্ষিণভারতের মালাবার-প্রদেশস্থ কালাডি নামক গ্রামে নম্বুরি ব্রাহ্মণকুলে সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতার নাম ভদ্রাদেবী। পঞ্চম বর্ষে বালকের উপনয়ন এবং অষ্টমবর্ষে বিদ্যা-শিক্ষা সমাপ্ত হয়। আবাল্য

উদাসীন শঙ্কর মাতাকে বুঝাইয়া তখন গৃহত্যাগ করেন এবং নর্ম্মদা-তীরে সিদ্ধ যোগী গোবিন্দপাদের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন। গোবিন্দপাদের গুরু ছিলেন গৌড়পাদ, তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন, অদ্বৈতবাদের একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য যোগ ও জ্ঞান-সাধনায় নির্ব্বিকল্প সমাধিবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মের অপরোক্ষ উপলব্ধি লাভ করেন। তারপর এগারখানি উপনিষৎ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও বেদান্তসূত্রের সুগম্ভীর ভাষ্য রচনা করিয়া নিজের অনুভূত অপূর্ব্ব অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করেন। এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যখন তিনি ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হ'ন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর; তিনি আশীষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, নবীন যুবা। তারপর সুদূর দ্বারকা হইতে কামাখ্যাপীঠ পর্য্যন্ত এবং কন্যাকুমারিকা ও পুরীধাম হইতে বদরিকানাথ ও কাশ্মীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ পদব্রজে পর্য্যটন করিয়া বৌদ্ধমত নিরসন-পূর্ব্বক হিন্দু-সমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের পুনর্গঠন এবং ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ ও সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ সংস্থাপন করিয়া যখন তিনি জীবনব্রত সমাপ্ত করিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র; তখনও তিনি যুবা। সেই যৌবনেই তিনি পরম সমাধিযোগে পরম ব্রহ্মে লীন হইয়া গেলেন। তাই জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য চিরদিনই যুবা গুরু। ভারতবর্ষে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য এক সঙ্কটসন্ধিক্ষণে এই আশ্চর্য্য জ্যোতির প্রকাশ হইয়াছিল, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেই সে জ্যোতি পরমাত্মায় মিলাইয়া গেল।

কথিত আছে, আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত ভাষ্য রচনা করিয়া তাঁহার বিমল মত প্রচারের পূর্ব্বে ভট্টপাদ কুমারিলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুমারিল শঙ্করের সমসাময়িক হইলেও অনেক

বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডন করিয়া বেদের অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাঁহার সম্বন্ধেও প্রচলিত কাহিনী এই, তিনি বিতর্ক-সভায় প্রথমে বৌদ্ধগণ দ্বারা পরাভূত হইয়া, বৌদ্ধ সিদ্ধান্তসমূহ ভালরূপে জানিবার জন্য বৌদ্ধ-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। একদিন বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক বেদনিন্দা-কালে কুমারিলের নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু বিগলিত হয়, এবং অহিংসাবাদী বৌদ্ধগণ তাঁহাকে কপটী জানিয়া প্রাসাদ-শীর্ষ হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। কুমারিল নাকি তখন বলিয়াছিলেন, "বেদ যদি সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই পতনে আমার মৃত্যু হইবে না।" তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু 'বেদ যদি সত্য হয়' কথা দ্বারা বেদের সত্যতা-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ রাখায়, তাঁহার একটি চক্ষু কাণা হইয়া যায়। যাহা হউক্, অতঃপর তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতগণকে পরাভব এবং সেই কর্ম্মকাণ্ড-বহুল বুদ্ধ-পূর্ব্ব বৈদিকযুগকে পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টা করেন। এই মতের দর্শনের নাম পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন, জৈমিনি মুনি এই দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা। বেদের পূর্ব্বভাগ হইতেছে মন্ত্রাত্মক সংহিতা ও ব্যাখ্যাত্মক ব্রাহ্মণ। এই পূর্ব্বভাগকে অবলম্বন করিয়া যে মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহাই পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন। অতএব ইহাতে বেদোক্ত বিধি, নিষেধ ও যজ্ঞ-প্রণালীর বিচারই মুখ্য; বেদের পূর্ব্বভাগে বর্ণিত বিধি ও নিষেধ পালন এবং বৈদিক মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানই এই মতানুসারে ধর্ম্ম। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় এই ধর্ম্ম, ব্রহ্ম নয়। তাই এই দর্শনশাস্ত্রের প্রথম সূত্র—"অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।" ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা পাওয়া যাইবে উত্তরমীমাংসা দর্শনে, যাহার ভিত্তি বেদের উত্তরভাগ অর্থাৎ আরণ্যক ও উপনিষৎ।

ভট্টপাদ কুমারিল পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক ও টুপ্‌টীকা প্রণয়ন করিয়া ভারতবর্ষে পুনরায় কর্ম্মকাণ্ডের প্রচার করেন।

আচার্য্য শঙ্কর যখন কুমারিলের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি প্রয়াগক্ষেত্রে গঙ্গাযমুনার পুণ্য সঙ্গমস্থলে তুষানলে প্রবেশ করিয়াছেন; পার্শ্বে প্রভাকরাদি প্রিয় শিষ্যগণ সাশ্রু-নয়নে দণ্ডায়মান। বৌদ্ধগুরুগণকে পরাভূত করিয়া বিনষ্ট করিয়াছেন, জীবন-সায়াহ্নে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তিনি শরীর ত্যাগ করিতে চাহেন। আচার্য্য শঙ্করকে সমুপস্থিত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি প্রকৃতপক্ষে এখন মৃত। আমার প্রধান শিষ্য মণ্ডনমিশ্রের নিকট গমন করুন, তিনি পরাভূত হইলেই আমি পরাভূত বলিয়া জানিবেন।" এই বলিয়া ভট্টপাদ কুমারিল দেহ ত্যাগ করিলেন।

নর্ম্মদাতীরে প্রসিদ্ধ মাহিষ্মতী-নগরে আচার্য্য শঙ্কর ও মণ্ডনমিশ্রের শাস্ত্র-বিচার আরম্ভ হয়। মিশ্রের স্ত্রী বিদুষী উভয়ভারতীদেবী ছিলেন মধ্যস্থ। তিনি ঘোষণা করিবেন, বিচারে কে জয়ী এবং কে পরাজিত। যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি স্বমত, পরিত্যাগ করিয়া অপর পক্ষের মতবাদ গ্রহণ করিবেন। আচার্য্য শঙ্কর পরাজিত হইলে, তিনি মণ্ডনমিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৃহী হইবেন এবং যাগযজ্ঞ-মূলক বৈদিক উপাসনা অবলম্বন করিবেন। আর মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হইলে, তিনি শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন এবং ব্রহ্মধ্যানে জীবন যাপন করিবেন। ভারতবর্ষে চিরকালই এইরূপ বিচার-সভায় মতবাদ গৃহীত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে; যুদ্ধবিগ্রহ অথবা অস্ত্র-বল দ্বারা কখনও ধর্ম্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নাই। এই বিদুষী উভয়ভারতী ছিলেন

ভট্টপাদ কুমারিলের ভগিনী, তিনি সরসবাণী নামেও পরিচিত ছিলেন। সে যুগে স্ত্রী-শিক্ষার কিরূপ উৎকর্ষ ছিল, এই একটি ঘটনায়ই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

মণ্ডনমিশ্রও মহাপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার বাটীর দ্বারদেশ-স্থিত তরু-কোটরের শুক পক্ষীটি পর্য্যন্ত জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য অথবা ভেদাভেদ লইয়া তর্ক করিতে পারিত। মণ্ডনমিশ্র সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রথমে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে তাঁহার তেজঃপুঞ্জ বপু দেখিয়া অভ্যর্থনা করেন। বিচার আরম্ভ হইবার সময়ে উভয়-ভারতী শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডনমিশ্র উভয়ের গলে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পের দুই গাছি অম্লান মালা পরাইয়া দেন। বিচার আরম্ভ হয়। পরম প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য্যের সহিত আচার্য্য শঙ্কর প্রতিপক্ষীয় মত ধীর-ভাবে পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার উদারতা এবং প্রসন্নতা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইল না। তিনি পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনকে অস্বীকার করিলেন না, কিন্তু প্রমাণ করিলেন, তাহাই বেদের শেষ কথা নহে। সকাম উপাসক ও নিম্নাধিকারী গৃহীর জন্য তাহার উপযোগিতা আছে, কিন্তু মানবের পরম নিঃশ্রেয়সের সন্ধান উহাতে মিলিবে না। সে জন্য আশ্রয় করিতে হইবে উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনকে। বেদের উত্তর ভাগ হইতেছে আরণ্যক ও উপনিষৎ; তাহাকে অব-লম্বন করিয়া যে মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত, তাহাই উত্তরমীমাংসা। উপনিষৎ বেদের অন্ত বা শেষভাগ এবং উপনিষদে বেদের অন্ত বা চরম বস্তু অর্থাৎ শেষ বাণী নিহিত,—এই জন্য উহার অপর নাম বেদান্ত। বেদান্তের উপর ভিত্তি বলিয়া, বেদান্তকেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়া উত্তরমীমাংসা দর্শনের অপর নাম বেদান্ত-দর্শন। ইহা ভগবান্ বাদরায়ণ কর্ত্তৃক প্রণীত, উহা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক সূত্র বলিয়া উহার

প্রকৃত নাম ব্রহ্মসূত্র। আচার্য্য শঙ্কর তর্কে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উপরে জ্ঞানকাণ্ডের, পূর্ব্বমীমাংসার উপরে উত্তরমীমাংসার প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইহাই তাঁহার মহাদান। আচার্য্য কেবলমাত্র উত্তরমীমাংসার প্রাধান্য স্থাপন করিলেন না, তাহা যে অদ্বয়ব্রহ্ম-বাচক, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের যে প্রকৃতি-গত কোন পার্থক্য নাই, জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, তাহাও প্রতিপন্ন করিলেন। এই মতেরই নাম অদ্বৈতবাদ; যে মতবাদে দ্বৈত বা দুই এর স্থান নাই, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যেখানে একমাত্র সত্য, তাহাই অদ্বৈতবাদ।

আচার্য্যের মুখ হইতে অনর্গল যুক্তিধারা নির্গত হইতে লাগিল। প্রতিপক্ষ পরাভূত হইলেও শির আনত করিলেন না, ফলে ক্ষুব্ধ, রুষ্ট ও উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠের পুষ্পমালা দেহের তাপে শুখাইয়া ম্লান হইয়া উঠিল; আচার্য্যের কণ্ঠ-বিলম্বী মালা তখনও অম্লান, তখনও স্নিগ্ধ সৌরভ বিতরণ করিতেছে। সত্য দর্শনে উভয়ভারতীর ভুল হইল না। তিনি ঘোষণা করিলেন, তাঁহার স্বামী মণ্ডনমিশ্র পরাজিত। মণ্ডনমিশ্র মস্তক মুণ্ডন করিয়া আচার্য্যের শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং সুরেশ্বরাচার্য্য নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলী মণ্ডিত করিলেন। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি-নামক অদ্বৈত মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সুরেশ্বরাচার্য্যের রচনা।

আচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত এই অদ্বৈতবাদ ভারতবর্ষে নূতন নয়। উপনিষদে অনেক মন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে, বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে ইহাই স্থাপন করিয়াছেন, এবং গৌড়পাদ প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এমন করিয়া নিজ সাধনায় অপরোক্ষ উপলব্ধি দ্বারা বিগত-সংশয় ও বলবান্ হইয়া উপনিষৎরাশি, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করিয়া বৌদ্ধ

যুগাবসানে তাহার উপরে নবীন হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের ভিত্তি স্থাপন করার বিরাট কল্পনা, শক্তি বা সাহস তো আর কাহারও হয় নাই। বস্তুতঃ বেদ নয়, বেদান্তের উপরে তিনি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই যে বেদান্তের যুগ আরম্ভ হইল, আজিও তাহা চলিতেছে। পরবর্ত্তী সকল আচার্য্য তাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ বিশিষ্ট মতবাদ নূতন ভাষ্য রচনাদ্বারা ব্রহ্ম-সূত্র বা বেদান্তদর্শনের উপরই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যে সম্প্রদায়ের মতবাদ সমর্থন করিবার জন্য কোন বেদান্ত-ভাষ্য নাই, সে মতবাদ আর মর্য্যাদা পায় না। রাজা রামমোহন রায় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্যাখ্যানের সময়ে আচার্য্য শঙ্করের লিখিত বেদান্তভাষ্যের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়াছেন; স্বামী বিবেকানন্দ ঐ বেদান্তভাষ্যকে অবলম্বন করিয়া ভারতে ও জগতে সঞ্জীবনী বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যে যুগ আগতপ্রায়. আধুনিক সাম্যবাদ ও বিজ্ঞানের মতবাদ যে যুগে নূতন নূতন জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে, অনেকের বিশ্বাস আছে, একমাত্র বেদান্তই সেখানে সকল গ্রন্থিমোচনের সরল উপায় দেখাইতে পারিবে। হিন্দুধর্ম্মের এই বিশুদ্ধ বৈদান্তিক ভিত্তি দিয়াছেন আচার্য্য শঙ্কর।

ইহার পর আচার্য্য শঙ্করের দিগ্বিজয় আরম্ভ হইল, রাজা সুধন্বা সসৈন্যে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ কাপালিক ও বীভৎসাচার ভৈরবোপাসকগণ আচার্য্যের প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। বিপক্ষীয় রাজশক্তি হইতেও ভয় ছিল। ক্রমে ক্রমে হিমগিরি হইতে সাগরসৈকত পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধমত ও জৈনমত খণ্ডন করিয়া, পূর্ব্বমীমাংসা মত অপ্রধান করিয়া, আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তের বিমল জ্যোতি বিকিরণ করিলেন। আচার্য্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বৌদ্ধবিপ্লবে বহুজাতি ও সম্প্রদায় ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট

হইয়াছিল, আচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আবার সে সকল জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য ভারতবর্ষে চারিপ্রান্তে চারিটি মঠস্থাপনা এবং মঠাধ্যক্ষদের দ্বারা ভারতবর্ষে ধর্ম্মব্যাখ্যান ও ধর্ম্মরক্ষা করার ব্যবস্থা। আচার্য্য দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা-তীরে শৃঙ্গেরী মঠ, উত্তরভারতে বদরিকাশ্রমের সন্নিধানে অলকানন্দা-তীরে জ্যোতির্মঠ বা যোশীমঠ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে সাগর-সৈকত-স্থিত পুরীধামে গোবর্দ্ধনমঠ এবং দ্বারাবতীতে সারদামঠ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই চারি মঠে যথাক্রমে সুরেশ্বরাচার্য্য, তোটকাচার্য্য, পদ্মপাদাচার্য্য এবং হস্তামলকাচার্য্য—আচার্য্যের চারি প্রিয়শিষ্যকে মঠাধ্যক্ষ করিলেন। তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী এবং পুরি এই দশ নামে এই চারি মঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার, সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার, উদাসীন সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ গঠন ও মঠ-স্থাপনা, জনগণের কল্যাণ-কল্পে নানাবিধ শাস্ত্রপ্রচার প্রভৃতি কার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধযুগের প্রভাবের ফল। কিন্তু হায়! বৌদ্ধগণের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহারা আর ভারতের বহির্ভাগে অভিযান করিলেন না! আচার্য্যদের বাণী কেবলমাত্র ভারতীয়গণের জন্যই উচ্চারিত রহিল! বৃহত্তর ভারত প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ভারতেরই সৃষ্টি, হিন্দুর দান সেখানে অল্পই। প্রায় ১২০০ বৎসর পরে ভারতের বহির্দেশে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যখণ্ডে কেশরি-গর্জ্জনে বেদান্তের মহাবাণী শুনাইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অনাগত যুগে এই বেদান্তের সূত্রেই পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম ও সকল সংস্কৃতি একদিন সমন্বিত হইবে। এই মহাকার্য্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে ভারতীয় ঋষি ও মনীষীর। ভগবান্ শঙ্করাচর্য্যের আরব্ধ কার্য্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই।

বেদান্তদর্শন ভারতবর্ষে সর্ব্বকনিষ্ঠ দর্শন। জ্যেষ্ঠদের অপেক্ষা কনিষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, এ প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে।

বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হিন্দু-দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত এই ছয়খানি হিন্দুর প্রসিদ্ধ ষড়্দর্শন। সাংখ্যই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দর্শন। সাংখ্য-বক্তা কপিল ঋষি আদি বিদ্বান্ বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। সাংখ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই চরম তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতি অনাদি জড়শক্তি ও পুরুষ অনাদি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায়ে অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি-যুক্ত পঙ্গু যেপ্রকার গতিশক্তি-যুক্ত অন্ধের স্কন্ধে চাপিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করে, সাংখ্যের পুরুষও সেইপ্রকার জড়প্রকৃতির সাহায্যে জগদ্-ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন। পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র এই জ্ঞান হইলেই মুক্তি। সাংখ্যমতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা কোন ঈশ্বর নাই। সাংখ্যের অনেক মত স্বীকার করিয়াও নিরীশ্বর-মতবাদ বেদান্ত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।

যোগ-দর্শনের অপর নাম পাতঞ্জল-দর্শন। ইহার দার্শনিক মত অবিকল সাংখ্যমতেরই অনুরূপ। এই মতে একজন ঈশ্বরপুরুষ আছেন, কিন্তু তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা নহেন। যোগদর্শনের বৈশিষ্ট্য তাহার দার্শনিক মতবাদে নয়, তাহার যোগ-সাধনপদ্ধতিতে। এই সাধনপদ্ধতি ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ই অল্পবিস্তর গ্রহণ করিয়াছে। যোগ শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগাঙ্গ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি হইতেছে যম। অস্তেয় অর্থ চুরি না করা,

অপরিগ্রহ অর্থ বিষয় গ্রহণ না করা, উভয়ের অর্থ লোভশূন্যতা। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচটি হইতেছে নিয়ম। ইহাদের মধ্যে শৌচ অর্থ দেহ-শুদ্ধি; তপঃ বলিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা বুঝায়; স্বাধ্যায় অর্থ মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন বা প্রণবজপ; ঈশ্বরপ্রণিধান বলিতে সেই পরমগুরু ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্পণ বুঝায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি-বিচ্ছেদ এবং প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব স্ব বিষয়ের সম্পর্ক-শূন্যতা এই পাঁচটি অঙ্গ যোগের বহিরঙ্গ। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি আসল যোগাঙ্গ। স্থান-বিশেষে বা বিষয়-বিশেষে চিত্তকে আবদ্ধ করার নাম ধারণা; ধারণার ফলে চিত্তের যে একাগ্রতা বা একতান বৃত্তি-প্রবাহ, তাহাই ধ্যান; ধ্যানেরই অতি পরিপক্ক অবস্থার নাম সমাধি। যোগদর্শনও অতি প্রাচীন দর্শন। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেই সাংখ্যমত ও যোগমত প্রচলিত ছিল।

ন্যায় ও বৈশেষিকেরও মূল উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে নিঃশ্রেয়স-লাভ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে মিথ্যাজ্ঞানের নিরসন করিতে হয়। মিথ্যাজ্ঞানের নিরসনের জন্য আবার পদার্থের তত্ত্ব-বিচার আবশ্যক। ন্যায়শাস্ত্রে শেষ পর্য্যন্ত অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের আলোচনা প্রধান হইয়া দাঁড়ায় এবং উহা তর্কশাস্ত্রে পরিণত হয়। বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুবাদ ব্যাখ্যাত আছে। পরমাণু-মাত্রেরই বিশেষ গুণ স্বীকার করা হয় বলিয়া এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন। ন্যায় ও বৈশেষিক সমশ্রেণীর দর্শন। ন্যায়-দর্শন মতে একপ্রকার ঈশ্বর থাকিলেও বৈশেষিকদর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। ন্যায় বা বৈশেষিক কোনও দিন মোক্ষশাস্ত্র হিসাবে অধীত হয় নাই।

হিন্দুর পঞ্চম দর্শন পূর্ব্বমীমাংসা, ইহা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-ভাগের দর্শন। ইহাতেও ঈশ্বর-সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে কোনও বিচার নাই।

ভারতবর্ষের শেষ দর্শন হইতেছে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন; ইহা বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দর্শনে ৪টি অধ্যায়, ১৬টি পাদ ও ৫৫৫টি সূত্র আছে। এই সূত্র-সমূহ দ্বারা সাংখ্যমত ও অন্যান্য দার্শনিক মত খণ্ডিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের প্রকৃত নাম ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্র এই নাম দ্বারাই বুঝা যাইবে যে, এই দর্শনের প্রতিপাদ্য ও আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ছাড়া, অথবা তৎ সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া এখানে দ্বিতীয় কোন আলোচ্য বিষয় নাই। ইহার সূত্ররচনা-প্রণালী ও যুক্তি-প্রণালীই বিশিষ্ট প্রকারের। ইহার প্রথম চারিটি সূত্র বেদান্তের চতুঃসূত্রী নামে পরিচিত। এই চতুঃসূত্রীর আলোচনায় ভাষ্যকার আচার্য্যগণ নিজ নিজ সমগ্র মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রথম সূত্র হইতেছে,—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

—অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। আরম্ভেই সূত্রকার জানাইলেন, ব্রহ্মের স্বরূপ কি, ব্রহ্মের লক্ষণ কি, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কি, প্রভৃতি ব্রহ্মবিজ্ঞান-বিষয়ক সমুদয় প্রশ্নের আলোচনা হইবে। যিনি সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তিনি ব্রহ্ম। যে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বা পরমাত্মাকে অন্যান্য দর্শনে খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না, তিনি এখানে সমস্ত চিন্তা অধিকার করিয়া আছেন। এখানেই এই দর্শনের বৈশিষ্ট্য। আচার্য্য শঙ্কর 'অনন্তর' শব্দের দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন

যে, সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইলে তবে বেদান্তদর্শন-পাঠের অধিকার জন্মে। সাধন-চতুষ্টয় হইতেছে,—

(১) শমদমাদি সাধন-সম্পদ—শম বা মনোনিগ্রহ, দম বা বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, তিতিক্ষা বা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, উপরতি বা বিষয় হইতে বিরতি, শ্রদ্ধা বা গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস, সমাধান বা মনঃসন্নিবেশ অর্থাৎ ধ্যান।

(২) নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক—কোন্ বস্তু নিত্য, কোন্ বস্তু অনিত্য, তাহার বিচার।

(৩) ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ—ইহলোকের নানাবিধ বিষয়-ভোগ-সুখে ও পরলোকের স্বর্গাদি-ভোগ-সুখে বৈরাগ্য।

(৪) মুমুক্ষুত্ব—মুক্তি লাভের ইচ্ছা।

সহজ কথায় বলা যায়, চরিত্র-গঠন ও চিত্ত শুদ্ধ না হইলে, জ্ঞান লাভের ইচ্ছা না হইলে এবং বেদান্ত-বাক্যে শ্রদ্ধাবুদ্ধি না জন্মিলে বেদান্তপাঠে কোনই লাভ হয় না।

দ্বিতীয় সূত্র হইতেছে,—

জন্মাদ্যস্য যতঃ।

—জন্মাদি ইহার যাহা হইতে। যাহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়, তিনিই পূর্ব্ব-সূত্রস্থ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিশ্ব যাহা হইতে জন্মিতেছে, যাহাতে জীবিত আছে এবং যাহাতে পুনরায় লয় পাইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। আচার্য্য শঙ্কর বুঝাইতেছেন,—এই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ। জল যেমন বুদ্বুদ-রূপে প্রকাশ পায়, এই ব্রহ্মও তেমনি জীব ও জগৎ-রূপে বিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত হইতেছেন। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, জীব ও জগতে কোন ভিন্নতা নাই। এই ব্রহ্মই আত্মা। ব্রহ্ম হইতে

জীব বা জগতের ভিন্নতা-জ্ঞান রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তি বা মিথ্যা। এই মিথ্যা-জ্ঞানের নামই অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মায়া। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াধীন। মায়াধীশ ঈশ্বরই সগুণ ব্রহ্ম। এই সকলই ব্যাবহারিক জগতের কথা। পারমার্থিক তত্ত্ব হইল এক ব্রহ্মই আছেন এবং তিনি নির্ব্বিশেষ। ব্যাবহারিক জগতে ব্রহ্মের শক্তি বা মায়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। সাধনা দ্বারা অবিদ্যাপাশ ছেদন করিয়া মায়াতীত হইলে এবং আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিলে পরম নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলে জ্ঞান-ঘন ও আনন্দ-ঘন হইয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের সার এই একটি মাত্র পংক্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে,—

ব্রহ্ম সত্যং, জগন্ মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ।

—এক ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব স্বয়ং ব্রহ্ম, অপর কেহ নয়। 'জগৎ মিথ্যা' অর্থ ব্রহ্ম হইতে জগৎ-সত্তার পৃথক্ জ্ঞান মিথ্যা।

তৃতীয় সূত্র হইতেছে,—

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।

—শাস্ত্র ব্রহ্মের যোনি বা কারণ বলিয়া। শাস্ত্র-প্রমাণ বা ঋষি-বাক্য হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা উক্ত ব্রহ্মকে জানা যায়। "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ" অর্থাৎ কেবলমাত্র তর্ক দ্বারা সত্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না বলিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রত্যেক যুক্তির সহিতই আপ্তপ্রমাণ বা ঋষিবাক্য অর্থাৎ উপনিষদের বাক্য উপস্থিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রকৃষ্টতম উপায় হইতেছে তাই বেদান্ত-শাস্ত্র।

চতুর্থ সূত্র হইতেছে,—

তৎ তু সমন্বয়াৎ।

—সেই ব্রহ্ম কিন্তু সমন্বয় দ্বারা। সেই ব্রহ্ম সমস্ত বেদান্ত বা উপনিষদ্-বাক্যের সমন্বয় দ্বারা জগৎকারণ ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জ্ঞেয়। আপাত-বিরোধী উপনিষদ্‌বাক্যগুলিরও সমন্বয় করিয়া অর্থাৎ কোন্ অর্থে উহাদের তাৎপর্য্য, তাহা নির্ণয় করিয়া মূল অর্থ বাহির করিলে দেখা যাইবে,—সমগ্র বেদান্ত একবাক্যে বলিতেছেন, ব্রহ্ম জগৎ-কারণ ও সর্ব্বজ্ঞ। শাস্ত্র যাঁহার যোনি বা কারণ, তিনি আবার শাস্ত্রেরও যোনি বা কারণ; তাঁহাকে শাস্ত্রদ্বারাই পরিচিত করা হইতেছে। গৌণতঃ সমন্বয় শব্দের ব্যাপক অর্থ করিয়া বলা হইয়া থাকে, বেদান্ত-দর্শন সমন্বয়ের দর্শন। সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে এখানে বিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয়, আত্মা ও অনাত্মার সমন্বয়, জড় ও অজড়ের সমন্বয়, সাকার ও নিরাকারের সমন্বয়, দ্বৈত ও অদ্বৈতের সমন্বয়—সকল প্রকার সমন্বয় পাওয়া যাইবে। সমন্বয় দ্বারাই ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাইবে।

বৈদান্তিকগণ বেদান্তদর্শনের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতে অন্ধ-হস্তী ন্যায়ের উদাহরণ দিয়া থাকেন। অন্ধগণ প্রত্যেকে হস্তীর শুণ্ড, দন্ত, উদর বা লাঙ্গুল এক এক অঙ্গ স্পর্শ করিয়া এক এক প্রকার বিবরণ দিতে লাগিল। কোন বিবরণই একেবারে মিথ্যা না হইলেও সত্য নয়, বিবরণগুলি একদেশদর্শী মাত্র, তাহাদের দ্বারা চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না। অন্যান্য দর্শনগুলির তত্ত্ব-দর্শন এই প্রকার একদেশদর্শী। সমস্তকে সমন্বয় করিয়া, সমস্তকে অতিক্রম করিয়া, পূর্ণ পরিচয় হয় তাঁহার, যিনি চক্ষুষ্মান্। এইরূপে একমাত্র চক্ষুষ্মান্ বেদান্তদর্শনই ব্রহ্মের বা পরম তত্ত্বের সম্যগ্‌দর্শন ও পূর্ণদর্শন লাভে সমর্থ হইয়াছে। মতবাদের ক্ষেত্রে যাহাই হউক, উপলব্ধি-বিষয়ে সাংখ্যযোগী ও বৈদান্তিকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল বলিয়া মনে হয় না।

প্রথমে উপনিষৎ বা বেদান্ত, পরে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন এবং শেষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—এই তিনখানি মহাগ্রন্থকে বলা হয় প্রস্থানত্রয়। বুদ্ধপরবর্ত্তী যুগ হইতে এই প্রস্থানত্রয় হিন্দুধর্ম্মের প্রধান ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হইতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বপ্রথমে এই প্রস্থান-ত্রয়ের বিশদ ভাষ্য রচনা করিয়া তাঁহার অদ্বৈত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ব্যাখ্যা ও প্রচার করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে ছোট বড় আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; স্বল্পাধিকারীর জন্য অনেক ভক্তি-মূলক স্তোত্রাদিও রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বৌদ্ধ-মত নিরসন ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ তাঁহার এক প্রধান লক্ষ্য ছিল বলিয়া তাঁহার মতবাদে ও গঠিত সম্প্রদায়ে বৌদ্ধ প্রভাব রহিয়া গিয়াছে। আচার্য্য ও তাঁহার সম্প্রদায় প্রচার করিয়াছেন নৈষ্কর্ম্ম বা কর্ম্ম-ত্যাগ; তাহা প্রধানতঃ সংসার-বিরক্ত মুমুক্ষু পুরুষদের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। উপনিষদের ঋষিদের জীবনাদর্শ এবং শ্রীকৃষ্ণের ও গীতায় প্রচারিত জীবনাদর্শ তিনি বীর্য্যের সহিত গ্রহণ ও প্রচার করিতে পারেন নাই। মনুসংহিতায় ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—গৃহাশ্রমই জ্যেষ্ঠাশ্রম, কারণ গৃহী তপস্যা করেন, অন্ন ও জ্ঞান দান করিয়া সকল আশ্রমকে সতত পালন করিয়া থাকেন; কেবলমাত্র দুর্ব্বলেন্দ্রিয়গণই গৃহাশ্রমধর্ম্ম ধারণ করিতে পারে না,—

'যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ'।

[মনু ৩-৭৯]

উপনিষৎ বা রামায়ণ-মহাভারতের যুগের ন্যায় গৃহধর্ম্মের আদর্শকে বীর্য্য-ভূয়িষ্ঠতার সহিত উন্নত এবং বাস্তব-জীবনে উদ্‌যাপিত করিতে না পারিলে জগতের উন্নতি কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? গৃহী অযোগ্য হইলে সন্ন্যাসীও অযোগ্য হইবেই। বর্ত্তমান ভারতে

হইয়াছেও তাহাই। এই প্রপঞ্চ-পরাঙ্মুখ উদাসীনতা বুদ্ধদেবের সময় হইতে শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গৃহীত হয় এবং আচার্য্য শঙ্কর তাহাকে আবার নূতন মর্য্যাদায় মণ্ডিত করিয়া যান। আচার্য্য শঙ্করের কার্য্য-সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। তিনি যদি বৌদ্ধ-গণের ন্যায় ভারতের বাহিরেও ধর্ম্ম-প্রচারের অনুপ্রাণনা দিয়া যাইতেন, অথবা বৌদ্ধগণের ন্যায় ভারতের সকল সমাজে শিক্ষাপ্রচার এবং উচ্চাঙ্গের হিন্দুনীতি ও হিন্দুধর্ম্মের প্রচারের ব্যবস্থা রাখিতেন, তাহা হইলে অন্য ধর্ম্মের ভারতে প্রবেশ, এবং প্রবেশ হইলেও ব্যাপকভাবে প্রচার সম্ভবপর হইত না। বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণের অধিক-সংখ্যক লোকই ছিল আচার-ভ্রষ্ট পতিত বৌদ্ধ। হিন্দু-সমাজ-কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হওয়ার ফলেই তাহারা নবাগত ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া মানুষ হইবার পথ পাইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনরূপ সমবেত উপাসনাদ্বারা এবং মহোৎসবরূপ সমবেত পান-ভোজন দ্বারা এবং অস্পৃশ্য নেড়ানেড়ীগণকেও বৈষ্ণবদীক্ষা দ্বারা জাতিকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু রক্ষণশীল আচারী হিন্দু-সমাজ কর্ত্তৃক তাহা সমর্থিত না হওয়ায় সঙ্কীর্ণক্ষেত্রেই তাহার উপকারিতা নিবদ্ধ রহিয়া গেল।

আচার্য্য শঙ্কর-প্রচারিত মতবাদ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ। পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কয়েক জন আচার্য্য তাঁহারই পন্থা অনুসরণ করিয়া প্রস্থান-ত্রয়ের, বিশেষভাবে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-রচনা দ্বারা নিজ নিজ বিশিষ্ট মতবাদ পুষ্ট ও প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ভগবান্ রামানুজাচার্য্য-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং মধ্বাচার্য্য-প্রচারিত দ্বৈতবাদ সমধিক প্রসিদ্ধ। রামানুজাচার্য্য ১০১৬ খ্রীষ্টাব্দে

দাক্ষিণাত্যে বর্ত্তমান মান্দ্রাজ নগরী হইতে ২৬ মাইল দূরে শ্রীপেরম্ব-ধূরম্ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনেক পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও শ্রীরামানুজই এই মতের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য। এই মতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব পৃথক্, কিন্তু জীব ও জগৎ এক ঈশ্বরেরই শরীর। জীব অণু, ঈশ্বর বিভু; জীব অঙ্গ, ঈশ্বর অঙ্গী; জীব আশ্রিত, ঈশ্বর আশ্রয়। অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, ঈশ্বর হইতেও তেমনি তাঁহার অংশ জীবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই মতে ভক্তিপথই নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র পথ। রামানুজ-প্রণীত বেদান্ত-ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। মধ্বাচার্য্য শুদ্ধ দ্বৈতবাদী। মধ্বাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্কে অদ্বৈতের কোন আভাসও নাই। জীব ও ব্রহ্ম দুই তত্ত্ব, এবং তাঁহারা পৃথক্। মধ্বাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের নাম তত্ত্ববিবেক। এই সকল ছাড়া নিম্বার্কাচার্য্য-প্রণীত এবং বল্লভাচার্য্য-প্রণীত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যেরও প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণ সকলেই দক্ষিণভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে জ্ঞান ও ভক্তির প্রভা বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপন্থী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্য নামে শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই মতও দ্বৈতবাদ, ইহার প্রকৃত নাম অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদ। ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদও আছে, আবার অভেদও আছে; এই ভেদাভেদের স্বরূপ অচিন্তনীয়। এই মতেও কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। উত্তরভারত হইতে বেদ প্রচারিত হয়, মধ্যভারত হইতে উপনিষৎ, পূর্ব্বভারত হইতে প্রচারিত হয় বৌদ্ধমত ও জৈনমত, এবং সর্ব্বশেষে দক্ষিণ ভারত হইতে প্রচারিত হয় বেদান্ত।

হিন্দুদর্শনগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে মত-বৈষম্য থাকিলেও নিম্ন-লিখিত কয়েকটি বিষয়ে সকল দর্শন একমত,—

(১) আত্মার অবিনশ্বরত্ব।

(২) অবিদ্যাবশে আত্মার দেহাশ্রয় ও দেহাভিমান। ইহাই জীবের সুখ দুঃখের কারণ।

(৩) জন্মান্তর-প্রাপ্তি ও কর্ম্ম-বিপাক।

—অবিদ্যাবশে আত্মার দেহাভিমান হয়। দেহাভিমান যতকাল থাকে, ততকাল বাসনাবশে নূতন নূতন কর্ম্ম হয়। কর্ম্ম হইলেই তাহার ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ আসে। সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার জন্য নূতন নূতন জন্ম অর্থাৎ আত্মার নূতন নূতন দেহাশ্রয় হয়। জন্ম হইতে আবার কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে আবার জন্ম হয়। জন্মান্তর ও কর্ম্মবিপাক এক সঙ্গেই চলে।

(৪) মুক্তি জীবের পরম নিঃশ্রেয়স ও লক্ষ্য। জন্ম ও কর্ম্ম অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে মুক্তিই মুক্তি।

(৫) মুক্তি-লাভের বা জন্ম-নিবৃত্তির বা সুখ-দুঃখ পরিহানের অথবা স্বরূপ-জ্ঞানের পথ প্রদর্শনই দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

বেদান্ত এই সকল বিষয়ের উপরে ঘোষণা করিতেছেন,—জীব ও জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারী ঈশ্বর বা ব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, এবং ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। জীব বা আত্মা এবং ব্রহ্ম এক, অভিন্ন; অতএব আত্মা চিৎ-স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। বেদান্ত ঘোষণা করিতেছেন,—আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, স্বর্গ নাই, নিরয় নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, সুখ নাই বা দুঃখ নাই। আত্মার কোন ভয় নাই, আত্মা অভী। জীব বা আত্মা অষ্টৈশ্বর্য্য ও প্রকৃতি-বশিত্ব লাভ,

করিতে পারে ; আঁত্মা সর্ব্বকাম, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বশব্দ, সর্ব্বস্পর্শ পাইতে পারে। আত্মা স্বারাজ্য পায়,—"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্।" রাগ-সঙ্গ-প্রমুক্ত ও সর্ব্ববন্ধ-বিমুক্ত হইয়া আত্মা নিজরূপে এবং বিষয়-সমূহে বিলাস করিতে পারেন। ইহাই আত্মার জীবন্মুক্তি। ইহা অপেক্ষা আর আশার বাণী কি হইতে পারে? সর্ব্বভূতে এই আত্মা এবং এই আত্মায় সর্ব্বভূত বিরাজমান। আত্মা ব্যাপী, ভূমা। তুমি, আমি, যে কোন জীব এবং ব্রহ্ম এক। তাই তোমার দুঃখে আমার দুঃখ, তোমার সুখে আমার সুখ। তাই মহাভারত বলেন,—

আত্মনঃ প্রতিকূলানি ন পরেষাং সমাচরেৎ।

—আত্মার যাহা প্রতিকূল, তাহা অপরের সম্বন্ধে আচরণ করিবে না।

তাই গীতা বলেন,—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

[গীতা ৬-৩২]

—হে অর্জ্জুন! যিনি সর্ব্বজীবের সুখ বা দুঃখ আপনার সুখ-দুঃখের সমান দেখেন, আমার মতে সেই যোগীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তাই আচার্য্য শঙ্কর বলেন,—

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু র্ব্যর্থং কুপ্যসি ময়্যসহিষ্ণুঃ।

—তোমাতে, আমাতে এবং অন্যত্র একই বিষ্ণু বিরাজমান, বৃথাই অসহিষ্ণু হইয়া আমার প্রতি কুপিত হইতেছ?

ইহাই যদি মনুষ্য-সমাজের আচরণীয় নীতি হয়, তবে আর সমাজে ভয় কোথায়? তবে আর সমাজে বৈষম্য ও ভেদ-বুদ্ধি থাকিবে কেন? প্রত্যেকের উদার বক্ষেই যদি প্রত্যেকের স্থান

হয়, তবে আর হিংসা-নাগিনীর কুটিল ফণাচক্রের বিস্তার কেন? মনে রাখিতে হইবে, এই নীতি কেবলমাত্র ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধ দার্শনিক প্রজ্ঞা।

নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদে সিদ্ধ মহাযোগী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পিঞ্জর হইতে মুক্ত কেশরীর ন্যায় এই জগজ্জাল হইতে নির্গত হইয়া উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন,—

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্য-ভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

—আমার দ্বেষ নাই, রাগ নাই; আমার লোভ ও মোহ নাই; আমার মদ ও মাৎসর্য্য-ভাবও নাই; আমার ধর্ম্ম নাই, অর্থ নাই, কাম নাই এবং মোক্ষও নাই; চিদানন্দস্বরূপ শিব আমি! শিব আমি!

ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতি-ভেদাঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

[নির্ব্বাণষট্ক]

—আমার মৃত্যু নাই, শঙ্কা নাই, আমার কোন জাতিভেদ নাই; আমার পিতা নাই, মাতা নাই, আমার জন্মই নাই; আমার বন্ধু নাই, মিত্র নাই, গুরু নাই, অথবা শিষ্য নাই; চিদানন্দ-স্বরূপ শিব আমি! শিব আমি!

ইহাই শুদ্ধ বেদান্ত। এ দুর্দ্দর্শ দৃশ্য দেখিতে সাহস নাই? ভয় কি? রামানুজাচার্য্যের ভক্তিবিগলিত কণ্ঠোত্থিত প্রার্থনা শোন,—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ গুরু স্ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

[গদ্যত্রয়]

—হে ঈশ্বর! তুমিই আমার মাতা, পিতা তুমিই; তুমিই বন্ধু, গুরুও তুমিই; তুমিই বিদ্যা, ধনও তুমিই; হে দেবদেব! তুমিই আমার সকল!

নিজেকে বড় অসহায় মনে হইতেছে? পিতা, মাতা, সুহৃৎ ও সহায়-স্বরূপ, হৃদয়ের অন্তর্য্যামী, অন্তরের প্রেরক পুরুষ, সুখদুঃখের নিত্যসঙ্গী, পাপাপহারী করুণাময় ঈশ্বরকে খুঁজিয়া পাইতেছ না? যিনি হৃদয়ে বল ও বীর্য্য দিবেন, অসত্য হইতে সত্যে এবং অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাইবেন, সেই পরম প্রিয়তম অন্তরতম পুরুষের বিচ্ছেদে তুমি কাতর? কেন, বেদান্ত তো তাঁহার সন্ধান দিয়াছেন। আরও স্পষ্ট, একেবারে স্পষ্ট করিয়া জানিতে চাও? পড় প্রস্থানত্রয়ের শেষ গ্রন্থ গীতা। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা এবং পিতামহ। আমিই জ্ঞেয় বস্তু, পবিত্র ওঙ্কার এবং ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদ-স্বরূপ।

"আমিই লোকসকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু ও শুভাশুভদ্রষ্টা সাক্ষী; আমিই সকলের নিবাস, শরণ ও সুহৃৎ; আমাতেই সকলের প্রভব, প্রলয় ও অবস্থান; আমিই সকলের নিধান এবং বীজ; আমি অব্যয়।

"পত্র, পুষ্প, ফল বা জল যে আমাকে যাহা কিছু ভক্তির সহিত প্রদান করে, শুদ্ধ আত্মার ভক্তি-সহকারে সমর্পিত সে সকলই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি।

"যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা যজ্ঞ কর এবং দান কর, যাহা তপস্যা কর, হে কৌন্তেয়! সে সকলই আমাতে অর্পণ কর।

"নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য কিছু ভজনা না করিয়া কেবলমাত্র আমাকেই ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়াই জানিবে, তাহার অধ্যবসায় অতি সাধু।

"শীঘ্রই সে ধর্ম্মাত্মা হইয়া থাকে এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে, আমার ভক্ত কদাপি বিনষ্ট হয় না। —ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

[গীতা, ৯ম অধ্যায়, ১৭-১৮, ২১-২৭, ৩০-৩১]



শাক্ত ও তন্ত্র

বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ! এখানে বাহ্যপ্রকৃতির বৈচিত্র্যই বা কত! মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্যই বা কত! এই প্রকৃতি-বৈচিত্র্যকে ভারতবাসী শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করে, আনন্দের সহিত অন্তরে তাহা গ্রহণ করে। এখানে কোন্ অনাদিকাল হইতে হিমাদ্রির তুষারাবৃত গোমুখীগহ্বর দিয়া শুদ্ধ শুভ্র জলরাশি লইয়া প্রবাহিত হইতেছে বেগবতী ভাগীরথী গঙ্গা। প্রবাহিত হইতেছে স্বচ্ছ নীল জলরাশি লইয়া, হিমালয়ের আর এক দুর্গম তুষারদেশ হইতে শান্ত-প্রবাহিণী যমুনা। শুভ্র ও নীল জলরাশির বেগবান্ ও শান্ত প্রবাহ পুণ্যপ্রয়াগক্ষেত্রে মিলিত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে এক অখণ্ড ধারায়, নাম তার ভাগীরথী গঙ্গা। ভাগীরথী বহিয়া চলিয়াছে ভারতের হৃদয়-ভূমি প্লাবিত করিয়া, মহাসাগরের আহ্বানে সে চঞ্চল। এক ধারা, এক মহাধারা—পদ্মা, ভাগীরথীর এক বিপুল বেগ-বিক্ষোভ, মহাশক্তির এক মহোচ্ছ্বাস নবীন খাতে আপনার প্রাণের প্রাচুর্য্য ঢালিয়া সত্বর সাগর-লক্ষ্যে ছুটিয়া গেল। কত প্রবাহ নাম হারাইয়া ভাগীরথী-প্রবাহে মিশিয়া গেল! কত প্রবাহ নূতন নাম-সহ ভাগীরথীর সলিলরাশি লইয়া নূতন খাতে সিন্ধুবক্ষে উত্তীর্ণ হইল। ভাগীরথী সহস্র বাহুদ্বারা মহাসাগরকে অনুভব করিয়া সে অসীম সত্তায় নিজ নাম, রূপ ও সত্তা বিসর্জ্জন দিয়া বিলীন হইয়া গেল। এই ভাগীরথী আর্য্যসভ্যতার মূল বৈদিক প্রবাহ, এই যমুনা আর্য্যেতর সংস্কৃতির প্রবাহ, পদ্মা যেন শাক্ত তন্ত্র, যেন এক বৈষ্ণব প্রবাহ! এইরূপ আরও কত মত, কত প্রবাহ রহিয়াছে! মহাসমুদ্র বিরাট ব্রহ্ম বা মহেশ্বর।

দার্শনিক জগতে তত্ত্বোপলব্ধির দিক্ দিয়া আর্য্যসংস্কৃতির বৈদান্তিক রূপই শেষ কথা। কিন্তু সাধনা-জগতে উপাসনা-প্রণালীর দিক দিয়া একই বৈদান্তিক সত্য নানা সাধন-পদ্ধতিতে নানা উপায়ে উপলব্ধ হইয়াছে। শাক্ত পদ্ধতি ও বৈষ্ণব পদ্ধতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দুইটি পদ্ধতি। উভয় পদ্ধতি অতি প্রাচীন, বেদেও ইহাদেব পরিচয় পাওয়া যায়, বাহিরের সংস্কৃতি ও পদ্ধতি দ্বারাও ইহারা পুষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই, এবং এক সময়ে ভিন্ন নাম লইয়া বৈদিক সাধনার পার্শ্বেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনবাদ দ্বারা হিন্দুসাধনার এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি বুঝা সম্ভবপর নহে। ইহারা প্রাচীনকাল হইতেই পাশাপাশি থাকিয়া রুচি ও প্রকৃতিভেদে সাধকগণের সাধনার পুষ্টি করিয়া চলিয়াছে। একই ভাগীরথী হইতে বিনির্গত হইয়া ভাগীরথীর জলধারাই যেন বিভিন্ন খাতে সাগর-মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। আমাদের মন ভারতীয় বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তঃ-প্রকৃতির এই উদার আবেষ্টনীর মধ্যে বিচিত্র রসে পুষ্ট হইতেছে। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম পাশাপাশি থাকিয়া আমাদের মানসিক গঠনে জটিল উপাদান যোগাইতেছে। যেখানে সত্য আছে, হিন্দু মন সেখানেই তাহা চিনিতে পারে, স্বীকার করিতে পারে; বাহিরের ভিন্নরূপ বা ভিন্ন সাধন-পদ্ধতি তাহার সত্যমুখী চিত্তকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না।

শাক্ত ধর্ম্মের প্রভাব ভারতবর্ষে ও বাঙ্গালাদেশে তো অল্প নয়। বিষ্ণুচক্র-ছিন্ন সতীদেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বেলুচিস্থানের হিঙ্গুলা-ক্ষেত্র হইতে আসাম প্রদেশের কামরূপ-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড ঐক্যে সংবদ্ধ করিয়া তান্ত্রিক পীঠস্থানে পরিণত করিয়াছে; প্রত্যেক পীঠস্থানেই দেবী এক বিশিষ্ট শক্তিরূপে এবং

শিব তাঁহারই পার্শ্বচর এক ভৈরবরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কলিকাতায় কালীঘাটে, বগুড়া জিলায় করতোয়াতটে, বরিশালে সুগন্ধায় শিকারপুরে, চট্টলে চন্দ্রনাথতীর্থে, ত্রিপুরায় ও শ্রীহট্টে, জলপাইগুড়ির ত্রিস্রোতায়, বর্দ্ধমানে ক্ষীরগ্রামে, কাটোয়ার কেতুগ্রামে, উজানিতে কোগ্রামে, কোশাইতীরে কাঞ্চীদেশে, তমলুকে বিভাসে শাক্ত পীঠস্থান বর্ত্তমান।

এক সময়ে বাঙ্গালাদেশে তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষগণ শক্তি, ভক্তি ও জ্ঞান-ত্রিবেণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুলিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের ভক্তি-বিগলিত কণ্ঠের মা মা ধ্বনি আজিও বাঙ্গালী ভুলিতে পারে নাই। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী বনে বিল্বমূলে পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসিয়া রামকৃষ্ণ তন্ত্র-সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগতা এক সিদ্ধা ভৈরবী ব্রাহ্মণী ছিলেন তাঁহার গুরু। রামকৃষ্ণের কণ্ঠোত্থিত কালী-সঙ্গীত "ডুব দেরে মন কালী বলে," অথবা "কালী কালী ব'লে আমার অজপা যদি ফুরায়" আজিও যেন ভাগীরথীতীরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে ঘুরিয়া বেড়ায়! ইহার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের সাধক কমলাকান্তের গান শুনিয়া ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় দস্যুদল পর্য্যন্ত মোহিত ও পদানত হইয়াছিল ; তাঁহার সে গান

"আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা"

আজিও সাধক-সমাজে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

রামকৃষ্ণের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একদিকে হালিসহর কুমারহাটীতে ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন, আর একদিকে নাটোর-খণ্ডে মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় পঞ্চমুণ্ডী আসন রচনা করিয়া তান্ত্রিক সাধনায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ভক্তকবি রামপ্রসাদের

অপূর্ব্ব ভক্তি-সঙ্গীত আজিও তো বাঙ্গালীর মন তেমনই করিয়া পাগল করে! "মা মা বলে আর ডাকব না", "মা আমায় ঘুরাবি কত"—এই সকল গানে জগজ্জননী ব্রহ্মময়ী মাতার প্রতি তাঁহার দীন সন্তানের মান অভিমানের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার তুলনা বাঙ্গালার কোন সঙ্গীতেই তো আর পাওয়া গেল না! মহারাজ রামকৃষ্ণ শব-সাধনাও করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার উত্তর সাধক ছিল ভোলা, রাণী ভবানীর এক ধোবা প্রজা। একবার সাধানায় রামকৃষ্ণের সিদ্ধি যখন সমীপবর্ত্তী, সমস্ত ভয় ও প্রলোভন বীর সাধক এবং তাঁহার উত্তরসাধক উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তখন হঠাৎ দেখা গেল স্বয়ং রাণী ভবানী বরকন্দাজ-সহ ভোলাকে এবং তাঁহার পুত্রকে শাসন করিতে আসিতেছেন। বলা বাহুল্য, রাজা রামকৃষ্ণ রাজকার্য্যে উদাসীন হইয়া রাণী ভবানীকে লুকাইয়া এই সাধনা করিতেন। এই দৃশ্যে উভয়েরই মন বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। এ দৃশ্যও ছিল মায়া, রামকৃষ্ণ ভীমবলে শব-বক্ষ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মৃত্যু নিকট দেখিয়া তিনি গান ধরিলেন,—

আমার মন যদি তায় ভোলে,
বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।

শেষে ভোলাকে ডাকিয়া গাহিয়া উঠিলেন,—

আনরে ভোলা জপের মালা
ডুবি গঙ্গাজলে

তখন তাঁহার দেহ গঙ্গায় অন্তর্জলি করা হইতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে একদিকে মৈমনসিংহ-নিবাসী শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ পরমহংস, আর একদিকে নবদ্বীপ-নিবাসী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বিশুদ্ধ তন্ত্র-সাধনা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ তন্ত্র-গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করিয়া

তান্ত্রিক সাধনাকে সংস্কৃত ও সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় উচ্ছৃঙ্খল বামাচারিগণের যথেচ্ছাচার অনেকাংশে নিবারিত হয়। এই ষোড়শ শতাব্দীতেই ত্রিপুরা জিলার মেহেরক্ষেত্রে এক নিরক্ষর সাধক ভীষণ শবসাধনাদ্বারা মাত্র এক রাত্রিমধ্যেই দেবীর পরম অনুগ্রহ লাভ করিয়া দেবীর দশ মহাবিদ্যা মূর্ত্তি বা সর্ব্ববিদ্যা রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। এই দিন হইতেই দেশবাসীর নিকটে তাঁহার 'সর্ব্ববিদ্যা' উপাধি লাভ ঘটে। সর্ব্ববিদ্যা-সিদ্ধ সর্ব্বানন্দের নাম আজিও বাঙ্গালাদেশে সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইয়া থাকে। চাঁদরায় ও কেদার রায়ের দীক্ষাগুরু বীরাচার-সিদ্ধ রত্নগর্ভ বা গোঁসাই ভট্টাচার্য্যের কীর্ত্তিকাহিনী ঢাকা জিলায় সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। মৈমনসিংহ জিলার অর্দ্ধকালী বা জয়দুর্গাঠাকুরাণীর কাহিনীও কম বিস্ময়কর নহে। উগ্র তান্ত্রিক ব্রহ্মাণ্ডগিরির বাহিত বিশাল প্রস্তরখণ্ড নাকি ঢাকার রমনার কালী বাড়ীতে এখনও পড়িয়া আছে। বরিশালের সোনা ঠাকুর বা বীরভূমের তারাপীঠের বামাক্ষেপার কাহিনী তো অধিক দিনের পুরাণ নয়।

বাঙ্গালাদেশের বার মাসের তের পার্ব্বনের হিসাব লইলে দেখা যাইবে বাঙ্গালী প্রধানতঃ শক্তির পূজক, শাক্ত। দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, বাসন্তী পূজা, সকলই শক্তিপূজা। বাঙ্গালী এই সকল শক্তিপূজা করিয়া কেবল উৎসবের আনন্দ নহে, ঋদ্ধি, সিদ্ধি ও শক্তি পাইতে চাহিয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসব। ইহা কেবল পূজা নহে, ইহা মুখ্যতঃ উৎসব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, কামার, কুমার, কৃষক, ছুতার, ধোবা, নাপিত, মালী, ভুঞ্জমালী, মুচি, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই নিজ মর্য্যাদা লইয়া এই জাতীয় উৎসবে যোগ দিতে

হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরগুলিকে এক অখণ্ড যোগসূত্রে বাঁধিয়া, হিন্দুজাতির সকল সম্প্রদায়ের শুভ মিলন সম্পন্ন করিয়া দুর্গোৎসব বাঙ্গালার অদ্বিতীয় উৎসব হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে সমগ্র ভারতবর্ষে এই সময়ে যে নবরাত্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও ভারতের এক মহাজাতীয় উৎসব, এবং শাক্ত সংস্কৃতি যে বাঙ্গালার ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষেও বিস্তার লাভ করিয়া আছে, ইহা তাহাই প্রমাণ করে।

শাক্ত পূজা ও উপাসনাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক। উপরে যে সকল শক্তি-পূজার উল্লেখ করা হইল, একমাত্র শ্যামাপূজা ব্যতীত আর সকলই পৌরাণিক পূজা। শ্যামাপূজা তান্ত্রিক পূজা, ইহার ব্যবস্থা পুরাণে নাই, আছে তন্ত্রে। তন্ত্র বলিতে বেদ, পুরাণ বা দর্শনশাস্ত্র ছাড়া ভিন্ন এক জাতীয় শাস্ত্র বুঝায়। ইহাতে বেদান্ত-দর্শনের অতিরিক্ত নূতন কোন দার্শনিক মত ব্যাখ্যা করা হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়কে স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার উপলব্ধির নূতন নূতন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছে। তন্ত্র শব্দের সাধারণ অর্থ শাস্ত্র হইলেও ইহা মুখ্যতঃ বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতি-যুক্ত বা বিশিষ্ট প্রক্রিয়া-যুক্ত শাস্ত্র বুঝায়। তন্ত্র হইতেছে ক্রিয়া-যোগ। আয়ুর্ব্বেদ বা জ্যোতিষশাস্ত্রের ন্যায় তন্ত্রও এক ফলিত শাস্ত্র; ইহাতে বর্ণিত প্রক্রিয়া যথাযথ প্রযুক্ত হইলে, তাহা সদ্য সদ্য ফল দেখাইবেই। তন্ত্রের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, এক,—বেদান্তের ন্যায় পরম নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভ, দ্বিতীয়,—অভ্যুদয় অর্থাৎ ঐহিক উন্নতি এবং শ্রী-লাভ। মন্ত্র, যন্ত্র এবং নানাবিধ উপায় ও উপকরণ তন্ত্রোক্ত সিদ্ধিলাভের জন্য আবশ্যক। পরমজ্ঞান লাভের জন্য তন্ত্র কেবলমাত্র শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকেই সম্বল করে না, নানা প্রকার

বাহ্য-প্রক্রিয়া ও উপায়ের সাহায্যও লইয়া থাকে। সাধারণতঃ তান্ত্রিক সাধনায় কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় করিয়া নিজ বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। পঞ্চ দেবতা ও পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের কথা পুরাণ-অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। উপাস্যদেবতা-ভেদে তন্ত্রও পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা—শাক্ততন্ত্র, শৈবতন্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র, সৌরতন্ত্র এবং গাণপত্যতন্ত্র। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র শাক্ততন্ত্রের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

শাক্ততন্ত্রসমূহ কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যা-অনুসারে বিভক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কালী, তারা ও ষোড়শী-তন্ত্রই প্রধান; অন্যান্য মহাবিদ্যার স্বতন্ত্র গ্রন্থ বড় দৃষ্ট হয় না। কালী, তারা ও ষোড়শী তন্ত্রের মধ্যেও ষোড়শী মতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ষোড়শী দেবীরই নামান্তর ত্রিপুরাসুন্দরী, ললিতা বা শ্রীবিদ্যা। কথিত আছে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর এবং আরও অনেক প্রসিদ্ধ পুরুষ শ্রীবিদ্যামতের উপাসক ছিলেন। হিন্দুর অনেক সাধনপদ্ধতি এবং আচার-অনুষ্ঠানে তন্ত্রের কিছু না কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শাক্ততন্ত্র-মতে সাধকগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়,—পশুভাবযুক্ত, বীরভাবযুক্ত ও দিব্যভাবযুক্ত। পশুর ন্যায় যাহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপুর বশ, তাহারাই পশুভাবযুক্ত বা পশু সাধক। এই ছয় রিপুর বিরুদ্ধে যাঁহারা বীর্য্যের সহিত সংগ্রাম করেন, যাঁহারা শক্তি, সাহস, বুদ্ধি ও তেজঃ-সম্পন্ন, বলিষ্ঠ-দেহ এবং নির্ভীক্-স্বভাব, তাঁহারাই তন্ত্রের বীরভাবযুক্ত সাধক বা বীর সাধক। দিব্যভাবযুক্ত বা দিব্য সাধক

দেবতা-কল্প পুরুষ, ষড়্‌রিপু জয় করিয়া তাঁহারা গুরুভক্ত, শুদ্ধচিত্ত, নিরাসক্ত, ক্ষমাবান্ এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছেন; তাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, এবং ভয়-হীন হইয়াছেন। এই তিন ভাবের সহিত কুলার্ণব-তন্ত্রে সপ্ত আচারের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার—এই সপ্ত আচার। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিন আচারে পশুভাব, মধ্যবর্ত্তী দুই আচারে বীরভাব এবং শেষ দুই আচারে দিব্যভাবের সাধনা চলে। বেদাচারে দেহশুদ্ধি ও মনঃশুদ্ধি, বৈষ্ণবাচারে ভক্তিলাভ, শৈবাচারে জ্ঞানলাভ, দক্ষিণাচারে প্রথম তিন আচারের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা, বামাচারে ভোগের বিপরীত ত্যাগ-পথে প্রবর্ত্তনা, সিদ্ধান্তাচারে ভোগ ও ত্যাগের গুণাগুণ বিচারের পর সহজ সিদ্ধান্তদ্বারা ত্যাগভূমিতে নিত্য প্রতিষ্ঠা এবং কৌলাচারে কৌল বা ব্রাহ্মী স্থিতি হয়। তন্ত্রে কুল অর্থ শক্তি বা ব্রহ্ম, 'কুল' বা শক্তি বা ব্রহ্মকে লাভ করাই—কৌল হওয়াই তান্ত্রিকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সপ্তম আচারে বা সাধন-ভূমিকায় তান্ত্রিক জীবনের মহত্তম লক্ষ্য লাভ করিয়া থাকে।

দার্শনিকমতের বিচারে শাক্ত তান্ত্রিকগণ সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদী। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র ব্রহ্ম-মন্ত্র; তাহা হইতেছে,—ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম—সৎ, চিৎ এবং এক ব্রহ্ম। তন্ত্রমতে জগৎ সৎ, অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির ন্যায় চিতি বা চৈতন্য এবং শক্তি এক, অভিন্ন। তান্ত্রিক-গণ তথাকথিত মায়াবাদে বিশ্বাসী নহেন; তাঁহারা মুক্ত দৃষ্টি লইয়া সাহসের সহিত জগদ্‌ব্যাপার নিরীক্ষণ করেন এবং মহামায়ার প্রপঞ্চ-মধ্যে বিশ্বের বিচিত্র লীলাভিনয়ে সহজভাবেই নিজ ভূমিকা গ্রহণ করেন। আনন্দময়ীর আনন্দরস বীর বা দিব্য ভাবের সিদ্ধ তান্ত্রিক নিজ জীবনে প্রতিপদক্ষেপেই আস্বাদন করিয়া থাকেন। স্ত্রীজাতিকে

তান্ত্রিক পরমাশক্তির সাক্ষাৎ মূর্তি মনে করিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তন্ত্রমতে নারী শত অপরাধ করিলেও, তাহাকে কোমল কুসুমের আঘাত দিয়াও ব্যথিত করা উচিত নয়। তান্ত্রিক কন্যাকে ব্রহ্মময়ী জ্ঞান করিয়া কুমারীপূজার অনুষ্ঠান করেন। তিনি গৃহস্থজীবনেই পরম পুরুষার্থের সাধনা করিয়া থাকেন এবং নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা করিয়া সিদ্ধি লাভও করেন।

পঞ্চতত্ত্বের সাধনা এই তন্ত্রেরই সাধনা। পঞ্চতত্ত্বের অপর নাম পঞ্চ ম-কার। মৎস্য, মাংস, মুদ্রা প্রভৃতি মন্ত্রাদিদ্বারা বিশোধিত করিয়া, তান্ত্রিক বিধি-অনুযায়ী শুদ্ধভাবে পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিয়া সাধনা করিবার কথা তন্ত্রে আছে। পঞ্চতত্ত্ব প্রয়োগের বিধিগুলি আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, সাধারণতঃ কাম-ক্রোধ-লোভাদি-যুক্ত পশুসাধকের জন্য এই ব্যবস্থা। মহাশক্তি ভগবতীর উপাসনা এই মুহূর্ত্তেই আরম্ভ করিতে হইবে, তা সাধক যে অবস্থায়ই থাকুন। বৈদিক মার্গানুযায়ী শমদমাদি সাধন করিয়া, চিত্ত নিষ্কাম ও শুদ্ধ করিয়া, পরে বেদান্তবাক্য শ্রবণ ও মনন, পরে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করিয়া অগ্রসর হইবার কথা সাধারণ স্তরের পশুসাধকগণ কখনও ভাবিতেই পারেন না। তান্ত্রিকমার্গ অনুসরণ করিয়া সমস্ত ভোগ-বাসনা লইয়াই তাহারা সাধন-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়েন। যিনি সিদ্ধ-গুরুর শাসনাধীন থাকিয়া চলিতে থাকেন, তাহার ভোগবাসনা ক্ষীণ ও চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকে; এবং তিনি ক্রমে পশুভাব হইতে বীরভাব এবং বীরভাব হইতে দিব্যভাব লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যান। কিন্তু কত সাধক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিনাশ পাইয়া থাকে, উন্মার্গ-গামিতা-বশে নিজেকে ও নিজের সমাজকেও ডুবাইয়া দেয়। তাহা ছাড়া কাপালিক ও ভৈরবোপাসক প্রভৃতি তামসপ্রকৃতির সাধকগণ নিকৃষ্টতন্ত্রের আশ্রয়

লইয়া স্তম্ভন, মারণ, উচাটন, বশীকরণ ও অন্যান্য নিকৃষ্টশক্তি ও সিদ্ধাই লাভের লোভে সমাজে যে অভিচার ও ব্যভিচারের, যে বীভৎস ও হিংস্র পাপাচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, তাহাতেই তন্ত্র নাম শুনিলে লোকের অঙ্গ আতঙ্কে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠে। বাস্তবিক এ পঞ্চ-তত্ত্বের পথ দূর হইতে পরিহার করাই শ্রেয়।

বীর সাধক বিচিত্র উপকরণ-সমূহ লইয়া বিল্বমূলে পঞ্চমুণ্ডী আসনে আসীন হইয়া, অথবা অমাবস্যার নিশীথে শ্মশানে শববক্ষে আসীন হইয়া তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সাধনা করিয়া থাকেন। যিনি পারেন, তাঁহার ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এই তিন পাশ সত্বরই ছিন্ন হয়। প্রবল বীর্য্যভাবের আশ্রয়ে একাগ্র সাধনাদ্বারা যাবতীয় প্রলোভন ও বিভীষিকা—সংস্কার-মলিন চিত্তের নানাবিধ বিপরীত সৃষ্টি জয় করিয়া, যিনি তাঁহার অন্তঃকরণ সমাহিত করিতে পারেন, অত্যল্প সময়ের মধ্যেই দীপপ্রভার সম্মুখে অন্ধকার-রাশির ন্যায় তাঁহার যুগযুগান্ত-সঞ্চিত সংস্কার-রাশি ক্ষয় পায়, তিনি দেবীর অনুগ্রহে সিদ্ধি লাভ করিয়া সত্বরই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হ'ন। বড় ভয়ঙ্কর এই সাধনা! শুধু সাহসী সাধক হইলেই চলে না, সাহসী উত্তর সাধক এবং সাহসী সিদ্ধ গুরু চাই। এই সাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কত সাধক পাগল হইয়া গিয়াছেন, প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন!

তান্ত্রিকগণ মনে করেন, আত্মার ন্যায় সমস্ত শক্তিও এই দেহতেই অধিষ্ঠিত আছেন; তাঁহারা দেহ-স্থিত ষট্চক্র, নিম্নে মূলাধার-চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তি, ষট্চক্রের ঊর্দ্ধে সহস্রার-পদ্মে শিবের অধিষ্ঠানের কথা বলিয়া থাকেন। সুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া ষট্চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে শিবের সহিত মিলিত হইলে, পরমজ্ঞান ও পরমসিদ্ধি লাভ হয়। বাস্তবিকপক্ষে ভারতবর্ষে সাধকগণের সকল সম্প্রদায়েই এই

ষট্‌চক্র-ভেদ ও শিবশক্তি-মিলনের তত্ত্ব কোন না কোন আকারে স্বীকৃত হইয়াছে। চক্রগুলি প্রকৃতপক্ষে শক্তি-বহা বিভিন্ন নাড়ীর মিলন স্থান, ঐ গুলি পদ্ম নামেও কথিত হয়; উহারা মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নানাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থিত।

তন্ত্রের সাধনায় মন্ত্রের উপযোগিতা সব চাইতে বেশি। মন্ত্রের জপে দেবীর আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন বর্ণের সংযোগে আবার মন্ত্রের সৃষ্টি হয়। তাই তাঁহারা মনে করেন, বর্ণ হইতেই শক্তি আসিয়া থাকে। এইজন্য স্বর ও ব্যঞ্জন সমুদয় বর্ণকে তান্ত্রিকগণ মাতৃকা বা ছোট মাতা বলিয়া থাকেন।

তন্ত্রের শ্রেষ্ঠমন্ত্র হংসমন্ত্র। জীবের শ্বাস-গ্রহণে 'হং' শব্দ এবং শ্বাসত্যাগে 'স' শব্দ উৎপন্ন হয় বলিয়া হংস অর্থ প্রাণবায়ু। পুনঃ পুনঃ জপ করিলেই শব্দটি 'সোঽহং' 'সোঽহং' বলিয়া মনে হইতে থাকে। 'সোঽহং' অর্থ 'সেই আমি, অর্থাৎ 'আমি সেই ব্রহ্ম'। ইহাই বেদান্তের এবং অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ সাধনা। তান্ত্রিক অদ্বৈতবাদী, এবং শেষ সাধনায় বৈদান্তিকের সহিত তান্ত্রিকের কোন পার্থক্য নাই। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে বিনা আয়াসে জপ হয় বলিয়া এই জপের নাম অজপা জপ, এবং এই মন্ত্রের নাম হইয়াছে অজপা মন্ত্র। 'হংস' বা 'সোঽহং' মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাহা ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া 'ওম্' বা প্রণবমন্ত্রে পরিণত হয়।

গুরুর নিকট হইতে উপযুক্ত দীক্ষা ভিন্ন তন্ত্রের সাধনা কদাচ সম্ভবপর হয় না। উপযুক্ত গুরুর অভাবে তন্ত্রোপাসনা এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে।

হিন্দুসংস্কৃতিতে শাক্ত ও তান্ত্রিকের শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকে, মাতৃভাবে উপাসনা। ব্রহ্মকে তাঁহারা বলেন ব্রহ্মময়ী। ব্রহ্মময়ী জগদীশ্বরী জগজ্জননী; তিনি তোমার, আমার, প্রত্যেক

জীবের জননী, তিনিই আবার সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারিণী, দুর্গা, শ্যামা, শিবা, কালী। শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তোত্র কয়টিতে দেবীর মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধকগণ মহামেঘ-প্রভা, প্রলয়-রসিকা, করালবদনা, মুণ্ডমালিনী কালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও তাঁহার প্রসন্ন মাতৃমূর্ত্তিই দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার দুই করে খড়্গ ও সদ্যশ্ছিন্নমুণ্ড থাকিলেও অপর দুই করের বর ও অভয় মুদ্রা তাহাদিগকে শান্তি ও অভয় দান করে। রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ-দেব 'মা' 'মা' বলিয়া সাধনা করিয়া কালীর ভয়ঙ্করীত্বের মুখোস খসাইয়া বাঙ্গালাদেশময় ভক্তির বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন।

এই শাক্তসঙ্গীত-মালা বৈষ্ণবসঙ্গীত অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প হইলেও সৌন্দর্য্যে ও ভাব-গভীরতায় অল্প নহে। জগজ্জননী উমাকে কন্যা কল্পনা করিয়া শারদীয় দুর্গাপূজার আগে ও পরে আগমনী ও বিজয়া গানে বাঙ্গালার মায়েদের বাৎসল্যরস অপূর্ব্ব বেদনায় প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালার ভক্তিসঙ্গীতে শ্যামাসঙ্গীতের ন্যায় মর্ম্মতলে প্রবেশ করে আর কোন্ সঙ্গীত? মা, মা, মা! সন্তানের আর মায়ের সম্পর্ক! ইহা অপেক্ষা হিন্দুর দৃষ্টিতে নিকট সম্পর্ক আর কি হইতে পারে? রামপ্রসাদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রসাদী সুরে অভিমান-ভরে গাহিয়াছিলেন,—

মা শব্দ মমতাযুত কাঁদলে কোলে করে সুত;
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,
আমি কি মা ছাড়া জগত?

না, আমি জগৎ ছাড়া নই, মাও জগৎ ছাড়া ন'ন। সন্তান ও মা, মা ও সন্তান, সন্তানকে মা কোলে লইবেন নিশ্চয়।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শ্রীগৌরাঙ্গ

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ-পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥

—জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির! তাহার নয়ন দু'টি যেন জলবর্ষী মেঘ, সে নয়নের ধারা আর ফুরায় না! অখিলরসামৃতসিন্ধু, অখিল-রূপগুণাধার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের নব নব রূপ, নব নব গুণের আস্বাদনে মধুপানে মাতাল ভ্রমরের ন্যায় সে বিভোর। রূপ তাহার চাই, আঁখি মজিবে কাঁহাকে লইয়া, হৃদয় তৃপ্ত হইবে কাঁহার স্পর্শ পাইয়া? গুণ তাহার চাই, মন ডুবিবে কাঁহার চিন্তন করিয়া? অরূপ ও নির্গুণ বৈষ্ণবের ঈশ্বর নহেন। বৈষ্ণব চাহেন নিত্য শরীর, নিত্য বৃন্দাবন, নিত্য রূপ আর নিত্য লীলা। নিত্য শরীর লাভ করিয়া নিত্য বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপের নিত্য লীলার নিত্য সহায়তা করিবেন বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের চোখে রূপ আর খসে না, বৈষ্ণবের হৃদয়ে ভাব আর অবধি পায় না। সিদ্ধ তান্ত্রিক কিন্তু "তারা আমার নিরাকারা" বলিয়া দ্বৈতভাব-হীন চিত্তে রূপাতীতের ধ্যানে তুষারখণ্ডের ন্যায় মহাসমুদ্রে বিগলিত হইয়া মহাসমুদ্র হইয়া যান। নৃত্য, গীত বা অশ্রুপাতের প্রবলতা সেখানে থাকে না, নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় তাহার আনন্দময় বোধিচিত্ত থাকে স্থির প্রভাশীল।

বৈষ্ণবকে বুঝিতে হইলে তান্ত্রিককে স্মরণ করিতে হইবে। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির লোক সকলের জন্যই কল্পিত

হইয়াছিল ! কার্ত্তিকী অমাবস্যার নিস্তব্ধ নিশীথে উপাসনারত তান্ত্রিকের সম্মুখে শবাকার শিবের বক্ষে নীলবিদ্যুতের মত স্ফুরিত হয় মহামেঘপ্রভা দিগম্বরা করালবদনা কালী। আর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনীতে বৈষ্ণব তাহার নয়ন ভরিয়া দেখেন সুকেশা, সুবেশা গোপবালাদের সহিত মদনমোহন কিশোর কৃষ্ণের অপূর্ব্ব রাসরসোৎসব ! শাক্তের দেবতা স্ত্রী, শিব তাঁহার সঙ্গী ; বৈষ্ণবের দেবতা পুরুষ, লক্ষ্মী বা রাধাঠাকুরাণী তাঁহার সঙ্গিনী। শাক্তের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি মাতৃ-ভাব, বৈষ্ণবের প্রধান ভাব কান্তভাব, মধুর ভাব। শাক্ত জীব বলি দিয়া ইষ্টদেবতাকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, মৎস্যমাংসাদিতে তাহার বিদ্বেষ নাই। বৈষ্ণব বিনয়ী, দীনতার প্রতিমূর্ত্তি, জীবের ক্লেশ তাহার সহ্য হয় না, শুদ্ধ সাত্ত্বিক আচারে তিনি জীবনচর্য্যা পালন করেন। গৃহধর্ম্মে তান্ত্রিকের আপত্তি নাই, বৈষ্ণব গৃহধর্ম্ম অপেক্ষা বৈরাগীর ধর্ম্মেই অধিক আকৃষ্ট। শাক্তের নিকট পবিত্র জবাফুল আর বিল্বপত্র, বৈষ্ণবের প্রিয় বনফুল আর তুলসীপত্র। শাক্তের কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, শিরে জটাভার, ললাটে সিন্দূরের ফোঁটা ; বৈষ্ণবের কণ্ঠে তুলসীমালা, শীর্ষ মুণ্ডিত, ললাটে চন্দনের অলকাতিলক। কিন্তু উভয়ের মানব-প্রেম অসাধারণ, উভয়েরই সর্ব্বভূতে সমদর্শন। আর্য্যসাধনা-সংস্কৃতি যদি হিমালয়ের চিরতুহিনাবৃত মুকুট-ভূমি হয়, তাহা হইলে শাক্ত সাধনতন্ত্র যেন মহানদ ব্রহ্মপুত্র বামভাগ হইতে দুর্বারবেগে বিপুল তরঙ্গরাশি লইয়া বহির্গত হইয়াছে ; আর দক্ষিণভাগ হইতে তেমনি দুঃসহবেগে উচ্ছল উর্ম্মিমালা লইয়া ছুটিয়াছে মহানদ সিন্ধু—বৈষ্ণব-সাধনতন্ত্র। উভয়ই ভারতবর্ষের প্রাণভূমি প্লাবিত করিয়া, তাহাকে সরস ও শ্যামল করিয়া মহাসাগরের অসীম অম্বুরাশিতে নিঃশেষে নিলীন হইয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণবসাধনা সরস ভক্তির সাধনা। বৈদান্তিকের নেতি নেতি বিচার, জ্ঞানীর শুষ্কতর্ক বা তান্ত্রিকের ক্রিয়াযোগ সেখানে কোন কাজে লাগে না। বৈষ্ণব বলেন,—

অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

[শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৮ম পরিচ্ছেদ]

জ্ঞান বৈষ্ণবের নিকটে নিম্বফল, জ্ঞানী একান্ত অভাগ্য। ধন্য বৈষ্ণব যিনি রসজ্ঞ কোকিল, সদা প্রেমাম্রমুকুলের অমৃত পান করেন, পান করিয়া ভাবাবেশে সর্ব্বদা নৃত্য, গীত ও রোদন করেন! বৈষ্ণব স্পষ্ট বলেন,—তর্ক করিও না, বিশ্বাস কর,

—"বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহু দূর।"

বৈষ্ণব সাধনা রসের সাধনা বা ভাবের সাধনা। যেমন বিচার করিয়া ও ধ্যান করিয়া, অথবা বিচিত্র ক্রিয়াযোগের সহায়তায় একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হইলে অজ্ঞান বিদূরিত হয় এবং পরম জ্ঞান ও পরম আনন্দ প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনই হৃদয়ের বৃত্তির চর্চ্চায় রস বা ভাব-বিশেষের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে তদ্ভাব-ভাবিত হইলে যে অপূর্ব্ব তন্ময়তা আসে, তাহা হইতে রসস্বরূপের রসাস্বাদন চলিতে থাকে। ভাবে বিভোর হইয়া বৈষ্ণবের অশ্রুপাত হয়, রোমাঞ্চ জাগে, স্বেদোদ্গম ও কম্প হইতে থাকে, কখনও বা স্তব্ধতা আসে, স্বরভঙ্গ হয়, দেহের বিবর্ণতা দেখা যায় এবং শেষে মূর্চ্ছা বা সমাধিও হইয়া থাকে। এই আটটিকে বৈষ্ণবগণ অষ্ট

সাত্ত্বিকভাব বলিয়াছেন। ভাব-সাধনার সার্থকতা এই ভাব-লক্ষণ-গুলির প্রকাশে।

বৈষ্ণব-সাধনার আসল কথা হইল রস-তত্ত্ব। ভক্তি জন্মিবে, প্রেমের স্ফুরণ হইবে, তবে রসের সাধনা আরম্ভ হইবে। পূজ্যজনে অনুরাগের নাম ভক্তি। শাস্ত্রকারগণ ভক্তিকে বলিয়াছেন নব-লক্ষণা; নয়টি লক্ষণ হইতেছে,—(১) বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, (২) বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন, (৩) বিষ্ণুর স্মরণ, (৪) বিষ্ণুর পাদসেবন বা পরিচর্য্যা, (৫) বিষ্ণুর অর্চ্চন, (৬) বিষ্ণুর বন্দন বা প্রণাম, (৭) বিষ্ণুর প্রতি দাস্যভাব, (৮) বিষ্ণুর প্রতি সখ্যভাব, (৯) বিষ্ণুর চরণে আত্ম-নিবেদন বা সর্ব্বস্বনিবেদন। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয়টি সাধারণ ভক্তির পরিচায়ক, শেষের তিনটি প্রেমমিশ্র ভক্তির পরিচায়ক। চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে কাম ও প্রেমের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া প্রেমের এক অপরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে,—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥

[চৈতন্যচরিতামৃত, ১-৪]

পরে আবার বলা হইয়াছে,—

কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

যাহার উদ্দেশ্য কেবল নিজ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি বা নিজ সম্ভোগ, তাহাই কাম, তাহা স্বার্থপূর্ণ; তাই তাহা অতি নিকৃষ্ট। যাহার উদ্দেশ্য

কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিতৃপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের সুখ, তাহাই প্রেম, তাহা নিঃস্বার্থ, অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাম ও প্রেম উভয়ের ব্যবধান অনেক, উভয়ে যেন লৌহ আর স্বর্ণ, অথবা নির্ম্মল সূর্য্য আর ঘনান্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধধর্ম্মী।

এই প্রেম যখন ভক্তির সহিত মিলিত হয়, যখন হয় রায় রামানন্দ-কথিত 'প্রেমভক্তি', তখন তাহাতে প্রথম রসের উদয় হয়, তাহার নাম হয় শান্তরস। এখান হইতে বৈষ্ণব রসসাধনার আরম্ভ।

বৈষ্ণবগণের ভক্তিরস পাঁচ প্রকার,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর বা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রস। রস, প্রেম, অনুরাগ এস্থলে একার্থবাচক শব্দ। প্রত্যেকটি রসেরই স্থায়ী ভাব থাকে। ভক্তিরসেরও স্থায়ী ভাব আছে, তাহার নাম রতি। রতিও পাঁচ প্রকার ;—শান্তদাস্যাদির ভেদে যথাক্রমে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং মধুর বা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রতি। কানুছাড়া বৈষ্ণবগণের গীত নাই, কাজেই বৈষ্ণব-রসের সাধারণ অবলম্বন সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ।

শান্তরসের প্রধান গুণ শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা যত বাড়ে, বিষয়বাসনা ততই ক্ষীণ হয় ; বিষয়বাসনা যত ক্ষীণ হয়, নিষ্ঠাও ততই বাড়ে। শান্তরসে ঈশ্বরে অপূর্ব্ব মমতা-বুদ্ধি জন্মে না ; তিনি পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম বলিয়া ঈশ্বরের মহৈশ্বর্য্য ও মহাশক্তির জ্ঞান হইতে থাকে। শান্তরতিকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণে যে নিষ্ঠা, তাহাই সনকাদিমুনিগণে শান্তরসে পরিণত হইয়াছে।

দাস্যের প্রধান গুণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা, শান্তরসের গুণ শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা উহার অন্তর্ভুক্তই থাকে। ভগবান্ প্রভু, আমি তাঁহার সেবক, দাস—উদ্ধবাদি ভক্তগণের এই বুদ্ধিই দাস্যরসে কিঞ্চিৎ মমতা-বুদ্ধির সঞ্চার

করে। এখানেও ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যশালী এবং শক্তিমান্ বলিয়া ভক্ত তাঁহাকে সম্ভ্রম করেন ও গৌরব দেখান; ঈশ্বরের মাধুর্য্যমূর্ত্তি প্রায় আচ্ছন্ন থাকে।

সখ্যরসের প্রধান গুণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিঃসঙ্কোচ নিঃসম্ভ্রম ভাব; আগের শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা ও তাঁহার সেবা এই দুইটি গুণ লইয়া এই রসের তিন গুণ। ভগবান্ ও ভক্ত যেন দুই সখা, যেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদাম-সুদাম, তাঁহারা পরস্পরকে আত্মসম জ্ঞান করেন, একত্র খেলা করেন, আহার করেন, নৃত্য গীত কোলাকুলি করেন, আবার প্রেমের কলহও করেন। এখানেই প্রকৃত মমতা-বুদ্ধির আরম্ভ। এখানে ভক্তের নিকটে কৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি খসাইয়া কেবল মাধুর্য্যমূর্ত্তিতেই প্রকাশ পাইতেছেন।

বাৎসল্যরসের প্রধান গুণ শ্রীকৃষ্ণে মমতাধিক্য। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা, সেবা এবং নিঃসম্ভ্রমবুদ্ধি—আগের এই তিনটি গুণ লইয়া এই রসের মোট গুণ চারিটি। এই রসে ভগবান্ হ'ন নন্দের দুলাল, যশোদার গোপাল। ভক্তের আদর, যত্ন, স্নেহ না হইলে যেন ভগবান্ মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারেন না। ভগবান্ ভক্তের উপর নির্ভরশীল, যেন তাহার অবোধ সন্তান। এই রসে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধির লেশও থাকে না, তাই মমতাধিক্য বা পরিপূর্ণ মায়ের মমতা জন্মে।

পঞ্চমরস হইতেছে উজ্জ্বল বা মধুর রস, ইহার শ্রেষ্ঠ গুণ ব্রজ-গোপিকা বা রাধিকার ন্যায় স্বাঙ্গ-সঙ্গ-দান বা অখণ্ড আত্মসমর্পণ। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা, সেবা, নিঃসম্ভ্রমভাব এবং মমতাধিক্য এই চারিটি গুণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে আত্মসমর্পণ গুণে। এই রসের তাই পঞ্চগুণ। এখানেই এই কান্তা-প্রেমেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এই উজ্জ্বলরসের আবার পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি নানা

ভাগ বা অবস্থা আছে। দিব্য প্রেমের নিবিড়তম উপলব্ধি বুঝাইবার জন্য প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য কোন দেশেরই প্রাচীন বা আধুনিক রসজ্ঞগণ নায়ক-নায়িকার মিলনকে প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ না করিয়া পারেন নাই।

কিন্তু সে কোন্ কান্তার প্রেম যাহা সাধ্যশিরোমণি?—সে যে রাধিকার প্রেম। যিনি একূল, ওকূল, দুকূল, গোকুল ভাসাইয়া দিয়া, লৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হইয়া, শুদ্ধ অনুরাগবশে তিমিরদুর্য্যোগের মধ্যেও বজ্র-বিদ্যুৎ মাথায় করিয়া মদনমোহন বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্প-শঙ্কিল পথে বাহির হইয়াছেন, যে আরাধিকার সহিত মিলিত হইবার জন্য নিখিলচিত্ত-আকর্ষণ-কারী নবীন কিশোর কৃষ্ণও সেই পথে অভিসার করিয়াছেন, তিনিই সেই অপূর্ব্ব প্রেমের সাধিকা রাধিকা। ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির আনন্দাংশের নাম নাকি হ্লাদিনী, হ্লাদিনীর সার অংশের নাম নাকি প্রেম, প্রেমের পরমসারের নাম মহাভাব, এবং 'সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী'। তিনি কারুণ্য, তারুণ্য ও লাবণ্যামৃতের ত্রি-ধারায় স্নান করিয়া নিজ লজ্জারূপ নীল দুকূল পরিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের অরুণ-উত্তরীয় করিয়াছেন শ্রী-অঙ্গের আচ্ছাদন।

এই রস-তত্ত্ব এবং রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্বই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ-কালে গোদাবরীতীরে নিভৃত-মিলনে রায় রামানন্দের মুখে শ্রীচৈতন্যদেব ইহা শুনিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। চৈতন্য দেব হয়তো নিজ মনোভাবের নিবেদনই শুনিয়াছিলেন। সে তো শঙ্কর-মণ্ডনের বিচার ছিলনা, সে তো ঠিক গুরু-শিষ্যের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছিলনা, সে ছিল পরম রসিকে পরম রসিকে রস-পরিচয়। চৈতন্যদেব পরে এই দুই তত্ত্ব প্রয়াগে রূপগোস্বামীকে এবং কাশীতে সনাতন গোস্বামীকে দান করেন। সুপণ্ডিত গোস্বামী ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায়ই

ইহা পরবর্ত্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রায় রামানন্দ এই গূঢ়তত্ত্ব নিজ দেশের বৈষ্ণব আচার্য্যগণের সকাশ হইতেই পাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার জন্মের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও দক্ষিণভারতের ভক্ত আলোয়ারগণের মধ্যে এই রসতত্ত্বের সাধনা সুপ্রচলিত ছিল। বাঙ্গালাদেশেও জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গানে এবং মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরীর সাধনে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সঞ্জীবিত ছিল।

এক অপূর্ব্ব ভক্তি-কল্পবৃক্ষের মহাস্কন্ধ শ্রীচৈতন্যদেব। ঐ বৃক্ষের মূল শ্রীমাধবেন্দ্রপুরি, অঙ্কুর শ্রীঈশ্বরপুরি, দুই মহাশাখা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং শ্রীনিত্যানন্দঠাকুর, এই দুই মহাশাখার অগণিত শাখা ও উপশাখা বাঙ্গালাদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে বাঙ্গালার বরেণ্য পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপধামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সুপণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী তাঁহাদের এই দুরন্ত সন্তানটিকে প্রথমে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ লেখাপড়া শিখিয়া ষোল বৎসর বয়সেই সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, নিমাই তাঁহাদের মূর্খ হইয়াই ঘরে থাকুক। কিন্তু নিমাই এর উৎকট দুরন্তপনায় অস্থির হইয়া নিমাই এর ইচ্ছানুসারে তাহাকে পড়িতে দিতে লইল। নিমাই এর দ্বাদশবর্ষ বয়সে জগন্নাথ নিশ্র ইহলোক ত্যাগ করিলেন। নিমাই অদ্ভুত অভিনিবেশ-সহকারে লেখাপড়া শিখিয়া নবদ্বীপের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, নিজে টোল স্থাপনা করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন, লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিলেন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মীরীকে জয় করিলেন, তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হইল, পুনরায় দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন, তখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র।

সে সময়কার নবদ্বীপে ভক্তি ও প্রেম ছাড়া সকলই ছিল। বিদ্যার গৌরবে নবদ্বীপ তখন ভারতবর্ষে প্রায় অদ্বিতীয়। মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রৌঢ় বয়সে বিবিধ শাস্ত্রের পাঠ দিতেছেন। প্রতিভার চারি নব ভাস্কর নৈয়ায়িকশিরোমণি রঘুনাথ, স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ এবং ভক্তিপ্রেমনিধি গৌরাঙ্গদেব উদিত হইয়াছেন ; শীঘ্রই তাঁহাদের জ্যোতি নিজ নিজ গগন-কক্ষায় যুগপ্রবর্ত্তনা করিবে। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব রূপে, গুণে ও বিদ্যায় অতুলনীয় ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সেই দিব্য ভাগবতশক্তি, যাহা যুগেযুগে ধর্ম্মান্ধতায় ও ধর্ম্মহীনতায় পীড়িত ভারতভূমিতে আর্ত্ত ভক্তজনগণের ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ধর্ম্মের শুদ্ধ আলোকবর্ত্তি হস্তে আবির্ভূত হ'ন। নবদ্বীপে চলিয়াছে শুষ্ক তর্ক ও ভক্তি-হীন বিচার। শোণিত-সুরায় আর্দ্র পূজাস্থলীতে উঠিতেছে তান্ত্রিকের ভয়াল চিৎকার, উঠিতেছে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরীর গান। বৈষ্ণবগণ বলেন, অদ্বৈতাচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণের স-হুঙ্কার আহ্বানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বাইশবৎসর বয়সে পিতৃপিণ্ডদান করিতে গয়াধামে গিয়া গৌরাঙ্গদেবের নয়ন হইতে বিষ্ণু-পাদপদ্ম-দর্শনে সেই যে প্রেম-মন্দাকিনীর অশ্রু-উৎস উৎসারিত হইল, এই দেহ থাকিতে আর তো তাহা থামিল না, তাহার বেগ দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। ইহার পর পরম ভাগবত ঈশ্বরপুরির নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করিয়া গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণ-প্রেমে একেবারে পাগল হইয়া গেলেন। ঈশ্বর-পুরির গুরু মাধবেন্দ্র-পুরি, আকাশে মেঘ দর্শন করিলেই তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণ-প্রেমের স্ফুরণ হইত। গৃহে ফিরিয়া তিনি কাঁদিয়া কাঁদাইয়া, নাচিয়া নাচাইয়া, শ্রীবাসের

আঙ্গিনায় কৃষ্ণপ্রেমের তরঙ্গ তুলিয়া, অপূর্ব্ব কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। টোল বন্ধ হইয়া গেল; গ্রন্থে শেষ ডোর বাঁধিবার সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যগণ সঙ্গে নাম-কীর্ত্তন গাহিলেন,—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
(যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ।)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

ক্রমে মহাভক্ত নিত্যানন্দ আসিয়া মিলিত হইলেন। অদ্বৈত আচার্য্য আগেই আসিয়াছিলেন। শেষে আসিলেন যবন হরিদাস, যিনি কাজির শাসনে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত খাইয়াও প্রহ্লাদের ন্যায় হরিনামে অপূর্ব্ব রুচির পরিচয় দিয়াছিলেন। গদাধর, মুরারি, নরহরি, দামোদর আরও কত ভক্ত আসিয়া তেইশ বৎসরের যুবকের পার্শ্বে মিলিত হইলেন। নগর-কীর্ত্তনে নদীয়া টলমল করিয়া উঠিল। ইহার পর যে প্রেমের বন্যা উঠিল, তাহাতে শান্তিপুর ডুবিয়া গেল, নদীয়া ভাসিয়া গেল, তরঙ্গে তরঙ্গে বাঙ্গালাদেশ আন্দোলিত হইতে লাগিল। জগাই মাধাই এর ন্যায় মহাপাতকী বৈষ্ণবপ্রেমে উদ্ধার হইয়া গেল। কিন্তু নিন্দুকের রসনা অলস রহিল না। ঘরে যুবতী স্ত্রী, কত লোক-মান, যশ, সে আবার কেমন হরিভক্তি প্রচার করে! পণ্ডিতগণও এই সমালোচনায় যোগ দিলেন। অন্তরে ও বাহিরে ত্যাগব্রতী পুরুষের মুখে প্রচারিত না হইলে কোন আদর্শই এদেশের লোকসমাজে মর্য্যাদা পায় না। সর্ব্বস্ব-ত্যাগীর সহিতই হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার যোগ হইতে পারে। গৌরাঙ্গদেব তাই বিশ্বজন যাহাতে অবাধে অকাতরে তাঁহার হরিনামামৃত পান করিতে পারেন, সেইজন্য একদিন গভীর রজনীযোগে প্রিয়তমা যুবতী পত্নী এবং পূজ্যতমা বৃদ্ধা জননী, আর প্রিয় ভগীরথী ও প্রিয় নবদ্বীপ ত্যাগ

করিয়া গৃহের বাহির হইলেন। এ যেন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বুদ্ধদেবের জীবন-লীলা! কিন্তু সে ছিল তত্ত্বান্বেষণের নিমিত্ত সন্ন্যাস, আর এ তত্ত্ব প্রচারের নিমিত্ত সন্ন্যাস। গৌরাঙ্গের তত্ত্ব প্রেম-তত্ত্ব। গৌরাঙ্গের বয়স তখন ২৪ বৎসর। ভাগীরথী পার হইয়াই তিনি কেশব ভারতীর নিকট শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন; এই সময় হইতে তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নদের নিমাই আর নাই!

তাহার পর ছয় বৎসরকাল শ্রীচৈতন্যদেব পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিলেন। এই সময়েই তিনি কাশীধামে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে স্বমতে আনয়ন করেন; গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের অমাত্য, সংসার-বিরাগী রূপ ও সনাতনকে প্রয়াগ ও বারাণসীক্ষেত্রে তাঁহার আশ্রয় দান করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম পূর্ব্বেই পুরীধামে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়েই গোদাবরী-তীরে রায় রামানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং রসতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল। ৪৮ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়। শেষ আঠার বৎসর তিনি কেবলমাত্র পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র পুরীধামেই অবস্থিত ছিলেন; তাঁহাকে বলা হইত জগন্নাথের সচল বিগ্রহ। দেশবিদেশ হইতে ভক্তিরস-পিপাসু সাধকগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া চরিতার্থ হইয়া যাইতেন। শেষ দ্বাদশ বৎসর তিনি পুরীধামেও বহির হইতেন না, স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ সঙ্গে গম্ভীরায় রাধাভাবে ভাবিত হইয়া প্রধানতঃ অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-বিরহ লীলা আস্বাদন করিতেন। ইহাই তাঁহার অন্তরঙ্গ-সঙ্গে প্রেম আস্বাদন।

পরম বিনয় ও দীনতার সহিত শ্রীচৈতন্য নাম প্রচার করিতেন। চৈতন্যদেব বলিতেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—তৃণ হইতেও সুনীচ হইয়া, তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, নিজের মান ত্যাগ করিয়া এবং অপরের মান বাড়াইয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিবে। এইরূপ নম্রতার সহিত প্রচারিত হওয়ায়, বিশেষতঃ ভগবানের রস, রূপ, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও প্রেমের কথা প্রচারিত হওয়ায় এবং কেবলমাত্র নাম-সাধনাই মুখ্য সাধনা বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম সহজেই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিল। চৈতন্যদেবের চরিত্রে বিনয়ের সহিত কঠোরতার এবং প্রেমের সহিত বৈরাগ্যের বিচিত্র মিশ্রণ হইয়াছিল। সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য শিখি মাহিতির ভগিনী প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী মাধবীদেবীর নিকটে ভিক্ষা করার অপরাধে তিনি ছোট হরিদাসকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে আর মার্জ্জনা করেন নাই। গভীর দুঃখে ছোট হরিদাস প্রয়াগে সঙ্গমস্থলে নিজ দেহ বিনষ্ট করেন।

বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার মিলিত মূর্ত্তি। তাঁহার অন্তরে রাধিকার ভাবোল্লাস, বাহিরে রাধিকার বর্ণ-দ্যুতি; অন্তরে ও বাহিরে মন ও শরীরের অবশিষ্ট সত্তা তাঁহার কৃষ্ণময়। তাঁহার এই রূপ রাধা হইয়া কৃষ্ণকে আস্বাদন করিবার জন্যই; গম্ভীরায় শেষ দ্বাদশবর্ষ তিনি কেবল তাহাই করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশ,—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।
হরিভক্তি-বিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

—হরিভক্তি থাকিলে চণ্ডালও দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হয়, হরিভক্তি-শূন্য হইলে দ্বিজও চণ্ডালাধম বলিয়া নিন্দিত হয়। হরিভক্তিই মনুষ্যত্বের মান নির্ণয় করে।

এই হরিভক্তি নির্ব্বিচারে ঘরে ঘরে বিলাইয়া, সর্ব্বজীবে সমান ভাবে প্রেম ও মৈত্রী বিতরণ করিয়া, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মকে বলিষ্ঠ হস্তে সংগঠন ও মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন ভক্তিবৃক্ষের চৈতন্য-স্কন্ধের মহাশাখা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। বীরভূমে একচক্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়; বাল্যে ১০ বৎসর বয়সে এক সন্ন্যাসী মাতাপিতার কাছ হইতে তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া লইয়া পথে বাহির করেন; ২০ বৎসর কাল সন্ন্যাস জীবন যাপন করিয়া নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-দর্শনে তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এই নিত্যানন্দই ললাটে কলসীর কানায় আহত হইয়াও ক্ষমা-পূর্ণ প্রীতি-স্নিগ্ধ বক্ষে জগাই-মাধাইকে প্রেম-কোল দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের যে গান গাহিয়া আজিও বৈরাগীর দল দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করে, তাহাতেই তাঁহার আসল রূপের পরিচয় মিলে। গানটি বড়ই সহজ ও সুন্দর।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥
পতিত অধম জনের ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিতেছে বিলাইয়া॥
হরি বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোনার পর্ব্বত নিতাই ধূলাতে লুটায়॥

সত্যই পতিত অধম জনের ঘরে ঘরে গিয়া যিনি দুর্লভ হরিনাম

বিতরণ করিয়াছেন, তিনি অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। তখন বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসন চলিতেছিল, রাজশক্তির আশ্রয়ে ইসলাম ধর্ম্ম বাঙ্গালায় প্রচারিত হইতেছিল। নীতিভ্রষ্ট, পতিত বৌদ্ধগণ হিন্দু-সমাজের অবজ্ঞা ও অবহেলার ফলে দলে দলে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্যত্বের অধিকার লাভ করিতেছিল। নিত্যানন্দ প্রভু সহসা প্রেম-ভরে তাহাদিগকে কোল দিলেন, বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সংযম ও সদাচারের গণ্ডীর মধ্যে ফিরাইয়া আনিলেন। কত সাহা, কত শুঁড়ী, কত নেড়া নেড়ী বৈষ্ণব হইয়া গেল। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, বাঙ্গালী হিন্দুর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, অনুন্নত কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়, নমঃশূদ্র প্রভৃতি বাঙ্গালার বলিষ্ঠ সম্প্রদায় সকলই বৈষ্ণব, তাহাদের সকলেই গৌরাঙ্গ-ভক্ত ও নিত্যানন্দ-ভক্ত। কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অধিকাংশ শাক্ত। তাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলিকে বাদ দিলে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা একান্ত তুচ্ছ, নগণ্য হইয়া যাইবে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের নিকটে এইজন্য বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ অশেষ ঋণে ঋণী। সমাজ-গঠনে বৌদ্ধধর্ম্মের উদারতা, সাম্যভাব, মৈত্রী ও প্রেম সকল গুণই বৈষ্ণব আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন-রূপ গণ-উপাসনা এবং মহোৎসব-রূপ সমবেত পানভোজন দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্ম ও জাতির সৌভ্রাত্র-বন্ধন দৃঢ় করিতেছিলেন। শিক্ষিত বর্ণহিন্দুগণের শ্রদ্ধাপূর্ণ সমর্থন পাইলে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস আজ হয়তো অন্যপ্রকারে লিখিত হইত। নিত্যানন্দদেব বিবাহ করিয়া খড়দহে অবস্থিতি করেন। তাঁহার যোগ্য পুত্র বীরভদ্র ঠাকুরও পিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজ সংগঠন ও সংপ্রসার করিয়া গিয়াছেন। নিত্যানন্দের দেহ-

ত্যাগের পর তাঁহার পত্নী জাহ্নবীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ন্যায় বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব রূপ, সনাতন ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামীর সহায়তায় জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থা হইতে বৃন্দাবনের উদ্ধার সাধন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি-স্বরূপ বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করান। বৃন্দাবন কালে বৈষ্ণবধর্ম্মের ভারতবর্ষীয় কেন্দ্র হইয়া উঠে। চৈতন্যদেব স্বয়ং নীলাচলধামে অবস্থান করিয়া বাঙ্গালাদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করেন। বৃন্দাবন ও পুরী উভয় স্থানই কালে বাঙ্গালী-প্রধান বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হয়।

তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে আচার্য্য শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দদাস ও নরোত্তম-দাসের অভ্যুদয় হয়, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম আবার নববল লাভ করে। এই সময়েই বৃন্দাবন-বাসী কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থ-রত্ন বৈষ্ণবদের বেদ বা বাইবেল-স্বরূপ।

আমাদের জীবনে বৈষ্ণবপ্রভাব বড় অল্প নয়। হরি-সঙ্কীর্ত্তন, হরিরলুট, রাসোৎসব, দোলোৎসব এবং রথযাত্রা-উৎসবেও তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য অসীম পুষ্টি লাভ করিয়াছে। মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই বৈষ্ণব সাহিত্য, তাহার গৌরব আমরা বিশ্বসাহিত্যসভায়ও অসঙ্কোচে করিতে পারি। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি মহাজনগণের পদাবলীর কি তুলনা আছে? তাঁহারা প্রত্যেকেই বাঙ্গালা সাহিত্য-কুঞ্জের সিদ্ধ-কণ্ঠ কোকিল। চৈতন্যচন্দ্র, তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তগণকে অবলম্বন করিয়া কত অপূর্ব্ব জীবনী-কাব্যও রচিত

হইয়াছে। তাহারই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত একাধারে জীবনী, দর্শন ও কাব্য।

কিন্তু ছদ্মবেশী বিকৃত সহজ-পন্থী বৌদ্ধগণ নিত্যানন্দের উদারতার সুযোগ লইয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রবেশ করে। তাহারা ভিক্ষার ও সামাজিক পরিচয়ের প্রয়োজনে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের নাম লইয়া ভিতরে ভিতরে কালক্রমাগত সংযম-হীন ব্যভিচার-বহুল অবৈষ্ণব আচার-রূপ গুপ্ত ব্যাধি দ্বারা সমাজ দেহকে ক্ষয় করিতে থাকে। ইহারাই বৈরাগী ও বৈরাগিণী নামে পরিচিত, ইহাদের সংশ্রবের জন্যই গৌরাঙ্গদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দনীয় ও অবজ্ঞাস্পদ হয়। যে ধর্ম্ম প্রধানতঃ হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চা করিয়া ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা বাঁচিতে চাহে, প্রাচীনকালের বিচারশীল ধীর প্রজ্ঞা এবং যুক্তি-সিদ্ধ পন্থার পরিবর্ত্তে সরল বিশ্বাসকেই প্রধান করিয়া লয়, সে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের অভাব হইলে বিকৃত ও দুর্ব্বল হইবেই। রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র মধুর লীলার সাহায্যে যেখানে উপাসনা, সেখানে বিকার ও ব্যভিচার আসা অতি সহজ ও স্বাভাবিক। হইয়াছেও তাহাই। ইহার পরবর্ত্তী যুগেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে আবার উপনিষৎ ও বেদান্তের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সে গৌরবের দিন আর ফিরিয়া আসিল না।

ব্রাহ্ম সমাজ

রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর শক্তি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পরাজয় ঘটে। পরাজয় কেবল বাঙ্গালীর রাষ্ট্র-শক্তির নয়, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির, বাঙ্গালীর সমগ্র জীবনেরই পরাজয়। সেই পরাজয়-মুহূর্ত্ত হইতে ইংরেজ শাসনশক্তি, পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালাদেশ এবং ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে। ইংরেজ শাসনশক্তি বাঙ্গালীর জাতীয় স্বাধীনতা এবং নৈতিক বল হরণ করিয়া তাহাকে আত্মশক্তিতে আস্থাহীন করে; পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও চিন্তাজগতের মানসিক মুক্তি দান করিয়া প্রাণ-ধর্ম্মের প্রাচুর্য্যে তাহাকে অভিভূত করে; এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম একটি সার্ব্বভৌম সরল বিশ্বাস ও সামাজিক সমানাধিকারের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে পর্য্যুদস্ত ও রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে চায়। এই তিন একত্র হইয়া বাঙ্গালীকে করিতে চায় অবাঙ্গালী এবং ভারতীয়কে অভারতীয়। ভারতবর্ষের জীবন-বৃক্ষের দৃশ্যমান যাহা কিছু—কাণ্ড, শাখা, পল্লব সকলই পরিবর্ত্তিত হইবে, কেবল সে বৃক্ষ ভারতবর্ষের ভূমি হইতে রস আহরণ করিতে থাকিবে! ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাস্তবিকই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ একদল প্রতিভাশালী যুবক প্রবল ভাবাবেগের বশে নবাগত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। যাহারা ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাহাদেরও মনে, চিন্তায়, ভাবে, বচনে, আহারে, বিহারে, ভূষণে ও পরিচ্ছদে এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা মহানগরী

নবীন আন্দোলনে চঞ্চল হইয়া উঠে। দেশীয়গণ বলিতে থাকেন—ওরে মিশনারি মিশনারে!—মিশ না রে! মিশ না রে!

বাঙ্গালী হয়তো ভুল করিয়াছিল ইংরেজ শাসনশক্তি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এবং পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে এক, অবিচ্ছেদ্য মনে করিয়া। এই ভুলের বশেই সে ভীত হইয়া আত্মস্থতা হারাইয়াছিল। এই তিন সত্য সত্যই কখনও এক হইয়াছে কি? খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত পাশ্চাত্ত্য শাসনশক্তির অচ্ছেদ্য কোন সম্পর্ক নাই; বরং রাষ্ট্রনীতি-চর্চ্চায় বাস্তব জীবনে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রেম ও মৈত্রীর অনুশাসনকে চিরদিন সে শক্তি লাঞ্ছিত করিয়াই চলিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে বুদ্ধ, অশোক বা খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি অল্পই; নৈতিক ধর্ম্মের যে মহিমায় উহা সমুন্নত, তাহা ভারতীয় ধর্ম্মে মোটেই অসুলভ বা অপ্রচুর নহে। তথাপি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারে ভারতীয় সমাজ যে ভীত, চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, যুবকগণ যে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে মিশনারিগণের অনুসরণ করিতে চাহিতেছিল, তাহা মুখ্যতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মহিমা নয়, তাহা ভারতবর্ষে তাহার যে বাহন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা, তাহারই মহিমা। দেবতা অপেক্ষা বাহন এখানে বলবান্। ভারতবর্ষে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রাচ্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত প্রতীচ্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংস্পর্শ, সংঘর্ষ ও সমন্বয় চলিতেছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মনীতির সহিত গ্রীক দর্শন ও বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, রোমক ব্যবহার-বিজ্ঞান, সমর-বিজ্ঞান এবং জাতি-গত শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান মিলিত হইয়া, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধনা-লব্ধ যুক্তিবাদের সহায়তায় মানবমনের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা এক দুর্জ্জয় রূপ লাভ করিয়াছে। এ দেশে আগত মিশনারিগণের একমাত্র রূপ

খ্রীষ্ট-ভক্ত, প্রেম-পাগল, মানবমুক্তি-কামী শান্তি-দূতের রূপ নয়, তাহারা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক, বাহক, এবং তাহারও মিশনারি বা প্রচারক।

যাহা নিজ পরীক্ষশালায় নিজ চক্ষুতে সত্য বলিয়া পরীক্ষিত হয় নাই, যাহা নিজ অনুভব-সিদ্ধ যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে নিজ বুদ্ধির গোচর হয় নাই, পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি তাহা মানে নাই। মানবমনের ভালমন্দ সর্ব্ববিধ সংস্কার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সে কেবলমাত্র বুদ্ধি-গত যুক্তিবাদের পোষকতায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্থাপন করিয়াছে। এই সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ সুসংস্কৃত খ্রীষ্টীয় মতবাদ তত নয়, যত হইতেছে নিরীশ্বর বা নাস্তিক মতবাদ এবং জড়বাদ। বাস্তবিক পক্ষে খ্রীষ্টীয় মতবাদের প্রসার রুদ্ধ হইলেও নাস্তিকমতবাদ ও জড়বাদ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। এই সংস্কৃতির সাহায্যেই পাশ্চাত্ত্য শক্তি তাহার বিশাল বাহু বিস্তার করিয়া জল, স্থল ও অন্তরীক্ষকেও মুষ্টিগত, পঞ্চভূত ও প্রকৃতিকে বশীভূত এবং দেশ-কালের ব্যবধান বিচূর্ণিত করিতেছে। বহু-ভঙ্গিম তাহার জীবন, এবং দুর্নিবার তাহার জীবনবেগ।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনাধীনে একদল সুশিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম উভয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে তাহারা অনেকাংশে বরণ করে, কিন্তু হিন্দুর বিশাল বেদ-শাস্ত্র হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অনুরূপ বা তদপেক্ষা উৎকর্ষশালী ভাব ও বচন-সমূহ সংগ্রহ করিয়া নব সমাজ স্থাপনা দ্বারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে প্রতিহত করে। এই সমাজই ব্রাহ্ম সমাজ। বিরাট শক্তিশালী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একাই ইহার প্রতিষ্ঠাভূমি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁহাদের

সহকর্ম্মিগণ এই ভিত্তিভূমির উপর তিনটি সুন্দর সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন—আদি ব্রাহ্ম-সমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ।

বৌদ্ধ-প্লাবিত বাঙ্গালাদেশে বেদবেদান্তের চর্চ্চা কোন দিনই প্রবল ছিল না। ইংরেজ আগমন ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আবির্ভাবের সময়ে উহার সামান্য আলোচনাও লুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন ভাবোচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ফলে প্রাচীনগণের ধীর বিচারশীল প্রজ্ঞাবাদ এবং জীবনের প্রতি সংযম ও সুষমাময় একটি ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিষ্ঠ দৃষ্টি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সমাজে চতুর্দ্দিকে জীবনের বিকার, আদর্শের ব্যভিচার, সুনীতির অভাব এবং সত্যধর্ম্মের গ্লানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। পানদোষ ছাড়া এমন দোষ ছিল না, যাহা সমাজ-দেহকে অন্তঃসার-শূন্য করিয়া তুলে নাই। নবদ্বীপের নেতৃত্বে যে ন্যায় ও তর্কের সূক্ষ্ম আলোচনা চলিতেছিল, তাহা ছিল জাতীয় জীবন ও সত্যদর্শনের সহিত সম্পর্ক-শূন্য বৈষ্ণব ভাব-বিলাসের মতই এক বুদ্ধির বিলাসমাত্র। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের কথা কে ভাবে? মূর্ত্তিপূজা একমাত্র সত্য পূজা বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল; দেবতার আকার যেন নিত্য, শাশ্বত, তাহার উপরে যেন আর কিছুই নাই! উপাসনাও ছিল একমাত্র সকাম উপাসনা। দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল এবং নীলের গাজন, আর কবিওয়ালাদের লড়াই—ইহা লইয়াই পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলের জীবন পরম আনন্দে কাটিয়া যাইতেছিল।

পলাশীক্ষেত্রে ইংরেজের বিজয় হইল, কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইল; বাঙ্গালা ব্যাকরণ, অভিধান ও

গদ্য রচনা আরম্ভ হইল; ডাঃ কেরি ও মার্শম্যান ও অন্যান্য পাদ্রিসাহেবগণ একই সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। রাজশক্তি প্রথমে উদাসীন থাকিলেও পরে খ্রীষ্টীয় যাজকগণের আনুকূল্য আরম্ভ করিলেন। ইহারই মধ্যে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে সমস্ত পৈত্রিক বিষয়ের অধিকারী হইয়া, রংপুরের রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজের সমগ্র শক্তি ও জীবন অর্পণ করিয়া ধর্ম্ম, সমাজ ও দেশসেবা করিতে কলিকাতায় আগমন করিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনিই ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পুরুষ, বর্ত্তমান ভারতের স্রষ্টা, হৃদয়ের সার্ব্বভৌম-বৃত্তিতে বিশ্বের একজন মহানাগরিক। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সংঘর্ষে এই বরেণ্য বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রথমে হিমগিরি-শৃঙ্গের ন্যায় তাঁহার শির বাঙ্গালার সমতল ভূমির ঊর্দ্ধে, অনেক ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বহির্দেশে পাশ্চাত্ত্য-ভূমি নিরীক্ষণ করেন। তিনিই হিন্দুধর্ম্মের বেদবেদান্তের ভিত্তিকে বাঙ্গালাদেশে নূতন করিয়া আবিষ্কার করেন, এবং সেই ভিত্তি-ভূমির উপর দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া একদিকে স্বদেশীয়গণের সাকার উপাসনায় সত্যবুদ্ধির প্রতিবাদ এবং সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক নিষ্ঠুর প্রথা-সমূহের বিলোপ, অন্যদিকে ইংরেজী ভাষার সহায়তায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার করিয়া দেশ ও জাতিকে সুসংস্কৃত, সমুন্নত এবং আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা পান। বাঙ্গালী জীবনের রুদ্ধার্গল মুক্ত করিয়া তিনি সেখানে মহাসাগরের উন্মুক্ত বাতাস প্রবাহিত করেন। রামমোহন রায়ের কলিকাতা আগমনের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে পশ্চিম ও উত্তর ভারতে স্বামী দয়ানন্দ আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়া একই উদ্দেশ্য ভিন্ন উপায়ে সিদ্ধ করিবার

প্রয়াস পান, এবং তাহারও কয়েক বৎসর পরে দক্ষিণ ভারতে থিয়োসোফি বা ব্রহ্মবিদ্যার সহায়তায় সেই উদ্দেশ্যই অন্যভাবে কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হয়। ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরপর পূর্ব্বভারতে ব্রাহ্মসমাজ, পশ্চিমভারতে আর্য্যসমাজ এবং দক্ষিণভারতে থিয়োসোফিষ্টগণ কার্য্য করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কার্য্য পৃথক্ ভাবে পরে আলোচিত হইবে।

রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জিলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মূল উপাধি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়; তাঁহার পিতৃবংশ ছিল বৈষ্ণব, মাতৃবংশ শাক্ত। নয় বৎসর বয়সে তিনি পাটনায় যাইয়া ফারসী ও আরবী ভাষা এবং ইসলাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বার বৎসর বয়সে ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া কাশীতে গিয়া সংস্কৃতভাষা, হিন্দুশাস্ত্র এবং বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হ'ন। ষোল বৎসর বয়সে শিক্ষা সাঙ্গ করিয়া ফারসীভাষায় পৌত্তলিক পূজার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। ইসলামধর্ম্মের একেশ্বরবাদ এবং বেদান্তের ব্রহ্মবাদের প্রভাববশে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার-রূপ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্যে তিনি প্রথম যৌবনেই ব্রতী হ'ন। যৌবনারম্ভে এই ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত তাহা সমধিক পরিপক্কই হয়, কদাচ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, এই মতবাদ-গঠনে তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব কিছুমাত্র ছিলনা; ইহারও আট বৎসর পরে চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি ক্রমে ইংরেজী, হিব্রু, লাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। উক্ত পুস্তিকা রচনার জন্য তিনি ক্রুদ্ধ পিতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হ'ন। এই সময়ে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু-হৃদয়ে তিনি চারি বৎসরকাল

উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান পর্য্যটন করিয়া শিখ, উদাসী ও কবীর-পন্থী প্রভৃতি নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জ্ঞান লাভ করেন, অবশেষে অসম-সাহসিকতার সহিত হিমালয়ের তুষারগিরি-শৃঙ্গ লঙ্ঘন-পূর্ব্বক তিব্বত দেশে প্রবেশ করেন এবং সেখানকার প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। ইহার পরে পিতার যত্নে তিনি গৃহে ফিরিলেন এবং পুনরায় বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু স্বীয় ধর্ম্মমতের কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না। পুনরায় তিনি পিতার বিরাগ-ভাজন হইয়া, কাশীতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া হিন্দুর সমুদয় শাস্ত্র গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট একেশ্বরবাদ দ্বারা কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কলিকাতায় অধিষ্ঠিত ও ধর্ম্ম-সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-লিখিত বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বাঙ্গালায় এবং পরে হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। কয়েকখানি উপনিষদ্‌গ্রন্থও শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদসহ তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হয়। বাঙ্গালাদেশে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ইহাই প্রথম বেদান্ত ও উপনিষৎ প্রচার, এবং ইহা তাঁহার জীবনের এক শ্রেষ্ঠ কার্য্য। ইহার পর হইতেই বেদান্ত-দর্শন, উপনিষৎ ও গীতা গ্রন্থের প্রচার ও প্রভাব বাঙ্গালী ও ভারতীয় সমাজে বাড়িয়াই চলিয়াছে। রামমোহন রায় নিজেকে শঙ্কর-মতের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী, বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যের অনুরাগী এবং অদ্বৈতবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। স্থলে স্থলে সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম স্বীকার করিলেও তিনি কদাচ ভক্তিবাদ বা দ্বৈতবাদকে প্রধান করেন নাই; বৈষ্ণব রস ও ভাব-সাধনাকেও আমল দেন নাই। বেদান্তজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই একদিকে পৌত্তলিকতা নিরসন

এবং অপরদিকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার-নিরোধ-কল্পে তিনি যুগপৎ ব্রাহ্মণ ও পাদ্রিদের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে বিবিধ পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। দুর্ব্বলাধিকারীর জন্য প্রতিমা পূজার অর্থ আছে, একথা তিনি একাধিকবার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা দয়ানন্দ স্বামী অপেক্ষা তাঁহার মত অনেক উদার ছিল। রামমোহন রায় তাঁহার স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনীতে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—"আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখনও হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।" বস্তুতঃ অহিন্দুত্ব তাঁহার জীবনে, আচরণে বা মতবাদে কোথাও ছিল না। প্রতিমা সত্য নয়, ঈশ্বরই সত্য, সেই ঈশ্বরের শুদ্ধ জ্ঞান উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন ও বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যে পাওয়া যায়— আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির প্রতি ইহাই তাঁহার মহতী বাণী।

রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফল ফলিল। বাঙ্গালী সাধারণ তাঁহাকে পাষণ্ড, নাস্তিক এবং সতীদাহ-নিবারণকারী ঘোর পাতকী বলিয়া গালি দিতে লাগিল। তাঁহার প্রতি সামাজিক নির্য্যাতন এবং তাঁহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়েরও তিনি চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন, এবং কার্য্যতঃ উভয় সমাজের পূজা বা উপাসনা-মন্দিরের দ্বার তাঁহার নিকটে রুদ্ধ হইয়া গেল। বিশাল ও বলিষ্ঠ-দেহ, বিশাল ও বুদ্ধিদীপ্ত-চক্ষু এবং অতি বলিষ্ঠ-প্রকৃতি রাজা রামমোহন রায়ের চিত্ত ইহাতে কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ এক, অদ্বিতীয়, অরূপ পরমেশ্বরে তাঁহার বিশ্বাস অতি দৃঢ় ছিল। তিনি কলিকাতা আসিবার পর বৎসরই ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মানিকতলার ভবনে বন্ধুগণকে লইয়া আত্মীয়সভা

সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; সেখানে সপ্তাহে এক দিন সভার অধিবেশন হইত, সভায় বেদ-পাঠ এবং ব্রহ্ম-সঙ্গীত গীত হইত। এইবার তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বের সকল ধর্ম্মবিশ্বাসীর জন্যই এক সার্ব্বভৌমিক উপাসনা-সভা স্থাপন করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার বন্ধু ও অনুচর-বর্গের মধ্যে ধনী ও অভিজাত-বর্গের একান্ত অভাব ছিল না। শীঘ্রই তাঁহারা চিৎপুর রোডের পার্শ্বে জমি ক্রয় করিয়া তাহার উপর 'ব্রহ্মসমাজ' মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই মাঘ তারিখে এই নূতন মন্দিরে উপাসনা-সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। এই দিনই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা-দিন। এই সমাজ-মন্দিরের দলিলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয় তিনি অতি স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—

(১) সমাজমন্দিরে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পাতা, শাশ্বত, অগম্য ও অব্যয় একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে।

(২) সমাজমন্দিরে শান্ত, সংযত এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিলে ধর্ম্ম, জাতি ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপাসনার অধিকার থাকিবে।

(৩) সমাজমন্দিরে কোনপ্রকার ক্ষোদিতমূর্ত্তি, প্রতিমূর্ত্তি, চিত্র বা প্রতীক থাকিতে পারিবে না ; এবং সেখানে নৈবেদ্যদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, প্রাণিবধ বা বলিদান, অথবা কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হইতে পারিবে না ; কোন প্রকার পান বা ভোজনও হইতে পারিবে না।

ঐ বৎসরই এই সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠার ছয় দিবস পূর্ব্বে প্রতিক্রিয়াশীল গোড়া হিন্দুদের দ্বারা সতীদাহ-সমর্থনকারী বিরোধী ধর্ম্মসভা গঠিত হয় ; কিন্তু ঐ বৎসরই ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ-নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যায়।

ইউরোপ দর্শন করিবার বাসনা তাঁহার অন্তরে চিরদিনই বলবতী ছিল। পাশ্চাত্ত্য খণ্ডের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা-সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা রামমোহনের ন্যায় বিরাট পুরুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এই সময়ে উহার সুযোগও উপস্থিত হয়। তিনি দিল্লীর বাদশাহের দূতরূপে নিযুক্ত হইয়া কয়েকটি বিষয়ে সম্রাটের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে দরবার করিতে ইংলণ্ড গমন করেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি দিল্লীর বাদশাহ-কর্ত্তৃক রাজা উপাধি দানে ভূষিত হইয়াছিলেন। কিশোর বয়সে তুষার-শৃঙ্গ লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত গমনের ন্যায় পরিণত বয়সে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া বিলাত গমনেও তাঁহার সাহস-পূর্ণ দৃঢ়-চিত্ততারই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই ভারতবাসীর প্রথম বিলাত গমন। এই জন্যও তাঁহাকে অনেক বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বিলাতে তিনি তিন বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি নানা প্রকারে স্বদেশীয়গণের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া নিজেও বিলাতের বিদ্বান্, ধর্ম্মশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের অশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। সহসা জ্বররোগে আক্রান্ত হওয়ায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ড-প্রবাসে এই মহাপুরুষের দেহাবসান ঘটে। সেখানে ব্রিষ্টল নগরে আজিও তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ দণ্ডায়মান। মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ যে ধ্বনি তাঁহার রসনায় উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা ওঙ্কারধ্বনি।

রাজা রামমোহন রায়ের বহুমুখী প্রতিভার অবদানরাশি নানা প্রকারে তাঁহার স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও স্বভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এক যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া তিনি ভারতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শক্তির সংঘর্ষে

উভয় শক্তির উৎকৃষ্ট গুণরাশির সমন্বয়ে রামমোহনের অভ্যুদয়। ধর্ম্মক্ষেত্রে তিনি পৌত্তলিকতার উপর হিন্দুর দৃঢ় আস্থা ভাঙ্গিয়া দেন; এক উদার সার্ব্বভৌমিক উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বেদান্ত-প্রচার-রূপ এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বন্যা-প্রবাহকে রুদ্ধ করেন। সমাজক্ষেত্রে তিনি লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সহায়তায় নিষ্ঠুর সতীদাহ-প্রথা নিবারণ করেন; বহুবিবাহ-প্রথা নিবারণ, জাতিভেদ-প্রথা বিলোপ এবং হিন্দুনারীর দায়বিধি-সংস্কার-কল্পে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন; কথিত আছে, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হইতে আরম্ভ করিয়া তৎকালের প্রয়োজনীয় সকল আন্দোলনেই তিনি অগ্রণী ছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদ্র স্পেনদেশে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী স্থাপিত হইলে, তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া নিজ ব্যয়ে কলিকাতা টাউনহলে একটি প্রকাশ্য ভোজ দিয়াছিলেন। এই একটি মাত্র ঘটনা হইতেই বুঝা যায়, তিনি জাতীয় স্বাধীনতার কি মূল্য ও মর্য্যাদা দিতেন এবং ভিন্নদেশের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহার কতখানি আন্তরিক আগ্রহ ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে মেকলে সাহেবের সহিত সহযোগিতা করিয়া তিনি ইংরেজী শিক্ষা এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তার করিয়া দেশে নব যুগের প্রবর্ত্তনা করেন; দেশের বহু বিদ্যায়তন-প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁহার বিপুল শক্তি কার্য্য করিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বাঙ্গালা গদ্য রচনা-প্রণালীকে নানাভাবে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের উন্নতির সকল দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া শক্তি-সৌষ্ঠব-পূর্ণ অখণ্ড সুষমায় ভারতীয় জীবনকে নবরূপে গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম স্পষ্ট রূপ লাভ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধনায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু, 'ব্রহ্মসমাজ-মন্দিরের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, স্বনামখ্যাত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথম শৈশবেই তিনি রামমোহন রায়ের প্রভাবাধীন হ'ন এবং এই সূত্রেই তাঁহার প্রতিভাবান্ পুত্র বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মমতও সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে রামমোহনের ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি দার্শনিক ছিলেন না, বেদ-বেদান্ত-বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁহার ছিল না; তাঁহার ছিল প্রবল ধর্ম্ম-পিপাসা, ভগবৎ-সঙ্গ লাভের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, সরল ভক্তি এবং সুদৃঢ় নিষ্ঠা; আর ছিল বলিষ্ঠ স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-প্রেম। দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাত ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে রামমোহন রায়ের বেদান্তের ধর্ম্মকে চিনিয়া লওয়া অতি কঠিন। দেবেন্দ্রনাথ ভক্ত, দ্বৈতবাদী, ঈশ্বরে পিতৃত্ব আরোপ করিয়া তিনি পিতৃভাবে উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। একমাত্র সগুণ, নিরাকার ও সবিশেষ ব্রহ্মেই তাঁহার প্রীতি। তাঁহার ঈশ্বরে এই সকলের বিরুদ্ধ কোন লক্ষণ নাই। নানক-প্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্মে যে প্রকার ইস্‌লামের প্রভাব বর্ত্তমান, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মেও সেই প্রকার পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান। গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় এই সকল ধর্ম্মের কোনটিতেই পরিস্ফুট হয় নাই। ভগবান্‌কে পিতৃভাবে উপাসনা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব নয়, ইহা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেরই এক প্রধান লক্ষণ। দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাত শূন্য হইতে ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টিও হিন্দু ধারণার বিরোধী, ইহা খ্রীষ্টীয় ও ইসলাম ধর্ম্মের বিশ্বাসেরই অনুরূপ। হিন্দুগণ সৎকার্য্যবাদী। দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল অভিজাত প্রকৃতির

অন্তরালে একটি সত্য-পিপাসু, কিন্তু কেবল যুক্তিবাদী মন লুক্কায়িত ছিল। তিনি প্রকৃত পক্ষে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা-বাদকে ব্রাহ্মমতের মূল ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই রামমোহন রায়ের ন্যায় ঋষি-বাক্যের অভ্রান্ততা বা স্বতঃসিদ্ধতা-সম্বন্ধে তাঁহার কোন আস্থা ছিল না। ধর্ম্মোপলব্ধির জন্য অতীন্দ্রিয় বুদ্ধির অস্তিত্ব না মানিলে যুক্তিবাদ জড়বাদে পরিণত হইতে পারে। বস্তুতঃ এক সময়ে দেবেন্দ্রনাথের পরিচালিত সমাজে ভোট গ্রহণ দ্বারা ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রমাণ করিবার প্রস্তাবও উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় সমাজের অপর অনুকরণ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছিলেন, "এই সকল বিষয়ে আমি রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ব্রাহ্ম সমাজকে আমরা ইংরেজদিগের গির্জার ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি। ইহার সংশোধন হওয়া উচিত। উপাসনার সময়ে জুতা বাহিরে রাখা উচিত।" রামমোহন রায় সমাজকে হিন্দুভাবে সজ্জিত করিয়া হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। তথাপি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজ বিশাল হিন্দু সমাজেরই অঙ্গীভূত ছিল।

এই সময়ে ভালে যৌবনের জয়-টিকা এবং বক্ষে যৌবনের উদ্দাম আবেগ লইয়া ব্রাহ্মসমাজক্ষেত্রে অভ্যুদিত হইলেন কেশবচন্দ্র সেন। মহর্ষিই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ-মণ্ডলীতে আকর্ষণ করেন। উভয়ের মিলন ছিল বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য এবং যুবক শ্রীগৌরাঙ্গের মিলনের ন্যায় অপূর্ব্ব। কিন্তু এ নব গৌরাঙ্গের দুর্ব্বার জীবনবেগ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধারণ করিতে পারেন নাই, উভয়েই ক্রমশঃ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। দেবেন্দ্রনাথের সমাজ আদি সমাজ নামে আখ্যাত হইয়া হিন্দুসমাজের সহিত সম্পর্কান্বিত থাকে।

কেশব সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া নূতন উপাসক সম্প্রদায় ও নূতন সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। এই ভেদ ও বিচ্ছেদের মূল কোন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রকৃত মতভেদ নয়, সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধীয় প্রবল মতভেদ।

সুপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত রাম কমল সেনের পৌত্র এবং শ্রীযুত প্যারীমোহন সেনের পুত্র কেশবচন্দ্র সেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের সহিত একই বৎসরে বঙ্গজননীর অঙ্ক অলঙ্কৃত করেন। এই গৌরবর্ণ প্রিয়দর্শন বালককে এক দিব্যকান্তি স্বর্গদূত বলিয়া ভ্রম হইত। ভক্ত বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কেশবচন্দ্র শৈশবে সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করেন নাই। এই সকল বিষয়ে রাজা রামমোহনের নিকট তিনি ছিলেন শিশুর প্রায় অজ্ঞ। কিশোর বয়সে ইংরেজী দর্শন, মনোবিজ্ঞান এবং বাইবেল পাঠে তিনি নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি নিজেকে বলিতেন যীশু-দাস। বস্তুতঃ খ্রীষ্টধর্ম্মী না হইয়া বাইবেল পাঠে এরূপ আশ্চর্য্য অনুরাগ ক্বচিৎ দেখা যায়। মনে হয় প্রথম বয়সে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব এবং পরিণত বয়সে রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব তাঁহাকে ভারতীয় ধর্ম্মে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র গোপনে অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হ'ন। পলাশী-যুদ্ধের এক শতাব্দী পরে ভারতবর্ষে ঐ বৎসর প্রথম স্বাধীনতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। স্বাধীনতার বাণীই যে একালের বাণী, কেশবচন্দ্র তাহা সমগ্র মন দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। চাকুরি ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ-সেবাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়া তিনি ডাক দিলেন দেশের যৌবনকে—তাঁহার 'Young Bengal'-কে, যে শক্তি প্রাণের প্রাচুর্য্যে প্রাচীনতার সকল বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া

দুঃসাহসের সহিত অনিশ্চিত মহত্ত্বের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে পারে, সেই শক্তিকে। কেশবের অন্তরে ছিল অগ্নি, মুখে ছিল অগ্নিময়ী বাণী, সে বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল অপূর্ব্ব বাগ্মিতার সহিত। এত বড় বাগ্মিতা-সম্পন্ন পুরুষ বাঙ্গালাদেশেও অল্পই দেখা গিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজ, বিশেষ ভাবে কলেজীয় তরুণ ছাত্র-সমাজ দলে দলে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মসংস্কারের অপেক্ষাও যেন অধিক জোর দিলেন সমাজসংস্কারের উপরে। ইহা প্রকৃত পক্ষে রাজা রামমোহন রায়েরই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, একই মানবতা এবং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে অখণ্ড জাতীয় জীবনকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার, বাল্যবিবাহ-নিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে সমাজ-সংস্কারে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রক্ষণশীল স্বভাব ও ধীর প্রকৃতি কেশব চন্দ্রের ছিল না। তিনি সহসা সর্ব্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের স্বপ্নে পাগল হইয়া সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া হিন্দুসমাজে, না পারিলে ব্রাহ্ম-সমাজেই আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে চাহিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, অবরোধপ্রথা বিলোপ, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার দান, বাল্যবিবাহ নিরোধ, বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় সংস্কার—জাতিভেদ প্রথা বিলোপ এবং সেই উদ্দেশ্যে জাতিভেদ-সূচক উপবীত ত্যাগ, সকল জাতির সমানাধিকার দান এবং অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন—এক কথায় বলা চলে, এক মহা সামাজিক বিপ্লবের অগ্র-নায়করূপে তিনি আবির্ভূত হইলেন। ফলে প্রাচীন-পন্থীদের সহিত নব্যদের প্রচ্ছন্ন প্রভেদ-রেখা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর দিবসে কেশবচন্দ্র জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে এক

স্বাধীন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণবসু-প্রমুখ তাঁহার বন্ধুগণ-সহ জাতিভেদ মান্য করিয়া পূর্ব্বসমাজেই রহিয়া গেলেন, সেই সমাজের নাম হইল আদি ব্রাহ্মসমাজ।

শক্তিমান্ প্রচারকদল প্রেরণ করিয়া এবং স্বয়ং বাঙ্গালাদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্ম প্রচার-কল্পে ইংলণ্ড গমন করিয়া কেশবচন্দ্র প্রভূত যশ উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমাজ যখন গৌরবের উচ্চ ভূমিতে আরূঢ়, তখনই তাহাতে ফাটল দেখা দিল এবং অচিরে তাহা ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ হইয়া গেল। কুচবিহারের নবীন মহারাজের সহিত তাঁহার নাবালিকা কন্যার পরিণয় উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতার সংস্রব, ব্রাহ্মবিবাহবিধি-লঙ্ঘন ও বাল্যবিবাহ-দান এবং স্বেচ্ছাতন্ত্র-প্রয়োগের অভিযোগ আসে; ব্রহ্ম-মন্দির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, সেখানে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় হইতে থাকে। অবশেষে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু-প্রমুখ নব্যদল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন সমাজ পত্তন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সমাজের নামকরণ করেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। তিনি অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াও কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই দলকে সমর্থন করেন। বলা বাহুল্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মূলে গণতন্ত্রের নীতির প্রয়োগ ভিন্ন ধর্ম্ম বা সমাজ-সম্বন্ধীয় কোন গুরু প্রশ্ন ছিল না। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের শেষ পরিণতি। অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে ভাঙ্গিবার আগ্রহে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মমণ্ডলী তিন সমাজে বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

নব্যদল শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে কিছু কাল উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্য করেন এবং নানা শাখা প্রশাখার পত্তন করেন। এই সমাজে সামাজিক সংস্কার দ্বারা সামাজিক জীবন গঠনই বড় কথা ছিল ; ইহার নায়কগণ রাজনীতি-ক্ষেত্রেও নানা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা এবং বিমল ভগবদারাধনার সহিত মামুলি পরিচয় ছাড়া গভীর যোগ বিশেষ কাহারও ছিল না।

কেশবচন্দ্র বিশ্বস্ত বন্ধুগণের রূঢ় আঘাতে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেও সত্বরই নববিধানের নবীন ভাবোন্মাদনা লইয়া নব বলে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। ইহার পূর্ব্বেই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পরিচয় ক্রমে গভীর আধ্যাত্মিক যোগের মধ্য দিয়া প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। সত্যকথা বলিতে কি কেশবচন্দ্রই দক্ষিণেশ্বরের অখ্যাত অজ্ঞাত অবস্থা হইতে রামকৃষ্ণদেবকে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ ও বাঙ্গালার যুবক সমাজের সমক্ষে প্রকাশ করেন ; ইংরেজী ও বাঙ্গালা নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তাঁহার মহিমা তিনিই প্রথম জগতে প্রচার করেন। পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া সমাজের ভাবে ভাবিত ছিলেন এবং সমাজেই তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত আলোচিত হইতে শুনিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের জীবনী-লেখক চিরঞ্জীব শর্ম্মা লিখিয়াছেন, "পরমহংসের সরল মধুর বাল্যভাব কেশবের যোগ, বৈরাগ্য, নীতি, ভক্তি ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞানকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যে ভক্তির লীলাবিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তাহার এক প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ।"

বস্তুতঃ পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব কেশবচন্দ্রের নববিধানের পরিকল্পনার মূলেও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই মাঘ কেশবচন্দ্র নববিধান ঘোষণা করেন। ইহার মূলসূত্র তিনটি,—(১) ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনা, (২) সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়সাধন, (৩) হিন্দু প্রতিমা-পূজার মূলভাব অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের খণ্ড খণ্ড স্বরূপ-গ্রহণ এবং আরতি, স্তোত্র, শঙ্খঘণ্টা ও কাঁসর-বাদ্য, ধূপধুনা, পুষ্পমাল্য ও কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা। রামকৃষ্ণের সাধনা কেশবের সহিত পরিচিত হইবার বহু পূর্ব্বেই এই তিনটি সূত্রকে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এবং যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে এই তিনটি বিষয়ের প্রভাবই সর্ব্বাগ্রে অনুভব করিতেন। তথাপি কেশবচন্দ্রের নববিধান এবং পরমহংসদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ঠিক এক বস্তু ছিল না। ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও নববিধান কেশবচন্দ্রের নিকটে একটি সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম্ম ছিল। উহাতে বেদ, উপনিষৎ, ভাগবত, গীতা, ললিতবিস্তর, জেন্দাভেস্তা, বাইবেল, কোরাণ বা গ্রন্থসাহেব প্রভৃতি মূল ধর্ম্ম পুস্তকসমূহের সমান আদর ছিল। সম্রাট আকবর এক সময়ে এই সকল মূল ধর্ম্মপুস্তকের শাস্ত্রীয় মতামত শ্রবণ করিয়াছিলেন মাত্র; কেশবচন্দ্র কিন্তু উহাদের সারাংশ সঙ্কলন করাইয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেব আবার ভিন্ন ভিন্ন মতানুযায়ী সাধনা করিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল সত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছিল প্রত্যেক ধর্ম্মের চরম সত্যের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও পরিজ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের সহায়তায় তিনি ধর্ম্মসমন্বয় প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার বেলায় কোন নূতন ধর্ম্ম

প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উঠিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রের ধারণা ছিল অনেকটা বুদ্ধিগত; তাই তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতে দাঁড় করাইয়া "নববিধান" নাম দিয়া নূতন করিয়া লোকপ্রিয় করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের মতে 'বিধান' সংজ্ঞাটিই ছিল "বিধাতার জীবন্ত বিধাতৃত্ব-ক্রিয়ার জ্ঞাপক"; নববিধানের ধর্ম্ম ছিল "ঈশ্বর-নিয়োজিত ধর্ম্ম"। কেশবের জীবনীকারের মতে "পূর্ব্ব প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে প্রত্যাদেশ, বিশেষ কৃপা, সাধুভক্তি, যোগ, ধ্যান, ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব দর্শন করিয়া তিনি ঐ নামটি প্রকাশের বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন।" এইভাবে কেশবচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথও ক্রমে বিশেষ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেবল যুক্তিবাদের অবলম্বনে ধর্ম্ম গঠিত হইতে পারে না।

দুঃখের বিষয় কেশবচন্দ্র দীর্ঘজীবী হইতে পারেন নাই; ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারি মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সের প্রারম্ভে তিনি দিব্যধামে প্রস্থান করেন। কেশবের চিত্তের হিন্দুসংস্কার এবং বৈষ্ণবসংস্কার ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছিল। সেই রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণের ন্যায় মা মা মা ডাক, সেই গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি, বাইবেলের পরিবর্ত্তে গীতা ও ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজ কেবল কান ভরিয়া শুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সাধনা আরও গভীর হইলে কে জানে ব্রাহ্মসমাজের অপর দুই সাধক ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা সিদ্ধ মৌনী বাবার ন্যায় কেশবের জীবনেও আরও বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন আসিত কিনা! অন্তঃস্থ দৈবশক্তির দুর্ভর বেগে ক্ষিপ্ত গ্রহের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কেশবচন্দ্র জীবন-রঙ্গভূমিতে কত লীলাভিনয়ই সম্পন্ন করিলেন! তিনি যিশুদাস,

তিনি উগ্র ব্রাহ্ম সংস্কারক, তিনি নববিধানের পুরোহিত, তিনি বাঘাম্বর পরিধান করিয়া একতন্ত্রী হস্তে মহাদেবের ন্যায় ধ্যানস্থ গৃহস্থ যোগী, তিনি মস্তক মুণ্ডিত করিয়া গৈরিক খিলকা ও কৌপীন ধারণ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে বৈরাগী ভিক্ষুক, মহানগরী কলিকাতার রাজপথে নগরকীর্ত্তনে রত তিনি নবগৌরাঙ্গ! অধ্যাত্মসাধনার রাজ্যে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থিরসিদ্ধি লাভ করিবার মত বয়স পাইলেন না! তাঁহার দেহাবসানের সঙ্গে নববিধানের নববিকাশের সম্ভাবনারও অবসান হইল। প্রায় দশ বৎসর পরে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতবর্ষ ও পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধ ধর্ম্মসমন্বয়ের মহাবাণী জগদ্বাসীকে শুনাইলেন। কেশবচন্দ্রে যাহার আরম্ভ, বিবেকানন্দ স্বামীতে তাহার পূর্ণতা সাধন।

এতক্ষণ ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলনের এক পিঠ—ভারতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র পরিপুষ্টির দিক মাত্র ব্যাখ্যাত হইল। তাহার অপর পিঠ—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে প্রতিহত করার দিক বোধ হয় সমান বা সমধিক প্রয়োজনীয়। ইংরেজ মিশনারিগণ শিক্ষা-বিস্তার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের অবসরে বক্তৃতা করিয়া এবং বিবিধ পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদেবতার গ্লানি এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মহিমা প্রচার-পূর্ব্বক উগ্র আক্রমণ চালাইতেছিলেন। এই সময়ে ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ আবিষ্কার করিয়া সদৃশ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতি-আক্রমণ চালাইয়া ভারতীয় জাতিকে রক্ষা করিয়াছিল ব্রাহ্মসমাজ। সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তাদৃশ উগ্র সামাজিক বা ধর্ম্ম-সংস্কারেরই হয়তো প্রয়োজন হইয়াছিল। বাস্তবিক-পক্ষে রামমোহন রায়ের উপর যাহারা নানাবিধ উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধরগণ ব্রাহ্মনেতৃমণ্ডলীর হস্তে সভাক্ষেত্রে

কিংবা সংবাদপত্রে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণের পরাভবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত। ইহা ব্রাহ্মসমাজের এক শ্রেষ্ঠ গৌরব। হিন্দুসমাজসংস্কার-আন্দোলন সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছে। ব্রাহ্মগণের প্রবর্ত্তিত অনেকগুলি শুভ সামাজিক সংস্কার অনেক পূর্ব্বেই হিন্দুসমাজ স্বীকার করিয়া লইয়া উদার ও উন্নতিমুখী হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রাহ্মগণের সংখ্যা অল্প হইলেও, তাহাদের প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের মূল্য অল্প ছিলনা। এই আন্দোলন কেবল নাস্তিক মতবাদ ও খ্রীষ্টীয় মতবাদ হইতে নব্য বঙ্গকে রক্ষা করে নাই, উহা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে আধুনিক যুগেও অভিনব ধর্ম্ম গঠনের প্রচেষ্টা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের যথার্থতাকেই সুস্পষ্ট রূপ প্রমাণিত করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের ন্যায় শক্তিধর পুরুষগণও কেবল যুক্তিবাদ অবলম্বনে ধর্ম্ম-স্থাপনে ব্যর্থ হইয়া গেলেন। ঈশ্বরানুভূতি-লব্ধ সুগভীর প্রজ্ঞা না হইলে ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারেনা।

তথাপি ব্রাহ্মসমাজ বিশাল হিন্দুসমাজেরই এক অঙ্গ, তাহারই হৃদয়-সাগর হইতে উত্থিত এক মহাশক্তির তরঙ্গোচ্ছ্বাস; বিপদের সময়ে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়া, তাহা আবার হিন্দুসমাজের বক্ষে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই সময়ে আর এক মহাশক্তির অভ্যুদয় ঘটে, ব্রাহ্মসমাজের অপূর্ণ কাজ তাহা পরিপূর্ণ করে, হিন্দুর সমগ্রধর্ম্মকে হিন্দুর চক্ষে ও বিশ্বের চক্ষে অখণ্ড গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার বেদান্ত বাণীকে বিশ্বে প্রচার করে এবং তাহার মধ্যেই বিশ্বধর্ম্মসমন্বয় এবং বিশ্বের মহামুক্তি বর্ত্তমান, ইহা ঘোষণা করে। সে শক্তি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ! গুরু এবং শিষ্য, যেন শ্রুতি এবং স্মৃতি, যেন স্থিতি এবং গতি, যেন ধ্যান এবং কর্ম্ম, যেন হিমালয়ের তুষার-সঞ্চয় এবং বিগলিত গঙ্গা-প্রবাহ, যেন মহান্ আকাশ এবং প্রবহমাণ বাতাস! ইহারা কি কেবল যিশুখ্রীষ্ট এবং সাধু পলের ন্যায়, অথবা গৌরাঙ্গদেব এবং শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায়, কিংবা পার্থসারথি এবং পার্থের ন্যায় সম্পর্কান্বিত? অথবা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে অগ্নি ও তাহার দীপ্তির ন্যায় এবং পুষ্প ও তাহার সৌরভের ন্যায় বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন?

রামকৃষ্ণের চরণে নরেন্দ্রনাথ। প্রৌঢ় ঋষির চরণে আশিষ্ঠ যুবা! তপঃসিদ্ধ মহিমান্বিত প্রাচীন ভারতের চরণে বহির্ম্মুখী যুক্তিবাদী আধুনিক জগৎ! সত্য বোধির সম্মুখে সংশয়াকুল বুদ্ধি! দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। ভবিষ্যৎ স্বামী বিবেকানন্দ! যুক্তিবাদ, জড়বাদ ঘুচিয়া গিয়াছে, সংশয়গুলি একে একে ছিন্ন হইতেছে, জ্ঞান-ভাস্কর মেঘমুক্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! মুখে তাঁহার অভিনব কথা,—

"শুকদেবের মত নির্ব্বিকল্পসমাধিযোগে সচ্চিদানন্দসাগরে আমি ডুবিয়া থাকিতে চাই।"

রামকৃষ্ণ—"ছিঃ, বার বার ঐ কথা বল্‌তে তোর লজ্জা করে না! কোথায় কালে বটগাছের মত বর্দ্ধিত হয়ে শত শত লোককে শান্তির

ছায়া দিবি, তা না, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্, এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর !"

তাহার পর নির্ব্বিকল্পসমাধি লাভ করিয়া তৃপ্তিমান্ হইয়াছেন যুবা সন্ন্যাসী, বদনে ব্রহ্মবিদের দিব্যজ্যোতি উদ্ভাসিত ! ঠাকুর কিন্তু বলিলেন,—"এখনকার মত তবে চাবী দেওয়া রইল ; চাবী আমার হাতে ; কাজ শেষ হলে তবে খুলে দেওয়া হ'বে।"

তারপর রামকৃষ্ণের দেহাবসানকাল আসন্ন প্রায়। তিনি সজল-নয়নে নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "বাবা ! আজ তোকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকীর হলুম।" রামকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। দাঁড়াইয়া রহিলেন আত্মস্থ নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দ। দক্ষিণেশ্বরের খেলা শেষ হইয়াছে, বিশ্বের খেলা আরম্ভ হইবে। দুই দেহে এক সময়ে শক্তির খেলা তো চলে নাই ! রামকৃষ্ণ-সূর্য্য যখন অস্তমিত, তাঁহারই প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া বিবেকানন্দ-পূর্ণচন্দ্রের তখন উদয় ! রামকৃষ্ণে সত্যের প্রতিষ্ঠা, বিবেকানন্দে প্রচার ; রামকৃষ্ণে বীজ, বিবেকানন্দে পল্লবোদ্গম ও পুষ্পবিকাশ ; রামকৃষ্ণে ভিত্তি, বিবেকানন্দে গগনচুম্বী মন্দিরচূড়া—রামকৃষ্ণ মহাসঙ্ঘ ! রামকৃষ্ণে পূর্ব্বার্দ্ধ, বিবেকানন্দে শেষার্দ্ধ ; উভয়ে এক অখণ্ড পূর্ণতা।

রাজা রামমোহন রায়ের দেহত্যাগের তিন বৎসর পরে এবং কেশব চন্দ্র সেনের জন্মগ্রহণ করিবার দুই বৎসর পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেব অর্থাৎ গদাধর চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৬ সনে হুগলি জেলার প্রান্তবর্ত্তী কামারপুকুর নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গদাধরের পিতা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীযুক্তা চন্দ্রাদেবী ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত কুলদেবতা ৺রঘুবীরের উপাসনা করিতেন। বাল্যে তাঁহার অতি সাধারণ বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা হয়, সংস্কৃত বা ইংরেজী কোন

ভাষার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই। কিন্তু বাল্যকালেই দেবদেবীর প্রতিমা-নির্ম্মাণে, চিত্রাঙ্কনে এবং সঙ্গীত ও অভিনয়-বিদ্যায় গদাধরের স্বাভাবিক পটুতা দেখা যায়। বয়োবৃদ্ধির সহিত বালকের অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার বিকাশ সকলকেই বিস্মিত করিতে থাকে। গদাধরের হৃদয় স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ ছিল; উপনয়নের পর ধ্যান করিবার কালে এবং দেবদেবীর মহিমাসূচক সঙ্গীতাদি শুনিলে গদাধর কখন কখন এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন, যে তাহাতে ভাবসমাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইত, এবং এই অবস্থায় সময়ে সময়ে নানাবিধ দিব্যদর্শনও ঘটিত। সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্য গদাধর ১৭ বৎসর বয়সে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত কলিকাতায় আগমন করেন। ক্রমে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, যে বৎসর কেশবচন্দ্র গোপনে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'ন, সেই বৎসর গদাধর কলিকাতার পাঁচ মাইল উত্তরবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথী-তীরস্থ রাণী রাসমণির কালীবাটীতে কালীমাতা ভবতারিণীর পূজকের পদ গ্রহণ করেন। গদাধরের বয়স তখন ২১ বৎসর, ইহার পূর্ব্বেই তিনি নিষ্ঠাবান্ শাক্ত সাধক কেনারাম ভট্ট মহাশয়ের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের সাধনা দুই বিভিন্ন প্রকারে পরিচালিত হয়। কেশবচন্দ্র প্রথম হইতেই বন্ধু ও অনুচরগণের সহিত ইউরোপীয় যুক্তিবাদকে ভিত্তি করিয়া আচার্য্য হইয়া প্রচার করিয়া চলিতেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব অথবা গদাধর ছিলেন মায়ের দীন পূজারি মাত্র, প্রথম দ্বাদশ বৎসর একাকী একান্ত নির্জ্জনে শাস্ত্রীয় বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া নীরব তপস্যায় রত রহিয়াছেন। কেশবের পূজ্য নিরাকার ঈশ্বর; গদাধরের নিকটে সাকার নিরাকার কোন প্রশ্ন ছিলনা, তিনি সর্ব্ব প্রাণ দিয়া সর্ব্বক্ষণে সর্ব্বরূপে ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রকার

অনুভূতি—একান্ত আপনার করিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন পাইতে চাহিতেছিলেন। এই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপরই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। রামকৃষ্ণের সহায়তায় ভারতবর্ষে আবার যে সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের অখণ্ড প্রতিষ্ঠা হইবে! ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মমতসমূহের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতা-প্রভাবে তিনি যে সে যুগের সমস্যা-সমুদয়ের সমাধান করিবেন! দ্বাদশবর্ষব্যাপী সে মহাসাধকজীবনের প্রারম্ভ মাত্র!

পূজারি রামকৃষ্ণের সে কি অপূর্ব্ব পূজা! ঈশ্বরকে মা মা মা বলিয়া ডাকিয়া মায়ের স্বরূপ-দর্শনের জন্য সে কি অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা! ভাবময় রামকৃষ্ণের ভাবাপ্লুত কণ্ঠে ভক্তিমাধুর্য্যের সে কি অপূর্ব্ব প্রাণ-মাতান গান! পূজার সময়ে সে কি অপূর্ব্ব তন্ময়তা! সতীর পতির উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান এবং কৃপণের ধনের উপর যে টান, তাহার চাইতেও বেশী টান হইয়াছে সাধকের চিন্ময়ী জগদম্বাকে পাইবার জন্য! রামকৃষ্ণের প্রাণে অহরহঃ একটা আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে,—"রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্ মা, আমাকে কি দেখা দিবি না?" মায়ের দর্শনে হতাশ হইয়া আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়াছেন, বালুর উপর মুখ ঘসিতেছেন, আর অধীর হইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন! একদিন তিনি বিরহ-দুঃখ সহিতে না পারিয়া জীবন অবসান করিবার নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় মন্দিরের অসি লইবার জন্য ছুটিয়াছেন, এমন সময় সহসা মায়ের অদ্ভুত দর্শন পাইয়া সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন অসীম অনন্ত চিন্ময় জ্যোতিঃ-সমুদ্র, তাহার মধ্যে তাঁহার মা! এ সাধনা ভক্তের ব্যাকুলতার সাধনা, জ্ঞানীর ধীরতার সাধনা পরে আসিয়াছিল।

রামকৃষ্ণ সাধনার অভ্যন্তর হইলেন, ক্রমে বৈধী পূজার স্থলে রাগাত্মিকা পূজা দেখা দিল, এবং এক বৎসর শেষ হইতে না হইতে তাঁহার বাহ্যপূজা খসিয়া পড়িল। তিনি ক্রমে পূজকের কাজ হইতে অবসর লইলেন এবং অন্তরের প্রেরণানুযায়ী মাতৃভাবের উপাসনা করিয়া চলিলেন। এই সময়ে তিনি 'টাকা মাটি', 'মাটি টাকা' এইরূপ বিচার করিতে করিতে তুল্য জ্ঞান করিয়া টাকা ও মাটি দুইই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহার এমন হইয়াছিল যে, কোন ধাতুদ্রব্য, এমন কি ধাতু-নির্ম্মিত ঘটিও স্পর্শ করিতে পারিতেন না, করিলেই সে স্থানে জ্বালা করিত। ঘৃণা ও অভিমানের অতীত হইবার জন্য তিনি মেথরের ন্যায় স্বহস্তে অশুচি স্থান পরিষ্কার করিতেন। আবার দিব্যভাবের প্রেরণায় বালকের ন্যায় জগদম্বার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। একদিন জগদম্বা দর্শন দিয়া তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করেন, "ভাবমুখে থাক।"

অতঃপর রামকৃষ্ণের বিভিন্নমতের সাধনা আরম্ভ হইল ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ বৎসর বয়সে। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মাতার ইচ্ছানুযায়ী ছয় বৎসর-বয়স্কা সারদামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগতা ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী ঠাকুরাণীকে গুরু করিয়া তান্ত্রিক সাধনায় ব্রতী হ'ন এবং দুই বৎসরের মধ্যে চৌষট্টি তন্ত্রে যত প্রকার সাধনার উল্লেখ আছে, সকলই অনুষ্ঠান করেন। পঞ্চবটীবনে বিল্বমূলে পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসিয়া তিনি অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন। অবশেষে বীর-ভাবের শেষ সাধনেও সিদ্ধ হইয়া তিনি ক্রমে দিব্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি বৈষ্ণব-সাধনায় প্রবৃত্ত হ'ন এবং সর্ব্বাগ্রে জটাধারীর কাছ হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের

বালমূর্ত্তি রামলালার সেবায় অপূর্ব্ব বাৎসল্য-ভাবের সাধনা করেন। তাহার পর ছয়মাস কাল স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের আদর্শে শ্রীরাধিকার মধুর ভাবের সাধনা করেন।

মধুর ভাবের সাধনায় ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে উপনীত হইবার পর রামকৃষ্ণের মন ভাবাতীত অদ্বৈত ভূমিতে বিচরণের উপযুক্ত হইয়াছিল। ভাবাতীত অদ্বৈত ব্রহ্ম-সাধনাই হিন্দুর চরম সাধনা ও শ্রেষ্ঠ সাধনা, রামকৃষ্ণদেবেরও উহাই শেষ সাধনা। সগুণ উপাসনায় তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইয়াছিল, অপূর্ব্ব বিবেক ও বৈরাগ্যের অধিকারী হইয়া তিনি কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে নির্ব্বিকল্পসমাধি-সিদ্ধ পরমজ্ঞানী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ তোতাপুরী যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন এবং রামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হইয়া যোগ্যতম অধিকারী বিবেচনায় তাঁহাকে বেদান্ত-সাধনে প্রবৃত্ত করেন। তোতাজী গোপনে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস-দীক্ষা দান করিয়া তাঁহার নাম রাখেন রামকৃষ্ণ, এই নামেই তিনি পরবর্ত্তী কালে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সিদ্ধ গুরুর মুখ হইতে বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সমাধি-কৌশল লাভ করিয়া রামকৃষ্ণ অচিরে নির্ব্বিকল্পসমাধি-যোগে নামরূপাতীত জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি কৌতূহলবশে মুসলমান সাজিয়া এবং মুসলমানের ভাবে ভাবিত হইয়া ইসলাম ধর্ম্ম সাধন করেন এবং সত্বর ঐ সাধনায়ও সিদ্ধি লাভ করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ইহার আট বৎসর পরে।

প্রকৃতপক্ষে ২১ হইতে ৩৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী তাঁহার অলৌকিক তপস্যা-পূর্ণ. বিচিত্র ও বিবিক্ত সাধক-

জীবন। পরবর্ত্তী ছয় বৎসর কালে তিনি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ও জনসাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়া ভক্তি ও জ্ঞানভূমিতে দৃঢ়রূপে অবস্থিত হ'ন; এবং এই সময়ে ৩৯ বৎসর বয়সে ৺ষোড়শী পূজা অনুষ্ঠান করিয়া তিনি নিজ সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেন। ৺ষোড়শী পূজার দেবী ষোড়শী ছিলেন ঠাকুরের নিজ পত্নী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সারদামণি দেবী। সিদ্ধ পুরুষ ঈশ্বরী জ্ঞানে যৌবনারূঢ়া পত্নীকে পূজা করিয়া সমাধিস্থ অবস্থায় সেই যে আত্মস্বরূপে মিলিত হইলেন, ইহাই তাঁহাদের সত্য মিলন ও একমাত্র মিলন হইল। জিতেন্দ্রিয় পুরুষের কামগন্ধহীন দাম্পত্য প্রেমের দ্বিতীয় উদাহরণ ভারতবর্ষেও বিরল। ইহার পর তিনি কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ বৎসর কাল ইহলোকে ছিলেন। এই সময়েই গুরুভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের অখণ্ড প্রতিষ্ঠারূপ এবং সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়রূপ তাঁহার জীবনের মহত্তম কার্য্যে ব্রতী থাকেন।

এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী সুকঠোর সাধনায় তিনি নানা মত ও নানা পথ অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ একই সত্যে উপস্থিত হইয়াছেন। কালীমূর্ত্তি পূজা করিয়া, তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডী আসনে সাধন করিয়া, কিংবা বৈষ্ণব মতে বাৎসল্য বা মধুর ভাবের সাধন করিয়া, অথবা অন্য ধর্ম্মমতে উপাসনা করিয়া তিনি দ্বৈতভাবাশ্রয়ে একই সগুণ ব্রহ্মকে নানারূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভক্তিমূলক উপাসনায় সাকার বা নিরাকার ঈশ্বরের উপলব্ধিতেও চরমে কিছু পার্থক্য দেখিতে পান নাই। শেষ উপাসনা নির্ব্বিকল্পসমাধি-যোগে বেদান্ত-প্রোক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মোপাসনা, তাহার কিন্তু আর তুলনা ছিল না। তিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন,—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত মত পরস্পর বিরোধী নহে, কারণ উহারা একই অবস্থার সাধকের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি নহে,

উহারা বাস্তবিকপক্ষে সাধক-মনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপলব্ধি মাত্র, আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি বলিতেন,—"অদ্বৈতভাব শেষ কথা জান্‌বি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়"; তবে "বিষয়বুদ্ধিপ্রবল সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব।"

এই ভাবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিদ্বারা সর্ব্ব মত, সর্ব্ব পথ ও সর্ব্ব ধর্ম্মের সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া রামকৃষ্ণদেব বুঝিতে পারিলেন, "সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র।" তিনি বলিতেন,—"এক পুকুরে তিন চার ঘাট; এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে 'water'। তিনই এক; কেবল নামে তফাৎ! তাঁকে কেউ বল্‌ছে 'আল্লা'; কেউ 'God'; কেউ বল্‌ছে 'ব্রহ্ম'; কেউ 'কালী'; কেউ বল্‌ছে রাম, হরি, যিশু, দুর্গা।" সাকার নিরাকার সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—"যেমন জল আর বরফ। যখন জল জমাট বেঁধে থাকে, তখনই সাকার; আর যখন গলে জল হয়, তখনই নিরাকার।" তিনি আরও বলিতেন,—"আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে ছাখো কোন রং নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছাখো,—রং নাই!"

ইহাই প্রকৃত সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়, সাধনা-লব্ধ প্রত্যক্ষ অনুভূতি ইহার ভিত্তিভূমি। ইহা সকল ধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম বলিয়া সমান মর্য্যাদা দান করে। রুচি-ভেদে, প্রকৃতি-ভেদে, দেশ বা কাল এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজন-ভেদে নানারূপ ভিন্নতা আসে মাত্র; তাহা একান্তই বহিরঙ্গ ব্যাপার। কেশবচন্দ্রের নববিধান, যাহা সকল ধর্ম্মের সার-সংগ্রহকে অবলম্বন করিয়া অভিনব ধর্ম্মরূপে কল্পিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় নহে। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ঋষি ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবেরই বীর্য্যবান্ শিষ্য বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার শেষ ভাষণে পরম উদারতার সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন,—'Help and not Fight', 'Assimilation and not Destruction', 'Harmony and Peace and not Dissension,'—অচিরেই সকল ধর্ম্মের পতাকায় লিখিত হইবে—'সংগ্রাম নয়, সহায়তা'; 'ধ্বংস নয়, স্বীকরণ'; 'কলহ নয়, সমন্বয় এবং শান্তি'!" কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদের উপলব্ধিতেই এইরূপ উদারতা এবং দ্বৈতভাব-মূলক বিভিন্ন মতবাদের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সম্ভবপর। এক মহাসমুদ্রের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সরোবরের স্থান হইতে পারে।

ক্রমে তাঁহার উপলব্ধি হইতে থাকে যে, তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের যন্ত্র-স্বরূপ, তাঁহার সাধনাদ্বারা পৃথিবীর মহত্তম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হইবে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একদল পূত-চরিত্র, সেবা-ব্রত, ত্যাগ-বীর সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইবে। তপস্যার প্রভাবে তাঁহার চতুর্দ্দিকে যেন একটি আনন্দময় চিদাকাশমণ্ডল জাগ্রত হইয়া উঠিল। যে কেহ তাঁহার সঙ্গ-সান্নিধ্য লাভ করিয়া সে মণ্ডলে প্রবেশ করিলে, ক্ষণতরেও বিষয়ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ আনন্দময় দিব্য ভাবের আস্বাদ পাইতেন। বস্তুতঃ তাঁহার দিব্যপ্রভাব-বলে তিনি শুদ্ধ আত্মাদের আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিচারশীল পণ্ডিতগণ, শাস্ত্রব্যবসায়ী সমাজ-নায়কগণ আসিতে লাগিলেন; ভক্ত সাধুগণ ও বিবেকবান্ গৃহস্থগণ আসিতে লাগিলেন; কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়চন্দ্র গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য ব্রাহ্ম ভক্ত-মণ্ডলী আসিতে লাগিলেন; কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিয়া কলিকাতার শিক্ষিত জনমণ্ডলীর নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিতে

লাগিলেন, তিনিও আহূত হইয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। সব শেষে তাঁহার দেহ-ত্যাগের মাত্র ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আপন ভক্তমণ্ডলী নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম—এই ছেলের দল আসিতে লাগিলেন। এই ছেলের দলই শেষে সন্ন্যাসী হইয়া নরেন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ-মিশন স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহার শিক্ষা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিতে থাকেন। গৃহীকে তিনি নির্লিপ্তভাবে গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্ম সাধনা করিতে উপদেশ দিতেন। অতি সহজ ভাষায় উপমা দিয়া ও ছোট গল্পের অবতারণা করিয়া ইনি ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও বেদান্তের সুগভীর তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতেন। মধুর কণ্ঠে গান গাহিয়া, মিষ্টবচনে নানা রহস্যালাপ করিয়া আশ্চর্য্য প্রণালীতে ইনি ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেন; উপদেশ দিতে দিতে অনেক সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া বাহ্য জ্ঞান হারাইতেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর উত্তরপশ্চিম কোণে স্থিত তাঁহার বাসগৃহখানি আজ পুণ্য তীর্থে পরিণত হইয়াছে। ইঁহারই প্রভাবে নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসে; সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হ'ন এবং ইঁহারই প্রভাবে তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি-যোগে অহরহ আত্মানন্দে লীন না থাকিয়া, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় বিশ্বে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাকে জীবন-ব্রত করিয়া মহাকর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে অনেক শিক্ষিত ভক্তপুরুষ ইঁহাকে অবতার জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট রবিবার মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে গলক্ষত-রোগে আক্রান্ত হইয়া এই মহাপুরুষের মর্ত্ত্য-লীলার শেষ হয়।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত রামকৃষ্ণদেবের দেহ-পরিগ্রহের ২৭ বৎসর পরে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কলিকাতা মহানগরীতে সম্ভ্রান্ত

পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এটর্ণি ছিলেন; মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর সুশিক্ষা-প্রভাবেই বালকের বীর চরিত্র গঠিত হইতে থাকে। দুর্দ্দান্ত বালক বাস্তবিকই 'একগুঁয়ে দানা' ছিল; অথচ খেলাচ্ছলে ধ্যান করিতে করিতেও এমন তন্ময় হইয়া পড়িত যে, বিষধর সর্প তাহার সম্মুখে দেখিয়া সকলে ভয়ে চিৎকার করিলেও বালকের কর্ণে কিছুই প্রবেশ করিত না। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার প্রতিভা ও তর্কশক্তি আরও পরিস্ফুট হইতে থাকে। এই সময়েই তিনি খ্যাতনামা দার্শনিক হার্ব্বাট স্পেন্সরকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্র-প্রণালীর একটি সুচিন্তিত মন্তব্য প্রেরণ করিয়া বিস্মিত করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথে সঙ্গীত, বাদ্য, নির্দোষ রঙ্গ-পরিহাস, আবার মেধা, বাগ্মিতা, নির্ভীক্ বীর্য্যশক্তি সকল গুণেরই বিশিষ্ট প্রকাশ হইতেছিল। সহস্র ছাত্রের মধ্য হইতেও নাতিদীর্ঘ, দ্রঢ়িষ্ঠ ও ব্যায়াম-পুষ্ট দেহের পৌরুষ-মণ্ডিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং বিশাল আয়ত লোচনের মর্ম্মভেদী উজ্জ্বল দৃষ্টি এবং সর্ব্বোপরি একটি সরল রাজোচিত আভিজাত্য দেখিয়া তাঁহাকে দেবানুগৃহীত শক্তিমান্ পুরুষ বলিয়া চিনিয়া লইতে কাহারও কষ্ট হইত না। সেকালকার যুবকগণের ন্যায় তাঁহারও চিত্ত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রভাবে সংশয়বাদ ও নিরীশ্বর-বাদের দোলায় দুলিতেছিল। তিনি অবশেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হ'ন। কিন্তু সমাজে উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অশান্ত হৃদয়ে কোনও শান্তি আসিল না, ব্রাহ্ম প্রধান-গণের সঙ্গ করিয়াও তাঁহার ব্যাকুল ঈশ্বর-জিজ্ঞাসার কোন সংশয়চ্ছেদী উত্তর মিলিল না। তারপর একদিন সংশয়-দংশনে কাতর হইয়া উন্মাদের মত ছুটিতে ছুটিতে তিনি পরমহংসদেবের চরণোপান্তে প্রণত হইয়া

জিজ্ঞাসা করেন,—"মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" শান্ত স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে হৃদয়ে অমৃত স্পর্শের-সঞ্চার করিয়া উত্তর হইল,— "হাঁ বৎস! আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। তোমাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহার অপেক্ষাও স্পষ্টতর রূপে দেখিয়াছি। তুমি দেখিতে চাও? তাহা হইলে আমি যাহা বলি, তদ্রূপ আচরণ কর। তুমিও দেখিতে পাইবে।"

এই একই প্রশ্ন তিনি অনেক ধর্ম্মাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অল্পদিন পূর্ব্বে গঙ্গাবক্ষে বোটে অবস্থিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার ধ্যান বিঘ্নিত করিয়াও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কই এরূপ আশ্চর্য্য উত্তর তো কোথাও পান নাই! ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন, ধীরে ধীরে এই অর্দ্ধোন্মাদ ব্যক্তির চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া লইলেন। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া নরেন্দ্রনাথ নিজ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ১৭ বৎসর বয়সে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই রামকৃষ্ণদেব বুঝিয়াছিলেন, এই যুবক একদা মহাশক্তিধর পুরুষরূপে প্রকাশিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী কম্পিত করিবে। দ্বাদশবর্ষব্যাপী সাধনায় যে আধ্যাত্মিক মহাসত্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, এই যুবকই বিশ্বে তাহা প্রচার করিবে। তিনি তাঁহাকে পরমাত্মীয়ের ন্যায় আপনার হইতে আপনার করিয়া নিজের অভিন্ন স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

বি, এ, পরীক্ষা দিবার অল্প পরেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। বি, এল্ পরীক্ষার ফিস জমা দিতে যাইয়া অকস্মাৎ তাঁহার প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়,—এ তিনি কি করিতেছেন? পড়িয়া

রহিল তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া আর পরীক্ষার টাকা জমা দেওয়া! চৈতন্যোদয়ে তিনি অচৈতন্য উন্মাদের ন্যায় ঐ অবস্থায়ই নগ্নপদে ছুটিতে ছুটিতে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার কৃপালাভ করিয়া সংসার, স্বজন, দুঃখ, দারিদ্র্য, ভবিষ্যৎ ঐশ্বর্য্য ও মানযশ—সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পরম অনুরাগ ও ব্যাকুলতার সহিত সাধন-সাগরে ডুবিয়া গেলেন। দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত তপস্যা করিতে করিতে ঈপ্সিত ফললাভেও অধিক বিলম্ব হইল না। গুরুদেব তখন তাঁহার সমাধির ঘরে চাবি দিয়া এই জ্ঞানী ও ভক্ত পুরুষকে জনগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য মহাকর্ম্মযোগে দীক্ষিত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন,—"এরা জন্ম থেকেই ব্রহ্মজ্ঞানী, নিত্য-সিদ্ধের থাক। এরা কখনও কামিনী-কাঞ্চনের মায়ায় বদ্ধ হয় না।"

রামকৃষ্ণদেবের গূঢ় উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে নরেন্দ্রনাথই সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন। একদিন অর্দ্ধবাহ্যদশায় পরমহংসদেব বলিতেছিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না,—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!" নরেন্দ্রনাথ ঐ এক কথায় অদ্ভুত আলোক লাভ করিলেন, বন্ধুদের নিকট উহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে করিতে ভাবাভিভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে আমার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। ভগবান্ যদি কখন দিন দেন ত আজ যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্ব্বত্র প্রচার করিব; পাণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া

মোহিত করিব।” ভগবান্ দিন দিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে দিব্যবাণী মহাসঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়াছিল,—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর!

দিব্যবাণী অপূর্ব্ব মন্ত্রে রূপ পাইয়া ফুটিয়া উঠিল,—দরিদ্র-নারায়ণ! ক্ষুধিত-নারায়ণ! ব্যাধিত-নারায়ণ! আর্ত্ত-নারায়ণ! আর দান নয়, সেবা সেবা সেবা! এই মন্ত্র বিবেকানন্দের সাধনায় দিব্য প্রেরণার সঞ্চার করিয়া শুধু রামকৃষ্ণসঙ্ঘকে নয়, তাঁহার সকল স্বদেশবাসীকেও রোগে, দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, ভূমিকম্পে, মহামারীতে আর্ত্ত-নারায়ণের সেবাকল্পে কত মহৎকার্য্যে ব্রতী করাইল! রামকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত ক্ষুদ্র বীজ বিবেকানন্দের সাধনায় পুষ্টিলাভ করিয়া শাখা-প্রশাখা-বহুল বিশাল বৃক্ষের শান্ত শীতল ছায়াতলে তাঁহার দুঃস্থ স্বদেশবাসীকে আশ্রয় দান করিল।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় এবং আধ্যাত্মিকতা-প্রচার, সেবা-ধর্ম্মের প্রচার এবং মানুষ-গঠন—এই তিন ব্রত তিনি তাঁহার গুরুর নিকট হইতে লাভ করিলেন। আর লাভ করিলেন রামকৃষ্ণের শিষ্যবর্গ, তাঁহারই গুরুভাই-গণকে পরিরক্ষণের কর্ত্তব্যভার। নরেন্দ্রনাথের তীব্র বৈরাগ্যোদয়ের মাত্র এক বৎসর পরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণদেব তাঁহার সমুদয় শক্তি এই যোগ্যতম শিষ্যকে অর্পণ করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে তাঁহার সহিত একীভূত হইলেন এবং নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। শিষ্যের বয়স তখন ২৩ বৎসর মাত্র! নরেন্দ্রনাথ আর নাই, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছেন। ইহার পর ছয় বৎসর তাঁহার পরিব্রাজক-জীবন এবং দশ বৎসর তাঁহার বিপুল কর্ম্ম-জীবন। রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের ষোল বৎসর পরে তাঁহার প্রিয় শিষ্য

বিবেকানন্দের জীবনাবসান হয়। ততদিনে ভারতবর্ষের ও বিশ্বের বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে।

তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর কাল পরিব্রাজক-বেশে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ পদব্রজে ভ্রমণ করেন। গিরিগুহায় এবং অরণ্যে, সিন্ধুতীরে এবং মরুভূমিতে, নগরে এবং পল্লীগ্রামে স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া তিনি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক মূর্ত্তি উপলব্ধি করেন। দীনের কুটীরে এবং রাজার প্রাসাদে, পণ্ডিত-সভায় এবং সন্ন্যাসীর মঠে অবস্থান করিয়া তিনি ভারতমাতার আভ্যন্তর রূপ—তাঁহার সনাতন ও তদানীন্তন উভয় মূর্ত্তি দর্শন করেন। ভারতবর্ষের অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, সহায়হীন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ বিশাল জনসমাজের জন্য তাঁহার প্রাণ কান্দিয়া উঠে। উহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবে কে? উহাদের রক্ষা করিবে কে? তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পাশ্চাত্ত্যের সহিত প্রাচ্যের আদান-প্রদান না হইলে পাশ্চাত্ত্যেরও রক্ষা নাই, প্রাচ্যেরও রক্ষা নাই। ইহলোক-সর্ব্বস্ব, ভোগ-লোলুপ-চিত্ত বহির্ম্মুখী পাশ্চাত্ত্যকে বাঁচাইতে হইলে চাই প্রাচ্যের ত্যাগ, অন্তর্ম্মুখিতা ও আধ্যাত্মিকতার বাণী-প্রচার। প্রাচ্যের প্রাণ-পুষ্টির জন্য আবার চাই পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্ত্যের সঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি। তিনি মহাদাতা ও মহাভিক্ষুক-বেশে পাশ্চাত্ত্যদেশে উপস্থিত হইবেন, পাশ্চাত্ত্য কি তাঁহার আধ্যাত্মিকতার বাণী শুনিবে না? তাঁহার অঞ্জলি ভরিয়া রাশি রাশি অর্থ ভারতবর্ষের মূক, মূর্খ, সর্ব্বসুখ-বঞ্চিত, অতিদীন, অগণিত জনমণ্ডলীর জন্য দিবেনা? বিবেকানন্দ অন্য কারণেও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। স্বর্গ হইতে পতিত পূত মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় তিনি যে গুরু রামকৃষ্ণের মহতী বাণী শিবতুল্য হইয়া ধারণ করিয়াছেন, তাহা যে মর্ত্ত্য-

লোকে নির্গম-পথ না পাইয়া আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া কেবলই দুর্ব্বার বেগে আঘাত করিতেছিল। কোন্ দেশে, কোন্ সভায়, কাহাদের উদ্দেশ্যে তিনি সে বাণী প্রথম উচ্চারণ করিবেন? এমন সময়ে সুদূর সমুদ্র পারের ডাক আসিল। বিবেকানন্দের মাদ্রাজী শিষ্যগণ ও ভক্ত রাজন্যমণ্ডলীর উৎসাহে এবং অন্তরের সুগভীর প্রেরণায় তিনি প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া আমেরিকার চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় উপস্থিত হইলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। শীর্ষে গৈরিক-রঞ্জিত উষ্ণীষ, অঙ্গে গৈরিক-রঞ্জিত আলখাল্লা, বদনে ব্রহ্মবিভা, সুবিশাল আয়ত নয়নে প্রজ্ঞা-দীপ্ত দৃষ্টি, মহাসভা-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর পৌরুষ-কণ্ঠে অসীম স্নেহের স্পর্শ! তিনি মূর্ত্তিমান্ বেদান্ত-জ্ঞানের ন্যায় আমেরিকাবাসী নরনারীকে ভাই ও ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, সে সম্বোধন তাহাদের কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিল। সেই একটি ক্ষণে তিনি আমেরিকাবাসীর অন্তর জয় করিয়া লইলেন। তারপরে যেদিন তিনি রামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের বাণী বন্ধনমুক্ত মহাসিংহের গর্জ্জনে পরম অভয় ও পরম প্রেমের সহিত ঘোষণা করিলেন, সেদিন উদার-প্রাণ আমেরিকাবাসী সন্ন্যাসীকে গুরুর আসনে বরণ করিয়া লইল।

বিশ্ববিজয়ে বেদান্তের এই প্রথম অভিযান। পাশ্চাত্ত্য দেশে বেদান্ত-জ্ঞানের এই প্রথম উদ্বোধন। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য উভয়েরই পরম মঙ্গলের জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন ছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ এই ধর্ম্ম-মহাসভার আয়োজন করিয়াছিলেন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণ করিয়া বিশ্বব্যাপী এক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য বিস্তার

করিবার জন্য। এই বজ্রবাহু মহাযোদ্ধা সন্ন্যাসী ভীমবলে আক্রমণ করিয়া পাশ্চাত্ত্যের প্রাণদুর্গ জয় করিয়া লইলেন। খ্রীষ্টীয় যাজকমণ্ডলীর উদ্ধত অভিমান, এবং সদম্ভ স্ফীতি মন্ত্রৌষধির সম্মুখে সর্পফণার ন্যায় অদৃশ্য হইল। প্রাচ্যদেশেও খ্রীষ্টীয় মিশনারি ও ব্রাহ্মপ্রচারকগণের বহুনিন্দিত হিন্দুধর্ম্ম নিঃশঙ্ক-চিত্তে বিজয়গর্ব্বে আবার শির উত্তোলন করিল।

বিবেকানন্দ যখন সাধক ও পরিব্রাজক ছিলেন, তখনও তো দেশে সিদ্ধ মহাপুরুষের অভাব হয় নাই! তিনি ৺কাশীধামে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর-সদৃশ ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও সদানন্দময় ভাস্করানন্দ স্বামীকে দেখিয়াছিলেন, গাজীপুরে মহাত্মা পওহারী বাবার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছ হইতে নূতন করিয়া দীক্ষা লইবার কথা পর্য্যন্ত ভাবিয়াছিলেন। তখনও সাধু কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি যুক্তিবাদের আশ্রয়ে হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। পূর্ব্বভারতে ব্রাহ্মসমাজ এবং পশ্চিম ও উত্তর ভারতে আর্য্যসমাজ যে প্রবল আন্দোলন চালাইতেছিল, তাহাতে খ্রীষ্টীয় মতবাদ ও হিন্দু মতবাদ উভয়ই আক্রান্ত হইতেছিল। এই উভয় সমাজই বৈদিক সাধনার অংশবিশেষকে নিজ নিজ ব্যাখ্যানুযায়ী গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সহস্র সহস্র বৎসরের শাস্ত্রধারা ও সাধনাধারাকে—পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ণবসংস্কৃতি-ধারাকে অস্বীকার করিয়াছিল। অবশ্য এই সংস্কার-আন্দোলনগুলি মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু ব্যতীত কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্ত্যভূমিতে বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র শাস্ত্রধারা ও সংস্কৃতিধারা-সহ, প্রতিমাপূজা-

সহ অখণ্ড হিন্দুধর্ম্মের নবীন প্রতিষ্ঠা হইল এবং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যতঃ বন্ধ হইয়া গেল।

বিবেকানন্দস্বামী আমেরিকার নগরে নগরে বেদান্তের বিজয়াভিযান আরম্ভ করিলেন। ভক্ত, জ্ঞানী, পণ্ডিতগণের তো কথাই নাই, অনেক নাস্তিক জড়বাদী পর্য্যন্ত তাঁহার অনুরাগী ও ধর্ম্মবিশ্বাসী হইতে লাগিল। গৌরবপুঃ সাহেব শিষ্যগণ তাঁহার পাদবন্দনা করিতে লাগিল। তাঁহার বক্তৃতাগুলি সংগৃহীত হইয়া রাজযোগ, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এই তিন গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল। স্থায়ী বেদান্তপ্রচার-সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু স্বদেশবাসী অনাহার-ক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ দরিদ্রগণের জন্য তিনি আমেরিকা হইতে কোন সাহায্য লাভ করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, তিনি ইংলণ্ডেও আশাতীত সফলতার সহিত বেদান্ত প্রচার করিলেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত তিনি যে রাজসমারোহ-পূর্ণ বিরাট অভ্যর্থনা, আন্তরিক অভিনন্দন ও সশ্রদ্ধ পূজা লাভ করিলেন, তাহা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব। ভারতবর্ষেও তিনি ঘূর্ণীবাত্যার ন্যায় বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঋষি রামকৃষ্ণের বাণী ও বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কলিকাতার সন্নিকটে বেলুড় গ্রামে বেলুড় মঠ স্থাপিত হইল। সেখানে রামকৃষ্ণসঙ্ঘ সগৌরবে মহৎকার্য্যে ব্রতী হইল। তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্য ও শিষ্যাগণ এদেশে আসিয়া কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন। বেদান্তধর্ম্ম ও সেবাধর্ম্ম উদ্‌যাপন করিবার জন্য নানাস্থানে রামকৃষ্ণ-মিশন ও মিশনের অধীনে সেবাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, পাঠশালা ও আরোগ্যশালা স্থাপিত হইতে লাগিল। সমগ্র ভারতব্যাপী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথমে বিশাল জনসমাজের সত্তা অনুভব করেন ; তাহাদের নিঃস্ব ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা তাঁহাকে কাতর করিয়া তুলে। তিনি বুঝিতেছিলেন, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে যাওয়া মূঢ়তা মাত্র। ভারতের নিষ্পেষিত, পদদলিত জনসঙ্ঘকে আগে খাদ্য দিয়া, পরে বিদ্যা দিয়া ও শেষে আত্মজ্ঞান দিয়া উদ্বোধিত করিতে হইবে। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না ; মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই।" এই মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে এবং ভারতকে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাইতে স্বামীজি চাহিয়াছিলেন সহস্র সহস্র বীরহৃদয় বিশ্বাসী যুবক, আর কোটি কোটি টাকা। তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশে ভিক্ষা চাহিয়া তিনি ব্যর্থ-কাম হইয়াছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভিন্ন কোন ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টায় কদাচ এ মহাসমস্যার সমাধান হইতে পারে না। ধনী অভিজাতশ্রেণী, এমন কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শরীরে ক্ষয়রোগ প্রবেশ করিয়াছে, তিনি তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতেছিলেন। অবজ্ঞাত কিন্তু অগণিত জন-পুঞ্জের মধ্যেই ভারতবর্ষের শক্তি বর্ত্তমান, ইহা বুঝিতেও তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। তিনি বলিতেন, 'নবীন ভারত বেরিয়ে আস্‌বে' জোলা-যুগী, মুচি-মালো, কৃষক-শ্রমিকের কুটীর হইতে। তিনি চাহিয়াছিলেন মানুষ, তিনি স্পষ্ট বলিতেন,—"I want to preach a man-making religion.—আমি চাই মনুষ্যত্ব-সংগঠক এক মহাধর্ম্মের প্রচার।" হিন্দুর মনুষ্যত্ব-নাশক অস্পৃশ্যতা-পাপের বিরুদ্ধে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ক্ষোভ-রোষ-পূরিত কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন, —"ছুঁস্‌নে', 'ছুঁস্‌নে', দেশে কি আর দয়াধর্ম্ম আছেরে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল। অমন আচারের মুখে মার ঝেঁটা—মার্ লাথি!

এরা না উঠ্‌লে মা জাগ্‌বেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা কর্‌তে পারলুম না, তবে আর কি হল! দে সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র।" বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন প্রত্যেক জাতিরই বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট একটি বিশেষত্ব আছে, একটি অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহারই জন্য সে বাঁচিয়া থাকিবার দাবী করিতে পারে, তাহারই অভাবে তাহার বিলোপ বা বিনাশ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের সেই বিশেষত্ব তাহার আধ্যাত্মিক সাধনা-ধারায়। ভারতবর্ষকে তাই একদিকে বৈদেশিক ভাবসমূহের উপপ্লাবন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, অপর দিকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-রাশি প্রচার করিয়া পাশ্চাত্ত্য জগতের চিন্তাস্রোতকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, সংস্কার-যুগের বৃহৎ নেতৃবৃন্দ এ তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। অর্দ্ধশতাব্দী পরেও ভারতবর্ষে কেহ এমন কোন নূতন চিন্তা করিতে পারেন নাই, যাহার সুস্পষ্ট বীজ বিবেকানন্দের বাণীসমূহে নিহিত নাই। বিবেকানন্দ যাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি মহান্; কিন্তু তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন ও করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি মহত্তম। তাঁহার যুগ-প্রবর্ত্তক বাণী-দর্পণে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।

দশবর্ষব্যাপী অবিশ্রান্ত কর্ম্মচেষ্টায় ও প্রচারচেষ্টায় তাঁহার বজ্র-সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহও ভাঙ্গিয়া পড়িল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাস শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার মনও অলৌকিক কারণে মহাশক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হইয়া সমাধি-সাগরে ডুবিতে চাহিল। তাহার পর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই

বেলুড়মঠের কক্ষকুট্টিমে শায়িত অবস্থায় তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত কার্য্যসমূহ প্রসার করিয়া চলিয়াছেন, বিবেকানন্দ-কল্পিত কার্য্য-সাধনে তেমন তৎপর হইতে পারেন নাই। রামকৃষ্ণের আচরিত তপস্যা-সাধনে বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তনায় তাঁহারা সমধিক মনোযোগী হইতে পারেন নাই।

কিন্তু বিবেকানন্দের দায় কেবলমাত্র তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভাই ও শিষ্যগণের উপরেই অর্পিত নয়; তাঁহার স্বদেশবাসী সকলের উপরই তাহা সমানভাবে ন্যস্ত। বাঙ্গালাদেশে প্রথম যখন জাতীয় জাগরণ আসে, তখন তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল বিবেকানন্দ-বাণী, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র ও আনন্দমঠ এবং গীতা। আজও ধর্ম্ম-সংস্কারে, সমাজ-সংস্কারে, জনগণের মুক্তি-সাধনে, জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠায় এবং মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে শক্তির সন্ধান করিতে হইলে এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দের আরাধনা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগ

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ! জগচ্চক্র অনেকখানি আবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যজ্ঞধূম-পবিত্রিত বৈদিক যুগ আর নাই, আজ সহস্র সহস্র যন্ত্র-দানবের উর্দ্ধমুখ হইতে নিঃসৃত ধূম্রপুঞ্জে ভারতের আকাশ কালি-মলিন। সে অরণ্য নাই, অরণ্য-মধ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষির শান্তরসাস্পদ আশ্রমও নাই, আশ্রমে গুরুকুলে তপস্যারত ব্রহ্মচারি-বর্গের সে বিদ্যাভ্যাসও নাই। আজ নগরে ও সহরে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষক ও ছাত্রের মিলন নির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য একটা চুক্তি-গত সম্পর্কমাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে, সেখানে দীপ হইতে দীপ জ্বলে না, একের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে অপরের নব জীবনের সঞ্চার হয় না। ফলে ছাত্রগণের লেখাপড়া শিক্ষা হইলেও চিন্তাশক্তির বিকাশ হয় না, কথঞ্চিৎ মানসিক জ্ঞান হইলেও মননশীলতা জন্মে না। ভারতের বীরযুগের অবসান হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা নাই, প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্ব আসিবে কোথা হইতে? কিন্তু সর্ব্বগ্রাসী রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রাচীন ধর্ম্মনীতির স্থান অধিকার করিয়া জীবনের অবসর ও তাহার সহিত শান্তি, স্বাস্থ্য ও আনন্দ হরণ করিয়া লইয়াছে। বেদান্ত, গীতা, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক বা বৈষ্ণব উপাসনা নিষ্ঠাবান্ মুষ্টিমেয় লোককে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে। গুরু শিষ্যের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, পিতা পুত্রকে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্ম ও সমাজের ভবিষ্যৎ ধারক ও নায়ক নবীন প্রাণের সাড়া কই? তাহাদের একদল মানব-মনের মর্য্যাদা-বোধকে বিসর্জ্জন দিয়া নূতনত্বের উন্মাদনায় যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাধুনিক মতবাদ, তাহাকেই যেন নির্ব্বিচারে গিলিতে চাহিতেছে,

এবং জীবনবাদের নামে জঘন্য জড়বাদের মোহে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে! সত্য, ন্যায়, ধর্ম্ম সকল শুভ সংস্কারই যেন অর্থহীন ফাঁকি হইয়া উঠিতেছে। অসত্য, অসংযম, অসাধুতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সদম্ভে শক্তি বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাবও অবসিতপ্রায়। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানের সহিত জিজ্ঞাসার, ফলের সহিত তপস্যার, প্রাপ্তির সহিত আকাঙ্ক্ষার, প্রৌঢ়ত্বের সহিত যৌবনের এমন মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ ভারতবর্ষে আর কখনও দেখা যায় নাই! জীবনের পূর্ণতা-সাধন, ধর্ম্ম-সাধন, যোগ-সাধন, মানবপ্রেম, আত্ম-সাক্ষাৎকার, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ এই সকলই কেবল কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে কথাও সমাজে আর বড় শোনা যায় না! ইহা কেবল বহির্ম্মুখিতা ও ভোগ-লোলুপতা নয়, ইহা অন্তর্ম্মুখিতা ও আত্মিক সত্তার অস্বীকার এবং ত্যাগ-ধর্ম্মের ব্যঙ্গ। ইহা কেবল শ্রেয় ফেলিয়া প্রেয়কে গ্রহণ নহে, শ্রেয়কে উপহাস। ইহামাত্র প্রাসাদ-স্তম্ভের জীর্ণভাব নহে, প্রাসাদ-ভিত্তিমূলের গোপন ক্ষয়। বাস্তবিক পক্ষে সমাজের প্রাণশক্তি এখন কেন্দ্র-চ্যুত। পরিবার, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, জীবনাদর্শ, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক, মানবের সহিত মানবের সম্পর্ক সকল বিষয়েই প্রাচীন নীতি, ধারণা ও দৃষ্টি-ভঙ্গী যেন পরিবর্ত্তিত কিংবা বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে; জীবনের মূল্য আজ নূতনরূপে নির্দ্ধারিত হইতে যাইতেছে। এ এক সভ্যতার সঙ্কটকাল। সর্ব্বত্রই একটা অসন্তোষ, একটা সংশয় ও অবিশ্বাস, একটা অস্থিরতা ও অস্পষ্টতা, ভাবে ও চিন্তায় একটা বিহ্বলতা আমাদিগকে একান্ত বিপন্ন ও বিমূঢ় করিয়া ফেলিতেছে। এই বিমূঢ়তা কেবল মাত্র অভিনব ভাব ও চিন্তার আক্রমণের জন্যই যে হইয়াছে, তাহা নহে; রক্ষণশীলগণের অন্ধ গোঁড়ামি, যাহা কিছু প্রাচীন ও প্রথা-গত তাহারই

প্রতি বিচারহীন আসক্তি, মহাকালের আবির্ভাব-লক্ষণ দেখিয়াও একটা নিশ্চেষ্ট ঔদাসীন্য, সত্যকে নবীনরূপে গ্রহণ করিবার একান্ত অনিচ্ছা ও অক্ষমতা সঙ্কটকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ উভয়েই বলিতেন, পেটে ক্ষুধার জ্বালা লইয়া ধর্ম্ম-সাধন হয় না, মোটা ভাত ও মোটা কাপড় চাই। একদিকে বিদেশীয় শক্তির শাসন ও শোষণে, অপরদিকে দেশহিতকর শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ঐ শক্তির একান্ত কুণ্ঠা ও কার্পণ্যে দেশ আজ অর্থহীন, অন্নহীন, স্বাস্থ্যহীন ও ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজের সৃষ্টি দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া মরণদ্বারে চলিয়াছে। ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের বাহ্য চাকচিক্য সত্ত্বেও ভিতরে ক্ষয়বীজাণু প্রবেশ করিয়া জীবন-মূল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। একটা কঠিন অন্নসমস্যা, একটা দারুণ জীবন-সংগ্রামে সকলেই ভীত ও স্বভাব-চ্যুত হইয়া পড়িতেছে।

'ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্য বঙ্গের চেতনা সঞ্চার হয় কেশবচন্দ্র সেনের ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার-মূলক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায়। ইহার পঁচিশ বৎসর পরে জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু-প্রমুখ নেতৃগণের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ফলে তখনকার 'ইয়ং বেঙ্গল' রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। বস্তুতঃ জাতীয় জীবন-সমস্যার আশু সমাধানের আশায় দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ক্রমশঃ রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাবে আদর্শবাদী একদল যুবক কেবল আধ্যাত্মিকতায়, অপর দল

আধ্যাত্মিকতা-পুষ্ট রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়। এই সময় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল-প্রমুখ মনস্বী নেতৃগণের পরিচালিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিপন্ন না করিয়া পুষ্টই করিতে থাকে। ঐ নেতৃবৃন্দের জীবন উচ্চাঙ্গের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। কবি-সার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথ অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী বিপুল সাহিত্য-সাধনায়, গানে, কবিতায়, ধর্ম্মালোচনায়, বিবিধ বক্তৃতায় মানবীয় জীবন-বৃক্ষের বহু শাখা-প্রশাখার বিচিত্র ফল-সকল স্বদেশের বাঙ্গালীসমাজ ও বিশ্বের মানবসমাজের সম্মুখে অমৃতরসে পরিবেশন করিয়াছেন। মহাবৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবনব্যাপী যোগসাধনাও ভারতীয় সংস্কৃতির উপলব্ধ পুরাতন সত্যকেই সূক্ষ্ম যন্ত্র-বিজ্ঞানের সহায়তায় চাক্ষুষভাবে নূতন করিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক-বর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নীতি-নিষ্ঠ ত্যাগপূত সরল ঋষি-জীবনও ভারতীয় সংস্কৃতির মহিমাকেই বরণীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। ঋষি অরবিন্দের পণ্ডিচেরি-আশ্রমের সাধনা অন্ধকার-গৃহে দীপশিখার ন্যায় একটী মৃদু কিন্তু অম্লান আলোক স্থিরপ্রভায় বিকিরণ করিতেছে। তারপর মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী-প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং তাঁহার স্বয়ং-সিদ্ধ জীবন সত্য ও অহিংসাকেই মূল ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষের ও জগতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর অন্তরে প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক ভারতীয় সংস্কৃতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু পরাধীন ভারতের মুল প্রশ্ন—স্বাধীনতালাভের প্রশ্নের এখনও কোন সমাধান হয় নাই। তাই ক্ষুধা ও ব্যাধির তাপে ভারতীয় জীবন-সরোবরের সলিল-

রাশি শুষ্ক-প্রায়, আধ্যাত্মিকতার শ্বেত শতদল বিকশিত হইবে কোথায় ?

প্রকৃতিদেবী ভারতবাসীর উপর চিরপ্রসন্ন, স্মরণাতীত কাল হইতে মমতাময়ী মাতার ন্যায় বাহিরের ও অন্তরের ঐশ্বর্য্যরাশি কল্যাণহস্তে বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। বাহিরের ঐশ্বর্য্য তাহাকে খুঁজিতে হয় নাই, তাই অন্তরের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান ভারতবাসীর পক্ষে সহজ হইয়াছে। রৌদ্রালোকিত, জ্যোৎস্না-পুলকিত অথবা নক্ষত্রের মণিমালাদীপ্ত সুনীল আকাশ, দিকে দিকে নির্ম্মলমধুর বাতাস, আর প্রসন্নসলিলা নদীমালার সলীল প্রবাহ, রত্ন-গর্ভা ও রত্নপ্রসূ শস্যশ্যামলা ভারতভূমি! এই দেশের সন্তানগণের কদাচ জীবন-ধারণের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হয় নাই। স্বচ্ছন্দ বনজাত শাক, উদ্যানজাত ফল ও মূল, কর্ষণজাত সুখলভ্য শস্য এবং ধেনু-লক্ষীর দান দুগ্ধ ও ঘৃত, ইহাতে কাহার না তৃপ্তি হয়? ভারতবাসিগণ তাই সন্তোষ ও বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সংযম-নির্ম্মল চিত্তে সহজেই প্রকৃতির পরপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, নিখিল ভুবনের সকল হইতে প্রিয় অন্তরতম পরমাত্মার ধ্যান ও উপলব্ধির আনন্দে মগ্ন রহিয়াছেন। বহিঃপ্রকৃতির অভয় পাইয়া তাহার চিত্ত বহির্ম্মুখিতা পরিহার করিয়া সহজেই অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধানে অন্তর্ম্মুখী হইয়া অমৃতত্ব আস্বাদন করিয়াছে। এখানে তাই ক্ষত্রিয়ের রাজ্য-জিগীষা ও শৌর্য্য-মহিমা কদাচ জনগণের কল্পনা উদ্দীপ্ত করে নাই, ব্রহ্ম-মহিমার রহস্যবিৎ ঋষিগণ এবং গৌতম-শঙ্কর-গৌরাঙ্গ তুল্য লোকোত্তর পুরুষগণই তাহাদের সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশের ইতিহাস ভিন্নরূপ। প্রকৃতি সেখানে নির্ম্মম, নিষ্ঠুর; অন্ন, বসন, বাসস্থান ও জীবনযাত্রা-প্রণালী কিছুই প্রাচ্যের

ন্যায় সুলভ বা সহজ নহে। তাই সে দেশের মানুষ সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ দ্বারা বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করিয়া বিজ্ঞানবলে তাহার সকল শক্তি অর্জ্জন করিতে চাহিয়াছে। জীবন-সংগ্রাম সে দেশে প্রথম হইতেই ভয়াবহরূপে সত্য এবং প্রথম সংগ্রামই বিরুদ্ধ বাহ্য প্রকৃতির সহিত। তাই ভারতবর্ষ যখন আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতায় অগ্রসর হইয়া বাস্তব জীবনের প্রতি অপেক্ষাকৃত উদাসীন রহিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য তখন বহির্ম্মুখী হইয়া বিজ্ঞান ও বাস্তব জীবনের সমৃদ্ধি ঘটাইয়াছে।

আজ কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ব্যবধান দূর হইয়াছে, উভয়ের অবস্থা প্রায় একই প্রকার। শক্তিবিজ্ঞানের বরপুত্র পাশ্চাত্ত্য তাহার বলিষ্ঠ বিজয়ী বাহু বিস্তার করিয়া প্রাচ্যকে কবলিত করিয়াছে, তাহার অন্ন, অর্থ, সম্পদ, শক্তি সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া আপনার প্রয়োজন ও বিলাস-লালসা চরিতার্থ করিতেছে। প্রাচ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারও আজ শূন্যপ্রায়। পাশ্চাত্ত্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া প্রাচ্য ভাবিতেছে, তাহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বিজ্ঞানের সাধনায় ঐহিক অভ্যুদয় ঘটাইয়া পাশ্চাত্ত্যের সমকক্ষ হইতে হইবে। তাহার শান্ত অন্তর্ম্মুখিতা ও আধ্যাত্মিক মননশীলতা পূর্ব্বেই মন্দ হইয়া আসিতেছিল। বিজ্ঞানের প্রসাদে আজ পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের বহির্ম্মূর্ত্তি প্রায় একই হইয়া গেল। কলিকাতা, লণ্ডন, ওয়াশিংটন ও টোকিও এর পার্থক্য কোথায়? বাষ্পীয়পোত, বিমানপোত, মোটর-যান, সবাক্ ও নির্ব্বাক্ ছায়াচিত্র, গ্রামোফোন, রেডিও, বৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ কলকারখানা, স্থাপত্য-পদ্ধতি, রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি, ব্যবহারবিধি, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রয়োগবিধি পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সকল দেশেই আজ প্রায় একই প্রকার। জাতিতে জাতিতে ও দেশে দেশে আজ

বড় প্রভেদ নাই। বিশ্ব আজ এক অখণ্ড শরীরযন্ত্র-রূপে কাজ করিতেছে। বলা বাহুল্য, বাহিরের রূপের সঙ্গে অন্তরের রূপেও আজ ঐক্য দেখা যাইতেছে। ইহাও বিজয়ী পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব সন্দেহ নাই। বাহিরের ঐক্যরূপ বাহিরের যান্ত্রিক সভ্যতা ও যান্ত্রিক সমৃদ্ধি; অন্তরের ঐক্যরূপ ইহ-সর্ব্বস্বতা, ভোগ-লোলুপতা, ব্যক্তি-গত বা জাতি-গত সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ-পরতা এবং উহাদের পশ্চাতে নীতি ও ধর্ম্মের অস্বীকার-রূপ জড়বাদ-পরায়ণতা। এই বাহির ও অন্তরের ঐক্যরূপই বিশ্বে সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত ও জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ প্রাত্যহিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। যে বেগে জড়-বিজ্ঞান অগ্রসর হইয়াছে, সে বেগে মানবমৈত্রী ও ধর্ম্মবিজ্ঞান অগ্রসর হয় নাই, বরং বুদ্ধির বিকৃত প্রয়োগে তাহা ক্রমশঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে।

আজ পাশ্চাত্ত্য ভাব ও সংস্কৃতির কথা বাদ দিয়া প্রাচ্য ভাব ও সংস্কৃতির কথা ভাব যায় না। উভয় উভয়কে প্রভাবিত ও পরাভূত করিতে চাহিতেছে। বিজ্ঞানের বলে দেশ ও কালের ব্যবধান চূর্ণ হওয়ায় পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতি-সমূহ পরস্পরের নিকট প্রতিবেশী হইয়াছে; কিন্তু কেহ বা শত্রু, কেহ বা মিত্র। শত্রু বা মিত্রগণের প্রতিযোগিতা বা সহযোগিতার জন্য পরস্পরের চরিত্র একই নীতি-বলে গঠিত হইতেছে। পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়ক-গণের নগ্ন স্বার্থরূপ অনেক সময়েই প্রতিবেশীরশোণিত-পিপাসু হিংস্র আদিম পশু-রূপ। মানবজাতির এতদিনের ধর্ম্ম ও মৈত্রীসাধনা ধনিক, বণিক ও রাষ্ট্রনায়কগণের মিলিত চক্রান্তের ফলে বিলুপ্তপ্রায়। বর্ত্তমান সভ্যতার রক্ষা কেবলমাত্র ধর্ম্মসমন্বয় দ্বারা হইতে পারে না; কারণ ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়াই এই সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের সম্মুখে একই

সমস্যা উপস্থিত। বরং এই বুদ্ধিভ্রংশ-কর জড়দর্শনের অভ্যুদয়ে সকলধর্ম্মকে পরস্পারের তুচ্ছ ভেদ অপেক্ষা বৃহৎ ঐক্যের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। কারণ, এই সকল ধর্ম্মই অদ্বিতীয় এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাসী, প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যে বা ঋষিবাক্যে বিশ্বাসী, পরলোক ও পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মফলে বিশ্বাসী, মানবমৈত্রী ও মানবের আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধর্ম্মনিষ্ঠ-গণের চরিত্র সকল দেশেই এক প্রকার। বর্ত্তমান জগতের নাগরিক জীবন-চর্য্যাও সকল দেশেই এক প্রকার, তাহা মুখে যাহাই বলুক, কার্য্যতঃ বহুক্ষেত্রে উন্নত মানবধর্ম্মের অস্বীকৃতি, এবং অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে আদিম পশু-জীবনের দিকে পশ্চাদ্ গতি।

জগতের বর্ত্তমান ভয়াবহ বিকৃত রূপ দেখিয়া বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত কল্কি-অবতারের আবির্ভাব-কালের অবস্থা মনে হয়। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

ততশ্চ অনুদিনম্ অল্পাল্পহ্রাসাদ ব্যবচ্ছেদাদ ধর্ম্মার্থয়ো
র্জগতঃ সংক্ষয়ো ভবিষ্যতি।

[৪-২৪-২০]

—তখন প্রতিদিন ধর্ম্ম ও অর্থের অল্প অল্প হ্রাস ও ক্ষয় হইতে হইতে জগতের ক্ষয় হইবে।

ততশ্চ অর্থএবাভিজন-হেতুঃ, ধনমেবাশেষধর্ম্ম-হেতুঃ, অভিরুচিরেব দাম্পত্যসম্বন্ধ-হেতুঃ, অনৃতমেব ব্যবহারজয়-হেতুঃ, স্ত্রীত্বমেবো-পভোগহেতুঃ, রত্নতাম্রভাগিতেব পৃথিবী-হেতুঃ, ব্রহ্মসূত্রমেব বিপ্রত্বহেতুঃ, লিঙ্গধারণমেবাশ্রমহেতুঃ, অন্যায় এব বৃত্তিহেতুঃ ॥

[৪-২৪-২১, ২২]

—তখন অর্থই হইবে আভিজাত্যের হেতু, ধনই হইবে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের হেতু, পরস্পরের কাম-প্রবৃত্তিই হইবে দাম্পত্য-সম্বন্ধের হেতু [পরে আবার আছে,—স্বীকরণং বিবাহ-হেতুঃ, অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের স্বীকৃতি বা সম্মতিই বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে] মিথ্যাই হইবে মোকদ্দমা জয় ও অন্যান্য কার্য্য-সাফল্যের হেতু, স্ত্রী-লোকমাত্রই হইবে উপভোগের হেতু, রত্ন এবং তাম্রাদি ধাতু হইবে উত্তম ভূমি-লাভের হেতু, যজ্ঞসূত্রই হইবে ব্রাহ্মণত্বের হেতু, কেবলমাত্র বাহিরের চিহ্ন (যেমন গৈরিক বস্ত্র বা দণ্ড কমণ্ডলু)-ধারণ হইবে আশ্রম-ধর্ম্মের হেতু এবং অসাধুতা হইবে জীবিকা-নির্ব্বাহের হেতু।

ধর্ম্মধ্বজার আত্মপ্রবঞ্চনা ও ধর্ম্ম-বিমুখের জড়বাদের ইহাই কি নগ্ন রূপ নহে ?

তাই জিজ্ঞাসা, এই ঘোর সংস্কৃতি-সঙ্কটে আশার আলোকরশ্মি কোথায় ? পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা আজ আসুরিক দর্পে অন্ধ হইয়া ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজ কণ্ঠ ছেদন করিয়া নিজ রুধির-পানে সমুদ্যত ! ঐ হোথায় আধুনিক সভ্যতার চিতাবহ্নি ইউরোপের হৃদয়-ভূমিতে লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। উহা ইউরোপকে বেষ্টন করিয়া অতলান্তিক মহাসাগরে এবং ভূমধ্য সাগরে ভীম বাড়বাগ্নিরূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আকাশে জ্বলিতেছে ভয়াবহ বিদ্যুদগ্নি। শক্তি-সাধনার লীলাভূমি ইউরোপ ভস্মীভূত প্রায়। আমেরিকা পতঙ্গের ন্যায় ঐ চিতাবহ্নিমুখে ধাবিত হইতেছে। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের অম্বুরাশিও আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে, কালানল-শিখার করাল রক্তচ্ছবি তাহাতেও প্রতিবিম্বিতপ্রায়। বিশ্বগ্রাসী এই প্রলয়-বহ্নিতে যাহা কিছু অসত্য ও অনিত্য, অন্যায় ও অধর্ম্ম, যাহা কিছু বৈর ও বিদ্বেষ, পাপ ও প্রবঞ্চনা,

ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। যে পর্য্যন্ত না নিষ্কলুষ দেবদৃষ্টির প্রসন্নচ্ছটায় দিগ্‌ভাগ আলোকিত না হয়, সে পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়া অথবা প্রবলভাবে অমারাত্রির ঘনান্ধকারে স্বার্থ-সম্ভূত সংহারানল জ্বলিতে থাকিবে। বিগত মহাযুদ্ধের জার ও কাইজার ও খালিফ আজ কোথায়? এই যুদ্ধেও আজকের ছল ডেমোক্রেসি, আসুরিক নাৎসিবাদ, উগ্র ফাসিস্তবাদ অথবা মোহকর বলশেভিকবাদ কিছুই নিজরূপে বর্ত্তমান থাকিবে না। অত্যাচারী স্বেচ্ছাতন্ত্র যেরূপে ও যেনামেই আসুক, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দরিদ্রের শোণিত-লিপ্ত ধনী বণিকের স্বর্ণ-সঞ্চয় অসত্য হইয়া যাইবে; কৃত্রিম জাতিভেদ, ও বৃত্তিভেদ বিলুপ্ত হইবে; মানুষ স্বাধিকারে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হইবে। যাহা কিছু সত্য, শাশ্বত ও স্মরণীয়, তাহা অগ্নি-দগ্ধ সুবর্ণবৎ দ্বিগুণ প্রভায় দীপ্তি পাইবে। অত্যাচারিত বুভুক্ষু জনগণ ও জাতিসমূহ নব জন্ম লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

ভয় নাই! দিগম্বরা ছিন্নমস্তা-মূর্ত্তিই মহাদেবীর শেষ প্রকাশ নয়। সর্ব্বজ্ঞানময়ী, সর্ব্বাভরণভূষিতা, সর্ব্বৈশ্বর্য্যরূপা, গজ-সেবিতা কমলা-মূর্ত্তি বরাভয় প্রদান করিয়া বিশ্বে আনন্দ এবং আলোক বিতরণ করিবেন। মানুষ আবার স্বভাবপ্রতিষ্ঠ, শান্ত ও সম্যগ্‌দর্শী হইবে। বর্ত্তমান জগতের আধুনিকসভ্যতা-রূপ দারুণ দুঃস্বপ্ন দূরীভূত হইবে। ধর্ম্মজ্যোতি মানবমনের মায়া-মেঘমালার অপসারণে আপনি ফুটিয়া উঠিবে।

পৃথিবীতে ধর্ম্মের বিনাশ কদাচ সম্ভবপর নয়, যেহেতু ধর্ম্মবোধই মনুষ্যত্বের চরম রূপ। মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে, মানুষের অন্তরে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে পূর্ণত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত জাগিবেই; অনন্তসত্তা, অনন্ত আনন্দ ও অনন্ত জ্ঞান লাভের বাসনা নিয়ত উদ্বুদ্ধ হইবেই। দৃশ্যসত্তার অন্তরালে অলৌকিক অদৃশ্যসত্তা,

ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অন্তরালে অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, সীমা-বন্ধনের অতীত অসীম অবিমুক্ত স্বরূপ, ইহাই মানুষ চায়। মানুষের ইহাই মূল ধর্ম্মপ্রেরণা। বন্ধনের পর বন্ধনে জড়াইয়া, কোষের পর কোষদ্বারা আবৃত হইয়া স্বয়ংজ্যোতি আনন্দময় সত্তা যেন অন্তরাল হইয়া গিয়াছে। যে মানুষ স্বভাব-স্থিত, সে কি করিয়া বন্ধন-জর্জ্জর অজ্ঞানাচ্ছন্ন সত্তা লইয়া বিষয়-সুখে চরিতার্থতা বোধ করিবে? মনের মানুষকে, আপনার জনকে, তাহার পরমাত্মাকে চাই। ইহাই আধ্যাত্মিকতার বেদনা। মানবের বিচার-শীল মন পার্থিব ভোগবিলাসের অসারত্ব ও অনিত্যত্ব, স্থূল জড়দেহের নশ্বরত্ব সহজেই উপলব্ধি করে, তাহার অন্তর হইতেই প্রেরণা আসে শাশ্বত সত্য, অক্ষয় আনন্দ, অনির্ব্বাণ জ্ঞানজ্যোতিকে লাভ করিয়া পরম নিশ্চিন্ত, নির্বৃত ও শান্ত হইবার জন্য। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে কেবলই বলিতে থাকে, 'নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি—আমি তো এখানে ভোগের কিছুই দেখিনা'। মানুষের দেহমন জড় হইতে পারে; মানুষের আসল সত্তা, জ্ঞানিগণ যাহাকে বলেন আত্মা, তাহা জড় নয়; তাহা জড়ের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী পরম চৈতন্য ও পরম আনন্দ। মানুষ তাই সর্ব্বপ্রকারে তাহার শুদ্ধ স্বরূপে স্থিত হইবার জন্য সাধনা করে। ইহাই তাহার তপস্যা বা প্রিয়তম পুরুষের পথে অভিসার। মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন সে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইবেই, ততদিন ধর্ম্মের বিলোপ সম্ভবপর নয়।

বিজ্ঞান মানবের মনদ্বারা (অধ্যাত্মজ্ঞানদ্বারা নয়) পরীক্ষিত বিশেষ জ্ঞান, তাহাকে বন্ধু বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাকে ভয় করিবার কিছু নাই। বিজ্ঞান একনিষ্ঠ অনাসক্ত চিত্তে সত্যানুসন্ধানে রত, তাহার যাত্রা চিরদিন সম্মুখের দিকে। সত্যকে সে লাভ করিবেই

যুগ পরে হউক, কিংবা যুগ-যুগ পরে হউক। তবে এ সাধনায় তাহার বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, পরীক্ষার প্রণালী ও ফল-বিচারের মানও অন্য প্রকারে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। মানবমন যত দিন সরল নিষ্ঠার সহিত সত্য-জিজ্ঞাসু হইয়া সাধনা করিবে, ততদিন তাহাকে ভয় নাই, বিপথে গেলেও সে পুনরায় সুপথে পরিচালিত হইবে। যদি কোনদিন বিজ্ঞানের গতি মধ্য পথে থামিয়া যায়, যদি সে বলে, "আমার বিশিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা আমি যাহা জানিয়াছি, তাহাই চরম সত্য। ইহা মান; ইহা যে না মানিবে, তাহার উপর রাষ্ট্রের শাসনদণ্ড উদ্যত হইবে ;"—সেইদিন তবে ভয়ের কারণ হইতে পারে। মানবের অত্যাচারে মানবমন যদি কখনও স্বাধীনতা হারায়, আপন মর্য্যাদাবোধ বিলুপ্ত করে, সে দিন হইবে মানব সমাজের দুর্দ্দিন। তাই সর্ব্বপ্রযত্নে ভারতীয় আধ্যাত্মিক রাজ্যের ন্যায় বৈজ্ঞানিক রাজ্যেও মানব মনের স্বতন্ত্র মহিমা সর্ব্বদা স্বীকার করিতে হইবে। হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ গুণ্ঠিত রহিয়াছে, সে গুণ্ঠন অপনীত করিয়া সত্যের পরম প্রকাশ ঘটাইবে বিজ্ঞান। প্রকৃতিকে যে নিঃশেষে জানিবে, প্রকৃতির অন্তরাল-বর্ত্তী পরমপুরুষের সন্ধান সে-ই দিতে পারিবে।

হে হিন্দু! অতীত শত শত যুগে কতবার তোমার সংস্কৃতি-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, বরণীয় আচার্য্যগণ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়াছেন, বেদান্ত-সত্যের পুনঃপ্রচার দ্বারা তাঁহারা শুরু ধর্ম্মকে বিধৃত করিয়াছেন। আজ এ সঙ্কট দেখিয়া ভীত হইলেও হতাশ হইবার কারণ নাই। চতুর্দ্দিকের বিহ্বল মূর্চ্ছিত ভাব ও অসহনীয় চরম বেদনাভার দেখিয়া মহাসত্যের নবজন্ম আসন্নপ্রায় বলিয়া মনে হইতেছে। এ চঞ্চলতা স্থায়ী হইবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির বন্যা-তরঙ্গের ন্যায় এ

জলতরঙ্গও একদিন বহিয়া চলিয়া যাইবে, হিমালয় পর্ব্বতের ভিত্তিমূল তাহাতে শিথিল হইবে না। ভারতবাসীর রক্তধারা ও চিত্তধারার সুদৃঢ় সংস্কার পুণ্য মহিমায় আবার প্রকট হইবে। হিন্দুধর্ম্মের মৌলিক সত্য শাশ্বত সত্য, তাহাকে পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিবার প্রশ্ন উঠে না, সম্মিলিত মনীষা-বলে তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া নবীন ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত সাধনায় মানবের শ্রেষ্ঠতম সংস্কৃতি লাভ করিয়াছেন অনেক হিন্দু, উহা আজ জাতির সর্ব্বস্তরে সকলকেই প্রদান করিতে হইবে। বেদান্ত ও গীতার উদার সাম্যধর্ম্ম ও মহোন্নত মানবধর্ম্ম কেবল অরণ্যচর তাপসের উপলব্ধিতেই বাঁচিয়া থাকিবে না; গৃহে ও সংসারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহার পুণ্য প্রয়োগদ্বারা বেদান্তকে জাতীয় জীবনচর্য্যার অঙ্গীভূত করিতে হইবে। মানুষের সৃষ্ট অমঙ্গল-কর যাবতীয় কৃত্রিম বৈষম্য — শিক্ষা-বৈষম্য, ধর্ম্ম-বৈষম্য, অধিকার-বৈষম্য দূর করিয়া হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন দ্বারা ভারতীয় জীবনে নব বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবেই আসিবে শুক্লধর্ম্ম, আসিবে শুভ সংস্কৃতি, আসিবে পূর্ণ মুক্তি। ওঁ শমিতি।
